কনকপুরের কবি

অমরেন্দ্র ঘোষ

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬০

চার টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী : অনিল ভট্টাচার্য

৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস
মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ২৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, শ্যামসুন্দর প্রিন্টিং
ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

শ্রীযুত সুধীন্দ্র নারায়ণ নিয়োগী
শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
করকমলেষু

হাটে কবি, মাঠে কবি, জগন্নাথ মুচিও ডাকে কবি বলে।

অবশ্য মনিব জনার্দন চক্রবর্তীই এ নামটা প্রথম রাখেন, নিতান্ত সমাদর করে! সেই কবিই এগিয়ে চলেছে।

পুলকে বিস্ময়ে কবি অভিভূত হয়ে থাকে। একি, তার যে সারা দেহ মন কণ্টকিত হয়ে উঠেছে।

সে কাজে বেরিয়েছিল—খাল পারের মাঠের ভিতর এসে দিশে হারিয়ে ফেলল। এত গান রয়েছে তাদের বাড়ীর কোলের মাঠে! এত ঝংকার, এত অনুরনণ! এ তো সাধারণ গান নয়—বসুন্ধরার চিরন্তন জীবন সংগীত।

যন্ত্র নেই, যন্ত্রী নেই, তবু যেন একটা গমক উঠছে চারদিক থেকে। পাখীর কাকলি, হালকা হাওয়ার স্পর্শে মাঠের চারপাশের বাঁশ তেঁতুলের মৃদু মর্মর ধ্বনি, রোদ উঠতে না উঠতেই মৌমাছির লোভাতুর গুঞ্জন—এ যেন এক মহা সংগীতেরই মূর্চ্ছনা। এর যতি নেই, বিরতি নেই, বুঝি বা, অশেষ পর্যন্ত এর কল্পনা।

মৌমাছি মধু চায়।

ঐ যে কৃষক লাঙল দিচ্ছে মাঠে, সেও ফসল চায়।

কোন্ দাওয়ায় শুয়ে ঐ যে শিশু কাঁদছে সেও কামনা করে মাতৃস্তন্য।

অতি ক্ষুদ্র ঐ যে হলদে পাখীটি তারও প্রত্যাশা একই।

কবি এগিয়ে চলে মেঠো পথ ধরে। জীবন সংগীত বাজতে থাকে তার চতুর্দিকে।

যন্ত্র নেই, কিন্তু কবি দেখতে পায় একটি তন্ত্রী যেন তাদের ঐ কনকপুরের খাল। কেমন তার সে জানে না, কিন্তু সুর বাজে নিত্য দুবেলা। জোয়ার ভাঁটার সুর—অপরূপ এবং অনবদ্য।

কবি অভিভূত হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

এবার সংগীতের পটভূমি তার নজরে পড়ে। কচি দুর্বায় ভরা সবুজ ক্ষেত। মাঝে মাঝে জন্মেছে দু'একটা ভিন্ন জাতের ঘাস। মাথায় তাদের ছোট ছোট হলুদ এবং বেগুনী ফুলের লাবণ্য। তাদের দেহের রাত্রির শিশিরবিন্দুগুলি যেন হয়ে রয়েছে প্রভাতের শিহরণ। সূর্যের প্রথম চুম্বন পেয়েছে যেন অপূর্ব স্বীকৃতি। বিশ্ব প্রকৃতি তাই এখনও মোহাচ্ছন্ন। কেয়া কদম্ব কৃষ্ণকলি যেন এখনও আবেশে বিহ্বল।

কয়েকখানা নাও ভেসে এল—এখন চলছে জোড়ায় জোড়ায়।

বলিষ্ঠ বৈঠার ঘায় একটা অব্যক্ত ব্যথাতুর আনন্দের ঢেউ কেটে ওরা এগিয়ে চলে। ওরা কলরব করে স্বার্থের, প্রশ্ন করে লাভালাভের, পরিশ্রমের হিসাব কয়ে সূক্ষ্ম।

'বাজার কত উঠল, নামল?'

'কন্‌ট্রোল কি উঠবে না?'

'এবার যদি জমিদার জনার্দন দাখিলা না দেয়, তার মাথায় পড়বে আচমকা বাজ।' সে গল্প বলে একটা।

'আরে রাখ, রাখ সে যুগ কি আছে?'

'কিন্তু এর যুগ তো যায়নি মিতা।' লাঠির বদলে দ্রুত বৈঠা তুলে দেখায় এক ব্যক্তি।

আবার গুঞ্জন ওঠে হিসাবের—জীবনের ক্ষয় ক্ষতি, ক্রান্তি গণ্ডা আনা পাইর। বর্ষ মাস দিনান্তের হিসাব। এও যেন মধুমক্ষিকার গুঞ্জরণ—কে যেন হরণ করে নিয়েছে পুষ্পের মধু। ওরা আহত, অতৃপ্ত পিপাসায়।

জলে নায়ের সারি, আকাশে দেখা যায় বক ও যাযাবর পাখীর সারি। ওদের পাখনায় আলো চমকায়। কখনও বা ভোরের রোদ চিকমিকিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়ে নরম পালকে। ওদের চোখে মুখে বুকেও একই

সংগীত—জীবনধারণের উগ্র ইসারা, বাঁচার তাগিদ। সামান্যই অবকাশ রয়েছে কাব্য কুহেলিকার।

কবি ঝান পেতে থাকে।

বাঁশ বাবলা বেতসের অন্তরালে পাড়াময় কলরব শোনা যায় বৌ ঝি অবুঝ ছেলে মেয়ের। কেউ ধান ঝাড়ে, কেউ জল আনে, কেউ বা জড়িয়ে ধরতে যায় মাকে। ঢেঁকির পারও শোনা যায় গম্ভীর ছন্দের। কোথাও বা দ্বন্দ্ব চলে মুখরা ননদ বৌতে।

এই অনাদি সংগীতেরই তো একটি ভগ্নাংশ কবির জীবন। মীড়গুলো ভাঙছে তবু সকরুণ নিক্কণ শোনা যায় একটানা।

কবি মেঠো পথ শেষ করে গ্রামের ভেতর ঢোকে। ছবি, গান, কল্পনা তার মনের কোণায় মিলিয়ে যায় নিমেষে। রূঢ় বাস্তব দেখা দেয় রুদ্ররূপে।

'এত দেরী হল যে?'

পরের চাকরী—সামান্য মুহুরীগিরি, বিলম্ব হওয়ার দরুণ কিবা অজুহাত দেওয়া চলে? বলবে কি সে কল্পনার সমুদ্রে ডুবেছিল, সংগীত শুনছিল প্রভাতী জীবন কল্লোলের? তন্ময় হয়ে ছবি দেখছিল রূপময় জগতের?

বলতো কেমন বেখাপ্পা শোনাবে। যেখানে শুধু লেন দেনের হিসাব, হিসাব দাদন এবং উসুলের—সেখানে স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও তো অচল। আমাদের সামান্য অজয় ঠাঁই পাবে কি করে?

প্রশ্নকারীকে আর কিছু বলতে হয় না। তাঁর চোখেই এমন ভাষা বহ্নিমান যে অজয় গিয়ে চুপ করে তার কাগজ কলমের কাছে বসে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাজে নিমগ্ন হয়ে যায়। সম্ভব হলে যে কলমে কবিতা লেখা হত, আজ সেই কলমে হিসাব লিখে চলে সত্য এবং

মিথ্যার। দ্বিতীয়টার এমন ভেজাল দেয়—যেমন সদ্য গব্য ঘৃতের সংগে চলে আধুনিক বনস্পতি। শেষ পর্যন্ত বনস্পতিই খাঁটি হয়ে দাঁড়ায়।

জমিদার জনার্দনের সেরেস্তাটা বেশ বড়ই। অসমতল কয়েকটা তক্তাপোষ পাশাপাশি সাজান। সেগুলোকে সমতল করা হয়েছে অগুণতি হোগলা পাতার মাদুর বিছিয়ে। চক্রবর্তী মহলে বের হলে খাজনা যদি নাও পান, প্রজা দুস্থ বলে কাকুতি মিনতি করে, তাকে তিনি রেহাই দেন বটে, কিন্তু উসুল করে আনেন সুদ। নগদে না পারলে জিনিষপত্রে। কেউ হয়ত বুনেছে খালপারের কচি হোগলা পাতা তুলে দুখানা মাদুর—পয়সা তো দিতে পারবে না, দেবে ঐ দুখানা উপঢৌকন, বিবাহিতা মেয়েকে। কেউ বা বুনেছে পাঁচখানা শক্ত ডালা পাকা তল্লা বাঁশের চিকণ বেতি তুলে। কৃষাণ কৃষাণীর সারা দিনমানের পরিশ্রমের পর গৃহ শিল্পের যা কিছু সামান্য অবদান তাও ওঠে মনিবের নৌকায়। বাপ সমতুল মনিব তো!

প্রতি বছর ধান চাল টানতে ও ঝাড়তে, নারকেল সুপারি তুলতে, জনার্দনের অজস্র ডালা কুলার প্রয়োজন। তা তাঁর এইভাবেই যোগাড় হয়।

তালুক মুলুকও জনার্দন চক্রবর্তীর রয়েছে যথেষ্ট—অবশ্যি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজিউর নামে উৎসর্গিত। ধান জমিও আছে প্রচুর। লগ্নি লহনার কারবার তাঁর ঘরের বৌ ঝি, দাসদাসীরা পর্যন্ত করে। এ বাড়ীতে কোথায়ও ঝকমকে আসবাব নেই, না আছে কোনও ঔজ্জ্বল্য। সেরেস্তার পাশেই হয়ত দুধের বাছুর এনে বাঁধে চাকরটা। কুড়ি তিনেক হাঁস দিন রাত আনাগোনা করে সেরেস্তার তক্তাপোষের তলায়। চারটা রাজহাঁস আছে অদ্ভুত। যেমন তেমন মানুষ দেখলে যখন তখন ধাওয়া করে যায় গলা বাঁকিয়ে—অনেকটা খেঁকি কুকুরের মত।

জনার্দনের বয়স খুব বেশি নয়—এই হবে ত্রিশ কি একত্রিশ। কিন্তু

এর মধ্যেই তিনি তাঁর বাপের তুল্য সুনাম দুর্নাম দুই অর্জন করেছেন অত্যধিক।

'কবি এদের দাঁড় করিয়ে রেখো না—খাজনা গুণে নাও। যাও যাও হে ওদিকে যাও, ভিড় ভাঙ।'

অনেক লোকের হট্টগোলের ভিতর একটি অষ্টম বর্ষীয়া মেয়ে দ্বার-প্রান্তে উদয় হল। দিনের বেলা ঈষৎ অন্ধকার ঘরে যেন একফালি জ্যোৎস্না পড়ল। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন। মাথার চুল তেলের অভাবে রুক্ষ, পরণের কাপড় সময় মত পরিষ্কার না করার দরুণ মলিন।

কবি চোখ তুলেই চিনল এবং মেয়ের মনের কথা নিমেষে বুঝল। কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। বড়ই ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটি ইতস্তত করে চলে গেল।

আবার ঘণ্টাখানেক বাদে সে এসে হাজির হল।

কবির সংগে চোখাচোখি হওয়া মাত্র মেয়েটি চোখ নামাল, কবি একটা ঠিকে ভুল করে অস্থির হয়ে পড়ল।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মেয়ে পিতার অবস্থা সহজে হৃদয়াংগম করে এবারও নীরবে সরে এল রংগমঞ্চ থেকে। যত প্রয়োজনই থাক সে বাবাকে অতিষ্ঠ করবে না।

কেন মেয়েটি এসেছিল কেনই বা কিছু না বলে কয়ে চলে গেল কবি ব্যতীত আর কারুর মনে তা দাগ কাটল না। যে যার কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

দুই

খাজনাপাতি প্রায় দেওয়া শেষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ কলম সমেত হাতখানা কাঁপতে লাগল। থরথর করেই কাঁপছে। সাহস হচ্ছে না তুলে নিতে। বুঝি বা দ্বন্দ্ব চলেছে মনে। গুরুতর দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হয়েছে মুখে—ঠিক আরশীতে যেমন ঠিকরে পড়ে দূরাগত তির্যক আলোক রেখা। কিন্তু মুখখানা মোটেই উদ্ভাসিত হয়নি—বরঞ্চ হয়েছে কঠোর এবং কৃষ্ণবর্ণ।

এ আলোর প্রতিফল নয়, দুঃসহ জ্বালার এক অপরিসীম অভিব্যক্তি। শান্ত নিরীহ মানুষ হয়ে উঠেছে কেমন অসাধারণ হিংস্র এবং লোভী।

সুমুখে একটা দেশী মিস্ত্রির তৈরী জবরজং টেবিল। টেবিলের ওপর একটা নক্সী টাকার থলে। টাকা, সিকি, আধুলী, দোয়ানী বোঝাই। লোভীর কাছে ওর ঝন্‌ঝনানি কি মধুর।

কলম সমেত হাতখানা আবার এগিয়ে এল। পাঁচ রঙা থলিটা স্পর্শ করেই হঠাৎ ফিরে গেল। আত্মসাৎ করতে পারল না। যেন বিদ্যুতে চিলিক্ মেরেছে—ঘা খেয়েছে মর্মে।

কেউই তো লক্ষ্য করছে না। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তবে আর ভয় কি ? নিতেই হবে থলেটা তুলে। নিতেই হবে আজ ? প্রয়োজন, তার যে মারাত্মক প্রয়োজন। কোনও যুক্তি তর্ককে সে আজ আর আমল দেবে না। নীতি শাস্ত্র যাক অগাধ জলে তলিয়ে।

কিন্তু তবু কেন হাত কাঁপছে ?

কেন ঘেমে উঠছে কলমের মালিক অমন করে ?

শৈশব, কৈশোর, যৌবন সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এল কয়েক মুহূর্তে। না, কোথায়ও তো দাগ নেই, কলংক নেই তার পিতা মাতার ঐতিহ্যে।

তখন যে প্রচুর আহার্য ছিল ঘরে।

ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে হাতখানা। দেখলে সত্যই বড় দুঃখ হয়। কেমন মৃত্যুমুখী রোগীর মত জড়িয়ে যাচ্ছে আংগুলগুলো। কাঁপছে ঘন ঘন। কত কষ্ট হচ্ছে যেন প্রতিটি শিরা উপশিরায়। দুর্বার জ্বালা হচ্ছে মগজে।

তবু প্রয়োজনের দুরন্ত তাগিদে এগিয়ে চলেছে কলম সমেত হাত। জীবনে এ কাজ নিশ্চয়ই এই তার প্রথম। তাই এত সংঘাত, তাই এত বিচার বিবেচনা, তাই এত বৃশ্চিক দংশন।

উঃ কি জ্বলুনী!

জ্বলুক, জ্বলুক, পুড়ে যাক—তবু কলম সমেত হাত দৃঢ় মুষ্টিতে তুলে আনল থলিটা টেবিল থেকে।

এখন সে একটা আরাম বোধ করছে। আজকের প্রশ্ন তো তার মিটে গেল। কত নির্ভাবনা, কত স্বস্তি! কী কঠিন সমস্যারই না সে পড়েছিল।

হাত আবার যেন নিশ্চিত মনেই কলম চালিয়ে যেতে লাগল। গতানুগতিক ক্ষিপ্রতা যেন প্রখর হয়েছে। চট পট করে লিখে যাচ্ছে প্রজাওয়ারী হিসাবের অংক।

কিন্তু মাঝে মাঝে আশংকায় থামছে কলম। কাঁপছে নিবটা।

যদি এক্ষুণি খোঁজ পড়ে? যদি এক্ষুণি এসে কেউ তাকে জেরায় জেরায় জেরবার করে তোলে? কি জবাব দেবে সে? একটা কিছু তো বলতেই হবে। তার নিতান্ত আবশ্যক ছিল। এ একেবারে বালকের উক্তি। সকলে হেসে উঠবে শুনে। উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেবে তার তীব্র ক্ষুধার কথা। ক্ষুধিতের মর্যাদা আজ পর্যন্ত কেউকি দিয়েছে এ জগতে? তার মানসিক বেদনার মর্মান্তিক ইতিকথা কি আজ পর্যন্ত শুনেছে কেউ কান পেতে?

কলম সমেত হাত চারদিকে যেন অট্টহাসি শুনতে পায়।

চমকে ওঠে কলম। লেখা যায় বিগড়ে।

ধমক খায় কবি। শাসিয়ে ওঠেন জনার্দন। 'এই মুখ্খু ভুল লিখছ কেন ?'

তারপর জনার্দন মন্তব্য করেন, প্রজাওয়ারী হিসাব লেখা কি যার তার কর্ম ? ইস্কুল কলেজ পড়িয়ে মানুষগুলোকে করা হয়েছে অজ্ঞ। তারা বুঝবে কি করে এ সব জটিল অংকের তত্ত্ব। স্বত্ব বদলাচ্ছে বারম্বার। দেনা, দায়, সুদ বাড়ছে সংগে সংগে। এ—বি, এল, এ—র্স্রে, সি, এল, এ—ক্সে নয়।

কে যেন একটা মর্কটের মত লোক বলে উঠল, 'মহারাজ আপনি তো সাহিত্যের কথা বলছেন—ইংরেজি সাহিত্য।'

'ওরা কি পাটিগণিতের কথা জানে ? যত সব গো মূর্খের দল। দিক্ তো একটা মানসাংকের জবাব ?

ন' মন কুঁজো ন' মন কুব্জী
ন' মন তার নাতি পুতি—

পার করুক তো একখানা নায়ে ? একবারে কিন্তু ন' মনের বেশি ওপার নেওয়া যাবেনা। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে থাকে যেন ওজনটা। ন' মনের বেশি উঠলেই নাও যাবে ডুবে।"

'এ তো মানসাংক নয় মহারাজ।'

'তা' না হক—এইটারই আগে জবাব দিক না ও।'

'কেন প্রথম যাবে নায়ে উঠে কুঁজো।'

'নাও ফিরিয়ে আনবে কে ?'

'তা-ই তো, তাই তো। এ যে বড় জটিল প্রশ্ন।'

যাকে কটাক্ষ করে এ সব উক্তি সে মহা সংকোচে চুপ করে রইল। হাতের কলম তার থেমেছে অনেক আগেই, এখন সে একেবারে

বোবা পশুর মত ইতিউতি চাইতে লাগল। কথা রয়েছে মনে কিন্তু ভাষা জোগাচ্ছে না মুখে। যুক্তি রয়েছে মর্মে কিন্তু মুক্তি পাচ্ছে না বাইরে।

কার কাছে সে তার হৃদয়ের ব্যথা চেলে দেবে? কেই বা তার কথা শুনবে? মরুভূমির ঊষর ধূসর কাঠিন্য সে উপলব্ধি করে তার চারদিকে। শুধু বালি রাশি, বন্ধ্যা নিষ্করুণ প্রান্তর। এ বন্ধ্যাত্ব সে কি করে দূর করবে? সে তো প্রাবৃটের ঘন কালো মেঘ নয়। সে যে সামান্য একটি মানুষ—আরও সামান্য তার চোখের দুটি ফোঁটা অশ্রুজল। শুধু ক্ষণে ক্ষণে টলমল করে ওদের অজ্ঞতার কথা ভেবে।

আবার উঠল কুঁজো কুঁজীর কথা। কেউ বাধা দিল না। জনার্দন তখন নিজেই ব্যাখ্যা করে যেতে আরম্ভ করলেন পাঠশালার কৌশলী পণ্ডিতের মত। একে একে তাঁর প্রশ্নের মানুষগুলোকে পার করে দিলেন নদী। 'এ একেবারে শুভংকরের জ্যাঠা মশাইর রচিত মানসাংক। না বুঝলে অত্যন্ত কঠিন, আর বুঝলে—'

'নিতান্তই জলের মত।' ধামা ধরল একজন মোসাহেব গোছের কর্মচারী।

'তবে তোমরা বলতে পারলে না কেন?'

'সেই তো, আমাদেরই বলা উচিত ছিল। কিন্তু আপনার আগে কি আমাদের বলা শোভা পায়? আপনি রাজচক্রবর্তী! আর যদি আমরা কেউ বলেও ফেলতাম তাতেও কি আপনি তেমন সুখী হতেন?'

'কেন কেন?'

'পাণ্ডিত্যের স্বত্বটাও তো আপনার একচেটিয়া থাকা উচিত!'

'তামাক খাও যাদব? তুমি বড় রূঢ়ভাষী।' তামাকের ব্যবস্থা যথারীতিই রয়েছে। কয়েকটা টান দিয়ে প্রসাদী কল্‌কেটা ছেড়ে দেন চক্রবর্তী। একটা ব্যাকুলতা পড়ে যায় সেরেস্তার পাঠশালায়। ছাত্ররা অনেকক্ষণ অভুক্ত।

চাটু বাক্যে জর্নাদন সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'তোমরা জানবে না কেন ? তোমরা তো আর ইস্কুল কলেজে পড়নি। পাঠশালার ছাত্রদের এ হচ্ছে একেবারে প্রথম পাঠ—মৌখিক শিক্ষা।'

এবার ও ইংগিতটা যাকে লক্ষ্য করে করা হল. সে চুপ করেই হজম করল আঘাতটা।

একটা গোলমাল পড়ে গেল।

রসুন এল কাঁদতে কাঁদতে। তার টাকা চুরি গেছে। থলে সমেত টাকা রেজগি ইত্যাদি। খাজনা দিতে এসেছিল সে। হিসাব নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরে যায়, তখনি নিশ্চয় ভুল করে ফেলে গেছে থলিটা।

জোড় হাত করে এসে দাঁড়াল ভূমিহীন গ্রাম্য কৃষাণ রসুল।

একটু ভদ্রাসন মাত্র সম্বল রসুলের। তা বহুদিন পূর্বে চক্রবর্তী নিলাম করিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু অনুগ্রহ করে দখলে রেখেছেন রসুলেরই। সে কবে বন্দোবস্ত পাবে, তার নিশ্চয়তা নেই, তবু আশায় আশায় অগ্রিম চুকিয়ে দিচ্ছে খাজনা। আর কাকের মুখে সংবাদ পেলে ছুটে এসে দিয়ে যাচ্ছে ভেট, বেগার।

এই ভূমিহীন, শুধু মাত্র কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশাল রসুলের কান্নায় সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হলেন চক্রবর্তী। তাঁর সম্মানে ঘা লাগল। কী, তাঁর সেরেস্তায় এত বড় একটা সাংঘাতিক কাণ্ড! সত্যই তো কে নিল এই গরীবের পুজি হরণ করে ? এই পরস্বপহারি কে ?

'কেউ এক পা নড়ো না।'

এবার কলমটা হাত থেকে খসে পড়ল মেঝেতে। কাঁপুনি গেছে খিঁচুনি এসেছে যেন সারা দেহে। মাথাটা হেলান রইল একপাশে। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ঘাম।

জমিদার জনার্দন শাসাচ্ছেন, আর কলমের মালিক এক নগণ্য কবি হাঁপাচ্ছে।

সকলেই তটস্থ। মুখ শুকিয়ে গেছে পাইক পেয়াদার। উঠানের একটা বকনা বাছুর মায়ের দুধ ছেড়ে যেন থ' মেরে রয়েছে।

সত্যই তো মহা বিস্ময়ের বিষয়! কে নিল এমন নিঃস্বের অর্থ চুরি করে?

একটা দাঁড়কাক যেন কা-কা করে উঠল বড় নিম গাছটার ডাল থেকে।

এমন অসময়ে কাকের ডাক! ভয়ানক কষ্ট এবং সংগে সংগে কিছুটা ভীত হলেন জনার্দন। বাকী সবাই প্রমাদ গণল।

জনার্দন একজন কর্মচারীকে চোখ ইসারায় ডাকলেন।

'আমি নয় হুজুর, আমি নয়।' সে কাঁপতে কাঁপতে কালি ঢেলে ফেলল একটা হিসাবের খাতায়। ঐ খাতাটায় থাকে কেবল তামাদির হিসাব। পরপর তিন বছর কেউ খাজনা আদায় না দিলে, তা আইনের ক্ষেত্রে হয় তামাদি। কিন্তু জনার্দনের এমন একটা স্বকীয় বেআইনের ক্ষেত্র ছিল, যে সেখানে তামাদির মত অবাঞ্ছিত কোনও আগাছাই জন্মাতে পারত না। সেই ক্ষেত্রের খতিয়ানেই পড়ল দেশি, কড়া, কষ-কালি।

জনার্দনের ক্রোধটা পঞ্চমে চড়ল।

'তুমি যে উল্লুকের মত নাচছ, তাতে কি মনে হয়? তুমি যে ওর টাকার থলেটা নাও নি তার প্রমাণ কি?

যুক্তির প্রয়োগটা অকাট্যই বটে।

ভদ্রসন্তান এসেছে পেটের দায় চাকুরী করতে, ধমক খেয়ে বলছে যা তা—সে তো নিশ্চয়ই দোষী। আরও যখন ঢেলেছে এমন একটা হিসাবের খাতায় কালি!

অনেক কাকুতি মিনতির পর জনার্দন তাকে রেহাই দিলেন। হিসাবের পাতাটা আবার ভাল করে লেখো।' রেহাই এঁরা যখন তখন যাকে তাকে দিতে পারেন আবার বঁড়শিতে গেঁথেও দিতে পারেন অনায়াসে—টাকা নেওয়া না-নেওয়ার প্রশ্নই এখানে বড় নয়। এ তল্লাটের সকলে জানে জনার্দন খুশি হলে বাঘ গরুকে জল খাওয়াতে পারেন এক ঘাটে।

তারপর ধরা হল আর একজনকে·· তারপর আর একজন।

টাকা পাওয়া গেল না। রসুলের মুখ শুকিয়ে এঃটুকু হয়ে গেছে।

জনার্দন কেবলই গরগর করতে লাগলেন, 'আহা মরার ওপর কে খাঁড়ার ঘা মারল? বেচারার এতটুকু জায়গা জমি নেই—খায় শুধু নাও বেয়ে। যখন ডাকি তখনই হাজির! বলত আজ ওর চলবে কি করে?'

সমস্তই বললেন জনার্দন কিন্তু তাঁর অনেকগুলো ধান চালের গোলা থাকা সত্ত্বেও একটিরও অর্গল ঈষৎ মুক্ত করতে বললেন না।

প্রত্যেককে ঝাড়া নেওয়া হল। কবিকে কেউ গ্রাহ্যই করল না। হিসাবে আনল না মানুষ বলে। সে উপেক্ষায় দূরে পড়ে রইল সেরেস্তার একপ্রান্তে।

রসুল ফিরে গেল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে। তার পাঁজরার হাড় কখানা চোখে বাজল কবির। সেরেস্তার কাজে আজ আর জুত লাগল না। বেলাও প্রায় দ্বিপ্রহর হতে চলেছে। সকলের সংগে উঠে সেও বাড়ী চলল।

হাঁটুতে জোর নেই, পা দুখানা যেন জড়িয়ে যেতে চাইছে। তবু জোর করেই হেঁটে চলল সে।

দুয়ারে যেন ক্ষুধার মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির সেই মেয়েটি। স্বামীর সাড়া পেয়ে মেয়ের পাশেই এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল তার মা। যেন বিষণ্ণ মেয়েরই একটি দীর্ঘতর ছায়া।

'বাবা চাল ?'

কবি চুপ করে রইল।

মেয়েটি আর একটু উঁচু পর্দায় কণ্ঠ তুলে এক সক্ষম পিতাকে ফের জিজ্ঞাসা করল, 'চাল কোথায় বাবা, চাল ? কি চুপ করে রইলে যে ?' হেনার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল।

মা দ্রুত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'অত অবুঝ হয়ো না ধন।'

হেনা সত্যই অবুঝ নয়। সকালের দিকে আজ যে সে কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছে এই চালের জন্য ! তার সমস্ত ব্যর্থতা এখন অশ্রুরূপে ঝরে পড়ল পিতাকে দেখে। বাপ তার বিদ্যায় বুদ্ধিতে কারুর চেয়ে তো হীন নয়।

'এই টাকা নাও—যা হয় কর, আমি জোগাড় করতে পারিনি।'

এত বেলায় চাল সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব। এ বেলা উপবাস অনিবার্য। মলিনা মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত অন্তরে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। অজয়ের জন্য যথারীতি ঘটি, গামছা, কাপড় পূর্বাহ্নেই গোছান ছিল।

কিন্তু ঘরের গিন্নীকে তো অসম্ভব ভেবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। শ্বশুর, স্বামী, সন্তান সকলের প্রতিই একটা পরোক্ষ দারিদ্র্য আছে তার।

মেয়েকে বড় ঘরে বসিয়ে রেখে মলিনা প্রতিবেশীদের কয়েক ঘরে চেষ্টা করে এল। কে দেবে তাদের প্রত্যহ চাল ধার ? এ সব কাজ সাধারণত হেনাই করে—আজ মলিনার বড় লজ্জা বোধ হচ্ছিল। ধারের ওপর কি করে ধার চেয়ে আনতে হয়, তা মলিনা জানে না। জানে না ন্যায্য কথাকে অতিকথার ভেজাল দিয়ে পরিবেশন করতে। অল্পতেই মলিনা হাঁপিয়ে উঠল। একবার রাগ হল হেনার ওপর। আবার মনটা

টাটিয়ে উঠল উপোসী মেয়ের মুখখানা স্মৃতিপথে উদয় হয়ে। কী পরিশ্রমই না ও আজ করেছে!

পাড়ার শেষ সীমানায় ধোপা বাড়ী। ধোপারা খুচরা চাল বেচে। মলিনা সেই পর্যন্ত যাবে স্থির করে মাথার ঘোমটাটা একটু ভাল করে টেনে দিল। সহসা কেউ চিনতে না পারে।

মলিনা যখন একা একা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এল তখন তার অবস্থা বর্ণনাতীত। লজ্জায় ঘৃণায় ক্লান্তিতে তার মাথাটা টলছে। মুখখানা লালচে হয়ে উঠেছে। চাল যা ছিল তা হাটে নিয়ে গেছে ধোপারা। মলিনার এখন অনুশোচনা হতে লাগল। কেন সে ঘরের বৌ হয়ে গিয়েছিল একা একা অতদূর এই গুরুতর দৈন্য জানাতে? ছিঃ ছিঃ! কাল ধোপারা ফেরি করতে বেরিয়ে মলিনার কথা নিশ্চয়ই গ্রামান্তরেও বলে বেড়াবে।

চোখ মুখ জ্বালা করছিল মলিনার। সে ঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে রান্না ঘরে প্রবেশ করল। চট্ করে সাহস হল না বড় ঘরে ঢুকতে।

একি? একি স্বয়ং অন্নপূর্ণার আবির্ভাব! কে রেখে গেল সের পাঁচেক সরু চাল?

মলিনা তার একটি মুহূর্তও কারুকে প্রশ্ন করে নষ্ট করতে রাজী নয়। সময় মত এ রহস্য অবশ্যই ভেদ হবে। সে তাড়াতাড়ি হাড়ি চড়িয়ে দিল।

ভাত হওয়া মাত্র, বড় ঘরের মেঝেতে হেনা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে ডেকে আনল। স্বামীকে ভাত দিল। অজয়কে এক্ষুণি আবার কাজে বের হয়ে যেতে হবে। অবশেষে মলিনা বৃদ্ধ শ্বশুরের দিকে দৃষ্টি দিল।

অজয় কেমন যেন মনমরা হয়ে খেল। তার পেট ভরল কিনা

সন্দেহ। কি ভাবে যে কি সংগ্রহ হল তা একটি বারও সে প্রশ্ন করল না। এ কেমন উদাসীনতা? যার সত্যিকারের দায়িত্ব সে রইল কিনা নির্বাক। মলিনার অন্তরটা একবার ব্যথায় মথিত হয়ে উঠল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কার্যান্তরে চলে গেল।

'বাবা তুমি যে কথা বলছ না? রাগ করেছ বুঝি? আমি তো কিছু বলিনি তোমাকে।'

'না মা তোমার ওপর রাগ করব কেন?'

'তবে তুমি মুখ ভার করে রয়েছ কেন? কি যেন তোমার হয়েছে, চোখ মুখ কেমন থাড়া থাড়া দেখাচ্ছে।'

অজয় ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠল।

হেনা ছুটে অন্য ঘরে গেল এবং ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এ থলিটা কার বাবা?'

'কোনটা?'

ধক করে উঠল অজয়ের মনটা। কেন কিছু টের পেল নাকি ও?

'আমি বলতে পারি ও-টা কার থলি।'

নিষেধ করবে নাকি? না, বুঝিয়ে বলবে এই বালিকাকে? কিন্তু কি বোঝাবে? বোঝাবার মত এমন কি রয়েছে?

'সেদিন দেখেছিলাম রসুল মাঝির কোমরে।'

সর্বনাশ!

'না না তারটা নয় রে তুই ভুল করেছিস মা।'

'তবে কার? কে দিল অমন থলেটা তোমায় বাবা? কি সুন্দর দেখতে।'

একটা মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে আর কটা মিথ্যা বলা যায়! কবির শ্বাস রোধ হয়ে আসে!

'তুমি অমন করছ কেন বাবা? তোমার মুখে যে কালি

মেড়ে দিয়েছে।' হেনা বিস্ফারিত চোখে বাপের দিকে চেয়ে থাকে।

সত্য সত্যই কি তার মুখমণ্ডল এতখানি বিকৃত হয়েছে? একটুখানি' হাসতে চেষ্টা করল কবি।

হেনা ভয়ে বিস্ময়ে ছুটে মায়ের কাছে গেল, 'মা, মা দেখে যাও, বাবার যেন কি হয়েছে—শীগ্‌গির এসো।'

ত্রস্তে হাতের কাজ ফেলে স্ত্রী ছুটে এল। 'কি গো কি হয়েছে?'

'কিছু তো হয়নি আমার—হেনা মিছিমিছিই তোমাকে ডেকে এনেছে।'

স্ত্রী চলে গেল নিজের কাজে। হেনা স্মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তার যেন ষোল আনা বিশ্বাস হল না।

স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়ে মনে বড় আপশোষ হল কবির। এ-ও তো মিথ্যা কথা। সে যেন মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছে। যত এড়াতে চাচ্ছে ততই যাচ্ছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়ে। সে এ মিথ্যার নাগপাশ ছিন্ন করবে কি উপায়ে?

'মা!'

'কি বাবা?'

'ঐ থলেটা নেবে?'

'তা অমন করে বলছ কেন? আমার যে বড্ড দুঃখ্‌খু হচ্ছে!'

'নেবে কিনা তাই বলনা আগে?'

'বাঃ রে তুমি সত্যিই আমাকে দেবে? পরের জিনিষ, তা তাকে কি বলবে? রসুল যদি এক্ষুণি এসে চায়?'

'না মা ওটা রসুলের থলে নয়—সে এসে চাইবে না। তুমি ইচ্ছা হলে নিতে পার।'

'সত্যি বলছ!'

অর্দ্ধেক বিস্ময়ে, অর্দ্ধেক আনন্দে হেনার মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'হাঁ, সত্যি নয় কি মিথ্যা? কিন্তু দেখিও না কারুকে। চুরি করে নিয়ে যাবে অমন সুন্দর জিনিষ দেখলে।'

'সত্যি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।' উত্তেজনার মুখে অনেকগুলোই মিথ্যা কথা বলে ফেলে কবি।

হেনা দৌড়ে বেরিয়ে যায়। কি চমৎকার থলেটা! কেমন নক্সী সেলাই! সুতোর রঙ খাটিয়েছে অপরূপ। সেই রঙের মোহেই পাগল হয়েছে হেনা।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে রইতে পারল না কবি। শত হলেও হেনা ছেলে-মানুষ তো!

সারা রাত ধরে ঘুমাতে পারল না কবি অব্যক্ত যাতনায়। ছিঃ ছিঃ সে এ কি করেছে? চুরি করে এনেছে তার চেয়েও এক অক্ষমের পুঁজি! যত প্রয়োজনই থাক, একি তার উচিত হয়েছে? এর পিছনে এমন কি যুক্তি সে খাড়া করতে পারে, যে যুক্তির জোরে সে খালাস পেতে পারে রসুলের নালিশ থেকে?

রসুলের পাঁজরের হাড়গুলো আবার যেন দেখতে পেল কবি। উপবাসে, দারিদ্র্যে, উৎপীড়নে জর্জরিত। লক্ষ লক্ষ বছরের মানুষের ইতিহাসের কলংক যেন খাঁজে খাঁজে দেদীপ্যমান। ওগুলো কি বর্বরতার ফসিল? কবির তন্দ্রা ভেঙে যায়।

অন্ধকার ঘরে সে একা জেগে ওঠে। শয্যা মনে হয় কণ্টকাকীর্ণ। জীবন মনে হয় বিস্বাদ। সে অস্থির ভাবে পদচারণ করে। বড় তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে তার। সে অনেক অনুসন্ধান করে একটু জল খায়। নিকটের একটা জানালা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

ঘরে ঘুমন্ত স্ত্রী ও কন্যা—বাইরে তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু ত্রিযামা প্রকৃতি।

ব্যথাতুর কবির সাড়া পেয়ে প্রকৃতি যেন জেগে উঠল। শ্লথ বেশবাস তার গুছিয়ে নিল। তার কিংকিনী ঝংকার যেন তারায় তারায় অনুরণিত হল অদৃশ্য ফুলের পাঁপড়ির মত ঢেউ একে একে। শুধু সে চুলের রাশে হাত দিল না! তা ছড়িয়ে রইল আকুল হয়ে কণকপুরের আকাশ প্রান্তর ব্যেপে।

কবি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'মহিমাময়ী ললনা, বলতে পার তোমার বয়স কত?'

লজ্জিতা প্রকৃতি যেন ঈষৎ সংকুচিতা হয়ে জবাব দিল, 'ছিঃ একথা কি জিজ্ঞাসা করতে আছে!'

'কেন?'

'রীতি বিরুদ্ধ। দেশাচার, লোকাচার, শাস্ত্রাচার, কিছুই কি তুমি জান না? রমণীর রহস্যই তো তার বয়স। সে রহস্য যে ভেদ করতে চায় সে তো শত্রু! শত্রুর কাছে কি কেউ সত্য তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে?' একটা সব্রীড় হাসির ঝংকার যেন কবির কানে এল। রিম ঝিম করছে সমস্ত কণকপুরের আকাশ বাতাস।

'আমি তোমার শত্রু নই—মহামিত্র—কিন্তু বড় বিপন্ন। তাই তো প্রশ্ন করছি এত সবিনয়ে। আমার কণ্ঠের আকুতি কি তোমার মর্ম স্পর্শ করছে না?'

'করছে কবি। কিন্তু রমণীর পরিচয় তো শুধু বয়সে নয়—অবশ্য সাধারণত যে বয়সটার কথা তোমরা ভাব। তার সামগ্রিক পরিচয় ক্রম বির্বতনের ছন্দে। কখন সে হাস্যময়ী বালিকা, কখন লাস্যময়ী যুবতী, কখনও বা স্নেহময়ী মা।'

'মা, মা।' অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে অসহায় কবি। 'তবে কি তুমি মা?' তার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

মহাপ্রকৃতি মৌন হয়ে থাকে। দিক চক্রবালে তার যেন স্নেহ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে।

সকাতরে কবি জিজ্ঞাসা করে, 'বলত মা এই ক্লান্ত ব্যথাদীর্ণ বালকের কাছে তোমার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা—ধরিত্রীর সত্য ইতিহাস।'

'বড় চমকপ্রদ, বললে কি বিশ্বাস করবে ?'

'নিশ্চয় করব। আমার আন্তরিকতায় কি তুমি অবিশ্বাস কর।"

'না—তবে বলছি, শোন।

ধরিত্রীর ইতিহাস শম্বুক, একলব্য, তুমি ও রসুল—তোমাদেরই ইতিকথা।'

'বল কি! একলব্য তো স্বেচ্ছায় তার বৃদ্ধাংগুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা দিয়েছিল।'

'তুমিও তো স্বেচ্ছায়ই চাকরী করছ, স্বেচ্ছায়ই রসুলের থলেটা এনেছ। স্বেচ্ছাচারের আর কটা নজির চাও ? ওকি মুখ লুকালে যে ?'

কবি চোখ বুজল, কপালের ঘাম মুছল—তারপর অনুমান করল পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।

একখানা বাঁকা হাসির মত নৈশ চাঁদ অস্ত গেল পশ্চিম দিগন্তে।

তিন

যত অন্তর্দাহই থাক না কেন কবি সকাল হতে না হতেই প্রস্তুত হয়ে নিল প্রাত্যহিক তাড়নার জন্য।

একটু একটু শীত পড়েছে—প্রথম কার্তিকের আমেজী শীত—সকলে এখনও বিছানা ছাড়েনি। কবি গাঁয়ের পথ ধরে সেই মাঠের দিকে এগিয়ে চলল। নগ্ন পায়ে ভিজা ফাগের মত ঠেকেছে পথের মাটি। রাত্রির শিশির টলমল করছে তরু, গুল্ম, লতা, পল্লবে। মাঝে মাঝে তৃণশীর্ষে যেখানে যেখানে সূর্য রশ্মি এসে পড়েছে, সেখানেই যেন হীরার কুচি জ্বলছে। এই কিছুক্ষণ পূর্বের জোনাকীগুলো কি উজ্জ্বল রত্নে রূপান্তরিত হল? কে এর মূল্য নির্ধারণ করবে?

সামান্য মুহুরীর এমন কি প্রতিভার সম্পদ আছে? যা কিছু তার অনুভূতির বৈভব তাও তো রাহুগ্রস্ত—ষড়যন্ত্রে বিক্রীত বিধ্বস্ত।

কবি এগিয়ে চলে—আবার তার পায়ে চলার ছন্দে ছন্দে জীবন সংগীত বেজে চলে অবিশ্রাম। অপরিচিত পোকা ডাকে, পাখী ডাকে, বনান্তরে এখনও শোনা যায় ঝিঁঝিঁর একটানা ঝংকার। সেই ঝংকারই যেন মাঝে মাঝে রূপায়িত হয়ে রয়েছে অজস্র বর্দ্ধিষ্ণু লকলকে লতায়।

খালপারের কেয়াপাতায় কে লিখেছে জীবন কাব্য? গাঢ় সবুজের ছোপ বুলান, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সারি বদ্ধ তীক্ষ্ণকাঁটা। বাঃ একি চমৎকার বিশ্বব্যাপ্ত জীবনের সংগে সাদৃশ্য। একটু হাসি পায় অজয়ের। কবিতার সংগে সংগেই কাঁটা, যেমন মধুর সংগে সংগেই হুল।

কিন্তু তবু রয়েছে ঐ কেয়ার মর্মকোষে শ্রাবণ রজনীর গন্ধ বিভোল আশা। ঘন নেশা জীবন মদের, তাইত চলেছি আমরা যুগযুগান্ত এগিয়ে—

অফুরন্ত পথ, তবু চলেছি, চলেছি এক ক্রান্তি থেকে ভিন্ন ক্রান্তিতে। যুগে যুগে ভেঙেছি, আজ এসে প্রায় মিশেছি রসুলের পংক্তিতে। সেই একই পংক্তির মানুষের হরণ করলাম পুঁজি। আমি বিশ্বাসঘাতক অপাংক্তেয়। আমি প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত আমাকে ক্ষমা করো না রসুল। কবির হৃদয় বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।

আবার রূপময় জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কবির চোখের সুমুখে। পূর্বাকাশ এমন লাল হল কি করে। গাঢ় আলতা পরা পায়ের চিহ্ন কে রেখে গেল এঁকে ? না, না কি যেন কি ফুল ফুটেছে গাছে গাছে। থোকায় থোকায় লাল ফুল—আলো করেছে আকাশের আঙিনা। তন্ময় হয়ে দেখছে কবি।

তার মনের আকাশ জুড়ে আবার ঘনিয়ে এল ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণ পক্ষের মেঘ। সেই মেঘের তলে দলে দলে যাত্রী চলেছে—সকলের মুখেই রসুলের ছাপ যেন। সবাইর স্বার্থের এবং শ্রমের পুঁজি যেন কেড়ে নিয়ে তাদের নিরাশ্রয় করে ঠেলে দেওয়া হয়েছে উন্মুক্ত আকাশের তলে। দলে দলে যাত্রী চলেছে সর্বহারা।

আবার কবি চমকে ওঠে।...

কিছুতেই তার নিষ্কৃতি নেই।

মুখোমুখি হয়ে গেল একটা পথের বাঁক ঘুরতেই।

'তুমি কবে এলে কুসুম ? সব ভালত ?'

'হ্যাঁ ভাল। কাল এসেছি।'

'কাজে চলেছি, অন্য সময় কথা হবে।'

'কিন্তু সময় কি তুমি পাবে—আমার তো মনে হয় না। ইচ্ছা নেই সময় হবে কোত্থেকে ? সময়ের হাত পা নেই, তাকে করে নিতে হয়।'

'তুমি তো সবে কাল এলে !'

'টের পেয়েছ, তবু তো আসনি! তোমার আবার সময় হবে!'

শুধু অভিযোগ, শুধু অভিযোগ। চিরন্তর অভিযোগের বোঝা নিয়ে যেন এই মেয়েটি জন্মেছে। যখনই কবিকে একান্তে পেয়েছে তখনই সে ভারাক্রান্ত মনে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যে ভার সমাজের দিক থেকে, কর্তব্যের দিক থেকে কবির পক্ষে হাল্‌কা করা এক প্রকার দুঃসাধ্য।

তবু পরম বিস্ময়ের বিষয় দুজনকে দুজনে কি করে যেন একদিন ভালবেসে ফেলেছিল। ভুল করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সে ভুল শ্লেটের অংক নয় যে একটু হাত দিয়ে মুছলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একটু চোখের জল পড়লেই যাবে ঝাপসা হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে।

'কি করে টের পেলাম? জানলাম তো এই মাত্র।'

'তা হবে হয়ত। কিন্তু মলিনা তো জানে। সে তোমায় কিছু বলেনি?'

'না।'

বলবে কেন? নিতান্ত অকৃতজ্ঞ যে! মিছামিছিই মলিনাকে মনে মনে ভর্ৎসনা করে কুসুম। চাল পাঁচ সের কাল কে রেখে এসেছিল অযাচিত ভাবে গিয়ে? বাজ পক্ষিণীর মত কুসুমের ভায়ের বৌ—নিয়ে যেতে হয়েছিল তার চোখে ধূলো দিয়ে। সমস্তই সেয়ান বৌ বুঝেছে কিন্তু বলেনি স্বামীকে। আচ্ছা দেখা যাবে—এক মাঘে আর শীত যায় না। আবারও কুসুমের পায় ধরতে হবে।

ছিঃ ছিঃ কুসুম এসব কি ভাবছে উত্তেজনার মুহূর্তে? নির্দোষ মলিনাকে কেন সে টেনে আনছে পংকে। যে তো পংকজিনী। উর্ধ্বমুখীন্ যার গতি, যার পরিণতি কুসুমে, যার গৌরব সৌরভে, তাকে কেন সে অহেতুক টেনে আনছে মালিন্যে। কোনও দিনই মলিনা বেশী কথা বলে না, স্বভাবেও তার উচ্ছ্বাস নেই, অভাবেও তার হাহাকার নেই—সে যেন সংসারে থেকেও অনেকটা নিস্পৃহ। নইলে সে কিনা

জানে—কিন্তু কোনও একটি অসতর্ক মুহূর্তেও তো কারুর কাছে কিছুই প্রকাশ করেনি। স্বামীর কাছেও না, স্বামী সোহাগিনীর কাছেও নয়।

স্বামী সোহাগিনী! আরক্ত হয়ে ওঠে কুসুম।

ওরা অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে একটা শিউলি গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েকটা সদ্য শিশির ভিজা ফুল এসে পড়ল কুসুমের মুখে বুকে ও মাথায়। বড় ভাল লাগল।

কিন্তু কবি কি তা দেখল? কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দেবী প্রতিমার মত একটি মনলোভা ভংগিতে।

কবি বলল, 'তবে যাই কুসুম। দেরী হয়ে গেল অনেক।'

দেরী কি আমারও হচ্ছে না, মনে কর কি আমারও কাজ নেই সংসারে—পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে গালগল্প করে বেড়াই কেবল?'

'সে কথা তো আমি বলিনি। তুমি কি বসে থাকার মেয়ে?'

'তবে তুমিই শুধু ব্যস্ততা দেখাচ্ছ কেন—এই যে আমিও যাচ্ছি চলে। এসেছিলাম খালের ঘাটে জল নিতে—তাড়াতাড়িতে কলসীটা দোর গোড়ায়ই ফেলে এসেছি।' মনভোলা ভংগিখানি নিমেষে ভেঙে দিয়ে কুসুমই আগে চলে গেল অবহেলায় কতগুলো শিউলি ফুল মাড়িয়ে।

কবি মেঠপথ ধরে চলতে থাকে। তার চারদিকে জীবন সংগীত যেন করুণ বেহাগ বাজতে থাকে। এত করুণ বলে তার মনে হয় যে এক্ষুণি বুঝি চোখে জল আসবে! গাঙে মাছের মিছিল, স্থলে ফুল পল্লব গরু বাছুরের মিছিল, অন্তরীক্ষে ওড়ন্ত পাখির মিছিল সবই যেন ঝাপসা একাকার হয়ে যেতে চায়। গেছে একটি লোক লোক, গেছে বুঝি রাগ করেই চলে কিন্তু কাঁদিয়ে গেল যেন জগৎকে।

কবি এবার একেবারে ঘাসের পার ঘিষে চলছে। পায়ে পায়ে ঘাসের ভিজা শীষ জড়িয়ে যাচ্ছে। বেগুনী ফুলের মুকুট মাথায় দু একটা

কচুরীপানার দল দল-ছাড়া হয়ে ভেসে চলেছে নদীর মোহনায়। স্রোতের তোড় একেবারে কম নয়, যা কিছু লতা পাতা গুল্ম ভেসে আসছে তা থামছে না, হয়ত দু একটা ছোট আবর্তে ঘুরে, আবার চলেছে সুমুখে। এই চলার ছন্দও রয়েছে কবির জীবনে—কিন্তু একটানা, এক ঘেয়ে, বড় বিস্বাদ।

কি উদ্দেশ্য তার এ চলার? নিজের ইচ্ছায়, নিজের গতিতে তো চলতে পারছে না, চলছে স্রোতের ধাক্কায়—অপরের পীড়নে। এ তো শাশ্বত অনাহত গতি নয়, মানুষের অমানুষিক যান্ত্রিক দাসত্ব।

কবে কোন আদিম প্রভাতে সূর্য উঠল পূর্বাচলে জাগতিক রহস্যের প্রথম অহমিকা—তার দাঢ্য ও বৈরাট্য নিয়ে, অগণিত সরল জনতা ভুল করল—মাথা নত করল সম্ভ্রমে। সে মাথা তো তারা আজও তুলতে পারল না। ভুলতে পারল না যে তারা কত ক্ষুদ্র! সেই ভুলের ফসলই তো তারা বুনল সমাজের সংস্কারে ক্রমে রাষ্ট্রে। দিল গোষ্ঠী-পতির হাতে প্রস্তরফলক, করল চেংগিস খাঁকে সম্রাট।

মানুষ তো ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় জনতা। কবি ভাবে—যত বৃহৎই হক না কেন সূর্যের বৃত্ত, মানুষের আয়ত্ত তার তুলনায় আরও বৃহত্তর—চোখ বুঝলে সে নিমেষে কল্পনা করতে পারে সহস্র সৌর জগতের।

কুসুম যে তাকে পেল না, তার ভিতরও তো রয়েছে যত ঘুণে ধরা অসাম্যের ব্যবস্থা। গলিত সমাজ, দূষিত বায়ু—আয়ু পরমায়ু ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল মানুষের। প্রভাতের উন্মুক্ত প্রান্তরেও কবির নিশ্বাস টানতে যেন কষ্ট হয়।

কুসুমের ব্যর্থতা দলে দলে পুঁজিহারা যাত্রীর রোদন ওকে পাগল করে তোলে।

ওর এগিয়ে চলার ছন্দ কেটে যায় বারম্বার। ও বিবশ হয়ে বলে,

আমাকে ক্ষমা কর, নিষ্কৃতি দাও সবাই। আমি তো আর এ ভার বইতে পারিনে। সইতে পারিনে ভুলের জ্বালা।

কবি অভিযোগ তোলে না কারুর বিরুদ্ধে।

তাই তো সবাই তাকে যেন আবার জড়িয়ে ধরে, হে সংবেদনশীল তুমি যদি নিষ্কৃতি চাও, আমাদের কি দশা হবে ?

রসুল এল যেন পংক্তি ভেঙে সুমুখে,—এ কিসের মর্মস্পর্শী নজির ?

ওর আপাদ মস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করল কবি। লজ্জায় শুধু চোখের দিকে তাকাল না।

সভ্যতা ওর কেশে, সভ্যতা ওর বেশে, বহুপুঁথি পুস্তক সংবাদ পত্রে বিমোহিত চিত্তহারিণী সভ্যতাই বুঝি কাঁদছে ওর পেটে !

কবি আবার লজ্জা পেল। জীবন সংগীতের তাল কেটে গেল ঝন্ ঝন্ ঝনাৎকারে।

কবি এক পথে যেতে ভুল করে নিজের বাড়ীতেই ফিরে এল। যখন সে বাড়ী ফিরেই এসেছে তখন সে আজ আর কাজে, যাবে না। বসে থাকচে নিস্তব্ধ পুকুর পারে। বসে থাকবে খেজুর গাছটার তলায়। নিরালায় সময় কাটিয়ে দেবে অনেকটা। পুকুর পারের এই স্নিগ্ধ গাছপালার পরিবেশ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়—কোন গাছটিকে না সে চেনে, কোন পাতাটিকে সে না ভালবাসে—কিন্তু ওরা যেন হারিয়ে যেতে বসেছে অপরিচয়ের আবর্তে। কবি যত যান্ত্রিক হচ্ছে ততই তার জড়তা ও মূঢ়তা বাড়ছে, ভুলে যাচ্ছে তার অতি প্রিয়জনের মত এই শ্যামলা অনুপমা চির পরিচিতাকে। দিনের প্রতিটি দণ্ডপল, ত্রিযামা রাত্রির প্রতিটি মহার্ঘ্য মুহূর্ত কে যেন ছিনিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। কবি ললিতা কাব্যের লীলায়িত ছন্দ, অর্থ, রাগিনীর স্বাদ পায় না বহুদিন, সে যে কত দিন তা কবি যেন স্মরণই করতে পারে না—দুটি চোখের তারা

ভরে সে পান করত এই রূপধারা। তাও যেন কে কেড়ে নিতে বসেছে আজ সে এসেছে তার উগ্র তৃষ্ণা মিটাতে।

আজ তার ছুটি।

একটি গানের কলি গুনগুনিয়ে ফুটে ওঠে তার মনে।

চার

দিনের পর দিন ঝড় চলেছে কবির জীবন সমুদ্রে। সেই ঝড় অনেক দিন বাদে আজ বুঝি থামল। এক প্রকার সে জোর করেই থামাল। সে চেয়ে থাকবে শান্ত অনাহত জলরাশির দিকে। এ জল কি গতিহীন —তা নয়। ক্ষুব্ধ নয় ব্যথায় এবং বাত্যায়। কান পেতে শোন গান আছে মর্মে, ধীর নাচনের মাতন আছে অন্তরে।

কুসুম নয়, মালতী এসেছিল ঘাটে। কবি হাত তালি দিতেই তার দুধের বোঁটা থেকে যেন খসে এল একটি ফুলের মত ছেলে। কী হাসি তার মুখে, কী অমৃত তার ঠোঁটে!

মালতী লজ্জায় ও বিস্ময়ে বুকের আঁচল সামলাল কোলের ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে। 'আজ হঠাৎ কাজে কামাই দিলে যে?'

'দিলাম ইচ্ছা হল? রোজ রোজ আর জোয়াল-টানা ভাল লাগে না।'

এও তো এক প্রকার মিথ্যা গৌরব করা হল। কবি কি ইচ্ছা করলেই কামাই করতে পারে—পারে নিরালার অবসর যাপন করতে? তার চেতনার পুষ্পাঞ্জলি পারে কি মহত্তর কোন প্রেরণার উদ্দেশ্যে সময়ের গংগায় ভাসিয়ে দিতে? না, সে তা পারে না।

তবে আজ সে কি করে পারল?

অভিশপ্ত থলেটাই তাকে শক্তি দিয়েছে—নিঃস্ব রসুলের রক্ত? কবি বিরস মুখে চেয়ে থাকে। থলেটা অভিশপ্ত বই কি! শয়নে জাগরণে, বিশ্রামে কিছুতেই কবিকে ছাড়ছে না। যখনই সুবিধা পাচ্ছে তখনি যেন লৌহ সাঁড়াসি দিয়ে ওর হৃদপিণ্ডটা চেপে ধরছে সজোরে।

মালতীর নাম শুধু মালতী নয়—মধুমালতী। খুব বড় ঘরের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে দোজ বরের সংগে অতি দরিদ্র সংসারে। এই যে হীন উত্থান পতন নয় বিলয় এরই পরিণতি এ বিবাহ।

মালতীর স্বামী শিল্পী কিন্তু কিছুতেই যেন সুবিধা করতে পারছে না জীবন সংগ্রামে। সে কাজ জানে নানা রকম। একটা ভাঙা ষ্টোভ দাও, মেরামত করে দেবে। একটা হারমনিয়ম দাও—ভেঙে, নতুন করে গড়িয়ে সুর বেঁধে দেবে। ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন কি না সে সারতে জানে নিপুণ কারিগরের মত। প্রয়োজন হলে সে চিকিৎসা করতে পারে বিজ্ঞবৈদ্যের মত। এ ছাড়া সে ছবি আঁকতে জানে বিস্ময়কর। কিছু দিনের জন্য সে নাকি ছিল শান্তি নিকেতনের ছাত্র। তুমি আর ভাঙা ঘরে পা দাও, আশ্চর্য হয়ে যাবে সাধারণ সাদা কাগজে তুলির টান দেখলে। রং নেই শুধু ভূষো কালি দিয়ে এঁকে হোগলা পাতার বেড়ায় কি চমৎকার ছবি টানিয়ে রেখেছে।

এত যে গুণ তবু তার পরণের গামছা ঘোচে না। আছে একখানা মাত্র ধুতি, তা অতি প্রয়োজনে পরে বয়স্ক ছেলে নয়ত বাপ। তাই একজন যখন বের হয় আর একজন থাকে ঘরে।

সময় সময় মালতীর দিকে তো চাওয়াই যায় না—উলটে লজ্জা পাবে সে-ই যদি কেউ নিতে যায় ওর দুর্দশার সুযোগ।

তবু গাংগুলীর ঘরে ঢুকলে কেউ অভাব অভিযোগের কথা সহজে শুনবে না—বরঞ্চ একটু খানি স্থির হয়ে দাঁড়ালে কানে আসবে রবীন্দ্র

কাব্যের দু চারিটি উজ্জ্বল পংক্তি, আবৃত্তি করছে মালতী মধুক্ষরা কণ্ঠে।

মালতীর স্বামী এবং অজয় সমবয়সী না হলেও কথা বলত তুমি, তুমি করে। প্রথম একটু বাধো-বাধো ঠেকলেও কবির সেই সম্পর্কটাই বর্তে গেল মালতীর সংগে। গরীব গৃহস্থের ঘরে এসে যে নামটা একেবারে নিরাভরণা হয়েছিল, তাই মাঝে মাঝে সালংকারা হত কবির কণ্ঠে—সাধারণ মালতী ছন্দিতা হয়ে উঠতে মধুমালতী সম্বোধনে। এ ছন্দের রেশ যে কত দূর গিয়ে শেষ হত কবি তা জানত না। সে কিছু জানা বা পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে কখনও ডাকত না—ডাকত মনের আনন্দে।

'ছেলেটা তোমার এত বড় হয়েছে—তাই, তাই, তাই—আয় আয় এই দিকে আয়।'

কবির ডাকে দস্যি ছেলে চলে টলমল করতে করতে। ওঠে, পড়ে আবার এগিয়ে যায় হেসে হেসে।

'তাই, তাই, তাই'……

শিশু ভোলানাথ আসছে যেন নাচতে নাচতে। ও-ই শুধু টলমল করছে না, টলমল করছে যেন সারা পৃথিবী।

শিশু স্থির হল……আবার বুঝি এগিয়ে চল তাথৈ তাথৈ নৃত্য। ওর কচি দুখানা চরণের ভারই যেন বসুন্ধরা সামলাতে পারছে না। তাই বুঝি সমস্ত বনস্থলীর পরিবেশের সংগে সংগে আকাশ এবং সূর্যও কাঁপছে।

'তাথৈ তাথৈ তা থিয়া' থিয়া……তুড়ি দিতেই শিশু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কবির বুকে। কবি কিছুক্ষণ আবেশে তন্ময় হয়ে রইল।

'এর মধ্যে এত বড় হয়ে গেলি আমি দেখলাম না।' কবি শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'সংবাদটা তো একটু জানতে হয়।

ছেলের হয়ে মা জবাব দিল, 'প্রাণের টান থাকলে কারুকে কিছু জানতে হয় না। কবি, ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে······হয় না।' মালতী হাসল চোখ টিপে।

এ হাসির ব্যঞ্জনা আরও কত যে মধুর হ'ত ওর চোখের পরিখায় দৈনন্দিন সংগ্রামের ছাপ না থাকলে। সংগ্রাম তো সত্যিকার মুখোমুখি যুদ্ধ নয়— বেঁচে থাকার গ্লানি—জীবনের ভাঁড়ামী।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এর মধ্যেই তো উথলে ওঠে যৌবন, উপচে পড়ে কাব্য—জন্মে শিশু নৃত্য রক্ত ভোলানাথ।

শিশুর সংগে কবি আলাপ জুড়ে দিল। তার বিষয় বস্তু যেমন অভিনব, উত্তর ও তেমনি অদ্ভুত। সাধারণের বোধের বাইরে।

মালতী ঘাটের কাজ শেষ করে, ছেলেকে নিতে এল। কবি একটা চুমো খেয়ে শিশুকে ছেড়ে দিল।

'যেও কবি তোমার বন্ধুর বাড়ী, না হয় ভুল করেই এক সময় যেয়ে প'ড়ো—বেশি দূর তো নয়। যে তোমার কথা দিনের মধ্যে দশবার বলে তাকে একটু না হয় খুশিই করলে—অন্য কারুর কাছে থেকে তো প্রত্যাশার কোনও আশংকা নেই। যেও কিন্তু আজই।'

'যাব যাব মধুমালতী—নিশ্চয় যাব। বিশেষ করে ওর নাচের মূল্য দিয়ে তো যেতেই হবে আমাকে।'

'কিন্তু ওর মাও তো একদিন নাচতে জানত।'

'সে নাচের মূল্যও কি আমাকেই দিতে হবে?'

'তুমি কেন স্বয়ং ঈশ্বর এসেও সে নাচের আর মূল্য দিতে পারবে না। সে নাচ ভেঙে গেছে, সে হিল্লোল মিলিয়ে গেছে তোমাদের অভিশাপে। এখন তোমাদের কাছে দাবী করতে চাই খেসারৎ। আর্জি দিয়ে যদি ডিগ্রী করিয়ে নেওয়া যেত!'

মনে হল যেন একটা আচমকা ঝড় চেপে মালতী চলে গেল। এখন আর তার শূন্য স্থানটায় মধু নেই, রয়েছে যেন একটা দ্বেষের বিষ।

জনার্দন না হয় গাংগুলীর ধানকড়ারী বিত্তটুকু নিলাম করিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু কবি কি অনিষ্ট করেছে ওদের? তবে কবির কাছে কেন দাবী করল ক্ষতিপূরণ?

চক্রবর্তী যদি না-ই নিতেন গাংগুলীর বিত্তটা সুকৌশলে হরণ করে, তবুও কি মালতী গাংগুলীর মত দোজবরের ঘরে এসে পারত নাচতে—যেখানে রয়েছে প্রায় মার বয়সী প্রথম পক্ষের ছেলে?

আবার গাংগুলীকেও ঠিক দোষী বলে ধরা যায় না। যখন প্রথম বিয়ে করেছিল, তখন তার অবস্থা এত হীন ছিল না। ডান হাত বাঁ হাত চলত এক রকম।

ঘর আছে ঘরণী নেই, বাসন আছে, ভোগের উপায় নেই, এযে কি বিড়ম্বনা, তা গাংগুলীর মত মধ্যবয়সী বিগতদার ছাড়া উপলব্ধি করতে পারবে না। সন্ন্যাসী নয় যে গেরুয়া পরবে, বৈরাগী নয় যে একতারা বাজাবে—শূন্য ঘর কি করে বাকী দীর্ঘজীবন ধরে একা একা পাহারা দেবে? সব বেচে কিনে একদিকে তো চলেও যাওয়া সম্ভব নয়। গাংগুলী কয়েক বছর মনের সংগে লড়াই করেছে, দিনের বেলাটা কাটিয়েছে, ছেলেটাকে নিয়ে, কিন্তু অভিশপ্ত রাত্রি তো আর কাটতে চায় না। গ্রীষ্ম, বর্ষা শরতের রাত্রি যদি ও বা কাটে, কিন্তু কিছুতেই যেন শেষ হতে চায় না শীতের সুদীর্ঘ নিশা। গৃহীর পরম তৃষ্ণা উগ্র হয়ে ওঠে। একটু কথা বলতে চায়, একটু রহস্য করতে চায়, বুঝতে চায় যে সে জীবন্মৃত নয়। প্রস্তরীভূত হয়ে যায়নি তার রক্ত মাংসের দেহ। এ কাব্য নয়, নিতান্তই গদ্য। কিন্তু ছন্দ আছে গার্হস্থ্য জীবনের।

কত রাত্রি সে ছবি এঁকে কাটিয়েছে। তবুও তার সময় যেন কাটতে চায়নি। ছবি কামনা করে ছায়া, তারপর কায়া, তারপর জীবন।

অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গাংগুলী স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল না যে সে বিকৃত করবে মধুমালতীর জীবন।

অনুসন্ধান করে কবি ধরে ফেলতে চেষ্টা করল এর জন্য দায়ী কোন্ বিষময় অবিচার।

অর্থাভাব, কলহ, গৃহ বিবাদে জরাজীর্ণ পিতা পায় ঠেলে দিয়েছিলেন মালতীকে। গাংগুলী তাকে মাথায় তুলে নিয়েছিল। তবু মালতীর মন ভাঙ্গেনি এই অসাধ্য মিলনে। সে দায় ঠেকে সন্ধি করে নিয়েছে, কিন্তু সন্ধির সমস্ত সর্তগুলো আজও মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু শাস্ত্রের যাবতীয় সার তথ্যগুলো দিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছে, সতী সাবিত্রী বেহুল্যার কাহিনী পড়েছে একান্ত অন্তঃকরণে—শয়নে, জাগরণে স্বামীকে ধ্যান করেছে ঈশ্বরের তুল্য, তবু তার মনে হয়েছে এ সবের ভিতর কোথায় রয়েছে যেন একটা বিরাট ফাঁকি। সত্যের মোড়কে যেন নিঃসন্দেহে চলে যাচ্ছে মেকি অলংকার।

প্রতিভা যে প্রতিভাকে সম্মান করত না—তা নয়। স্বীকৃতিহীন শিল্পী স্বামীর জন্য যে গভীর সমবেদনা ছিল না, তাও নয়। শুধু মালতীর ছিল না ঐকান্তিক নির্ভরযোগ্য প্রেম। যে প্রেমের জন্য নারীর কাছে পুরুষের বয়স বা পৌরুষই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন অর্থ প্রাচুর্যের—যার একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী।

এককালে ছিলেন গোষ্ঠীপতি, তারপর ছত্রপতি—আজ শ্রেষ্ঠিপতি বলেই জগৎ সভার ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্টা।

সেই সভারই সভাকবি যখন গেয়ে ওঠে—

নহ মাতা নহ কন্যা,

নহ বধূ সুন্দরী রূপসী

হে নন্দন বাসিনী উর্বশী…

মালতী যেন তখনি খেসারৎ দাবী করে।

অজয় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। ছিঃ ছিঃ আবোল তাবোল সে ভাবছে কি? মালতী তো আজও রবীন্দ্র কাব্য সময় অসময় আবৃত্তি করতে ভালবাসে। তবে এ ভালবাসা কি তার জ্বরের বিকার? জীর্ণ দৈনন্দিন ম্যালেরিয়া?

কিছুই স্থির করতে পারে না অজয়।

পাঁচ

গভীর রাত্রে কুসুমের ঘুম ভেঙে যায়।

'একটা আলো, আলো দিতে পার আমাকে?'

কে আলো চাইছে? নিশি ডাকছে না তো? ভয়ে হঠাৎ ছম ছম করে উঠল তার গা। একবার তার মনে হল স্বরটা অতি নিকটে—একেবারে তার জানালার পাশটিতেই বুঝি। তারপর তার মনে হল—না, বেশ খানিকটা দূর থেকে ডাক আসছে। ঠিক যেন অজয়দের বাড়ীর কাছ থেকেই।

যদি নিশিতেই ডাকবে তবে সে কণ্ঠ এত মধুর হবে কি করে? এত আবেদনই বা আসবে কোত্থেকে তার মধ্যে?

আবার শোনা গেল, 'একটা আলো. আলো জ্বালা কেউ অনুগ্রহ করে।' এবার আকুতি আরও গভীর। বেদনা আরও প্রাঞ্জল।

কুসুম সবে কাল শশুর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এসেছে। এসেই ছুটে গিয়েছিল অজয়দের বাড়ী। তখন মলিনা ঘরে ছিল না, অজয়ও গিয়েছিল স্নান করতে। কুসুম এ সংসারের এতখানি অন্তঃস্থল পর্যন্ত খোঁজ রাখত, যে সে সংবাদ সে নিজের সংসারের জন্যও কোনও দিন রাখা প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই সে চট করে রান্না ঘরে গিয়ে ভাতের

হাড়ির ওপরের সরাটা তুলল। বেলার দিকে চাইল একবার। তারপর বাড়ী থেকে চাল এনে রেখে চলে গেল গোঁসাই মণ্ডপে পিতাকে প্রণাম করতে। কাল সে ইচ্ছা করেই আর অজয়দের বাড়ী গেল না। আজ সকাল বেলাই করল খানিকটা জ্বালা প্রকাশ।

উত্তরে অজয় তো কিছু প্রকাশ করল না। সেই অমায়িক কণ্ঠ সেই মধুর মৃদু সম্বোধন, 'কুসুম কবে এলে—সব ভালতো ?'

এত মাধুর্যও তোমাকে দিয়েছিল বিধাতা! কিন্তু কেন দিয়েছিল ? বড় ক্ষোভে কুসুম জিজ্ঞাসা করল আবার, কেন, কেন কবি ? যে ফুল যে দেবতার পূজায় লাগবে না, সেই ফুল কেন ফুটবে তার মণ্ডপের সুমুখে ?

সেই কবির কণ্ঠেরই আবেদন শুনতে পেল কুসুম। হ্যাঁ ঠিক অজয়েরই গলা। সে বিছানা ছেড়ে উঠে একটা প্রদীপ জ্বালাল। অতি সন্তর্পণে দরজা খুলল।

কুসুম বাহিরে পা দেওয়া মাত্র তার দাদা শয্যা ত্যাগ করতে বাধ্য হল স্ত্রীর আংগুলের খোঁচায়।

'এইবার একটু বাইরে বেরিয়ে দেখ তোমার সতী লক্ষ্মী ভগ্নীর কীর্তি। আমার কথা তো বিশ্বাসই করবে না, এইবার নিজের চোখ দুটো একটু সার্থক করে এসো। বলি আমাদের নাকি কেবল গলা সুড়সুড় করে। যত ভয় ভয় করে মুখ বুঁজে চললাম, ততই মন্দ হলাম আমরা। হায় ভগবান! 'সহসা করুণ রসের পর্দাটা উল্‌টে যায়। শ্রীমতী সজোরে একটা চিমটি কেটে বলে, 'বেতো ঘোড়া, এখনও উঠতে পারলে না। ও তো এক্ষুণি ঘরে ফিরে এল বলে! শেষে বাবা মাকে ডেকে কি দেখাবে ?' শ্রীমতী এই সুযোগেই কুসুমের নিকট রুদ্ধ করতে চায় তার পিত্রালয়ে কপাট। টানাটানির সংসারে কুসুম একটা স্থায়ী উপসর্গ। তা যদি দূর হয় এই সুযোগে তা কি আলস্য করে ত্যাগ করা উচিত ? শ্রীমতী বলবে না কেন স্বামীকে বেতো ঘোড়া ?

কুসুমের দাদা চীৎকার করে উঠল, 'উঃ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও শ্রীমতী—এক্ষুণি আমি উঠছি। কিন্তু দাঁড়াবে একটু মাইরি। চোর, ডাকাত, এমন কি ব্রহ্মদত্যিও তোমাকে দেখলে এগুতে সাহস পাবে না। একটু দাঁড়াও না ভাই।'

যজ্ঞেশ্বরের কথা শুনে শ্রীমতী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। যজ্ঞেশ্বর অমনি দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল তীরের মত।

শ্রীমতীর চোখ জ্বালা করে দু' ফোঁটা গরম জল বেরিয়ে এল। এমন মূর্খের সংগেও তাকে আজন্ম কাটাতে হবে! কোলে পিঠে করে টানতে হবে এরই পংগপাল। ধরণী দ্বিধা হও!

কুসুম এগিয়ে চলল। হাওয়া এল হাতের প্রদীপটা নিভিয়ে দিতে। কুসুম চলল অঞ্চলে আবৃত করে। হাঁটা কি যায়? সুমুখে করমজা কাঁটার ঝাড়, পিছনে ভ্রাতৃবধূর শ্যেন দৃষ্টি। যখন হাওয়া একটু থামছে তখন প্রদীপটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কিন্তু মাঝে মাঝে লজ্জায় যেন মাথা নত করছে কুসুমকে দেখে।

এখনও একখানা ছোট বাগান পেরিয়ে যেতে হবে। পাত্‌লা সুপারি নারকেল গাছের বাগান। দু' একটি কদম্ব লেবুরও গাছ আছে অবিন্যস্ত। কুসুম চলে শংকায় দ্বিধায় ত্রস্তে।

'এই যে আলো কবি, এত রাত্রে আলো দিয়ে কি করবে? তুমি ঘামছ কেন, কাঁপছ কেন, তোমার কি হয়েছে? মলিনা কি সজাগ নেই?'

'খুব সম্ভব ঘুমে—নইলে সে সাড়া দিত।'

'তুমি এসময় বারান্দায় যে? এত রাত্রে একা একা বসে কি করছ? আলো দিয়ে কি হবে?'

'আমি লিখব। ঘরে ভাল লাগে না, তাই বাইরে বারান্দায় এসে বসেছি।'

'কি লিখবে এত রাত্রে ? চক্রবর্তীর মাথা না মুণ্ডু ?'

'তা নয় কুসুম। এ রাগ কিংবা দ্বেষের কথা নয়। আমি লিখব—'

কবি ভয়ে ভয়ে কুসুমের মুখের দিকে তাকায়। বাক্যটা আর শেষ করতে পারে না। 'আমি লিখব, কিন্তু তুমি বাধা দিতে পারবে না।'

'কি লিখবে পাগল ? এই প্রদীপটা নাও, যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। দেখছি তোমার মাথা খারাপ হতে আর বেশি দেরী নাই।'

একদিন কি সুন্দরই না দেখাত কবিকে, যখন সে কলকাতা কলেজে পড়ত। সে আর ক'দিনের কথা ! আজ তার কানের কোলের চুলে পাক ধরেছে ! মুখে চোখে পড়েছে কঠিন জীবন যুদ্ধের ছাপ। কিন্তু তীক্ষ্ণ নাসিকা, সুগভীর ভ্রূরেখা এখনও ইংগিত জানাচ্ছে বিগত বসন্তের।

'শেষ পর্যন্ত তুমিও আমাকে ভুল বুঝবে কুসুম ? আমি কবি, আমি কি কেবলই মিথ্যার বেসাতি করে যাব ? কিছু সত্য কথা লিখব না ? উদ্ঘাটিত করব না মানুষের নির্মম স্বরূপ ? শুধু ললিত কাব্য লিখে আর কত কাল নেশায় মাতাল করে রাখব মানুষকে ? জনতা যে উজাড় হয়ে গেল। কাল শুনতে যদি মালতীর কথা।'

'বড় ব্যথা পেয়েছ, না ? তবে লেখ লেখ তারই কথা !'

'না কুসুম তার একার কথা দিয়ে জনতার মর্মকথা লেখা যায় না— সেখানে তুমি আমি সবাই স্থান পাব, রইবে কৃষক, শ্রমিক, নেয়ে মাঝিরা পর্যন্ত। তাদের দুঃখ বেদনা হবে এ কাব্যের উপজীব্য।'

'এর মধ্যে আর নতুনত্ব কি আছে অজয় ? বহু গাথাই তো এ নিয়ে রচিত হয়েছে। রাজপুত্তুর কোটালের পুত্তুরের আমলের দীন-দুঃখী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কথা থেকে, রবীন্দ্রনাথের নিষ্কৃতি কবিতাটিতে পর্যন্ত কোথায় না অশ্রুজল রয়েছে অমর অক্ষরে লেখা ?'

'তবে আমি এতক্ষণ ধরে কি ভাবলাম! দাঁড়াও দাঁড়াও কুসুম— সব গুলিয়ে দিলে যে !'

কবি আবার কাঁপতে থাকে।

যে কথা কবি ভেবেছে, সে কথা গতানুগতিক কথা নয়, গড্ডালিকা প্রবাহে সে গা ভাসিয়ে দেয়নি, চায়নি সে মৃত্যুমুখী জনতার দুঃখকে অমরতার রাঙতায় মুড়ে পরিবেশন করতে। সে যা চেয়েছে তা নবতম অভিব্যক্তি—দুঃখী সংগ্রামী মানবতার মুক্তি। কবি ভেবেছে অনেক, কিন্তু ভাব তার এখনও থমথম করেছে ধরিত্রীর জন্মলগ্ন পূর্বক্ষণের নীহারিকাপুঞ্জের মত—। প্রাঞ্জল হয়েছে মহাশূন্যে, কিন্তু এখনও দানা বাঁধেনি মৃত্তিকার মধু রসে। এ অমরতার কাব্যবিলাস নয়, এ বেঁচে থাকার জন্য যুগ বিপ্লব। কবি তার অনুভূতির তপ্ত রসে রসিয়েছে সবই, অথচ পরিবেশন করতে পারল না কুসুমের কাছে। তাই সে রইল ক্ষোভে দুঃখে অর্থ থাকতেও দেউলিয়ার মত চেয়ে।

'আমি তো আর দাঁড়াতে পারি নে কবি।'

'না পার যাও, বাধা তো দিচ্ছি নে আমি।'

'কিন্তু তুমি যে অসুস্থ। এখনও তোমার শরীর কাঁপছে, ঘাম রয়েছে কপালে! কি হয়েছে তোমার সত্যি করে বলবে কি?'

'আমি সুস্থ হওয়ারই প্রয়াস পাচ্ছি—একেবারে সুস্থ। তুমি যাও তোমার এ অনুগ্রহ মনে থাকবে।'

যত মিষ্টি কথাই হক, কুসুমের কাছে এ যেন ভাল লাগল না। সে ভদ্রতার চাইতে চায় আন্তরিকতা। মধুর চাইতেও সে চায় নুণের কুটুম্বিতা।

পিছন থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'কুসুম হল?'

উজ্জ্বল প্রদীপটা ত্বরায় নিভিয়ে দিয়ে কুসুম চকিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

স্বভাবভীতু যজ্ঞেশ্বর কুসুমের পিছন পিছন উর্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে মিনতি করতে লাগল, 'ও কুসুম দাঁড়া একটু দাঁড়া বোন। আমার দোষ

নেই, তোর বৌদি আমাকে এই শীতের মধ্যে পাঠিয়েছে চিমটি কেটে, ওর নখের যে কী জ্বালা···একটু দাঁড়া ভাই দাঁড়া।'

চেঁচাতে চেঁচাতে যজ্ঞেশ্বরই আগে এসে ঘরে ঢুকল—কুসুম এল পরে। ঘর দুয়ার অন্ধকার। কেউ যে জেগে আছে বোঝা গেল না। তবে একটা গুরুগম্ভীর নিস্তব্ধতার আভাস পেল কুসুম। সে কিছু গ্রাহ্য না করে দরজার চৌকাঠায় পা ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

একই ঘরে চার পাঁচখানা বেড়া দিয়ে পৃথক্ পৃথক্ খোপ তৈরী করা।

মা জিজ্ঞাসা করলেন নেপথ্যে। 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল এত রাত্রে?'

পরিষ্কার গলায় কুসুম জবাব দিল, 'অজয়দের বাড়ী।'

আর একটু তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন মা, 'কেন?'

'জান না বুঝি? বৌদিকে জিজ্ঞাসা কর।'

'আমাকে আবার জড়াচ্ছ কেন ঠাকুর ঝি?'

'সব জেনেশুনে যে গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলে সেই জন্য। যদি না-ই জান, তবে আজ বলি শুনে রাখ—অজয়কে আমি ভালবাসি। ভালবাসার জন ডাকলে সাড়া না দিয়ে পারে এমন শক্ত মেয়েলোক অন্তত আমি নই?'

কুসুমের জবাব শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। সত্য কথা, হাজার সত্য হলেও এমন উলংগ করে যে কেউ বলতে পারে তা কারুর জানা ছিল না। তলোয়ারের কি ধার, তার চেয়েও যেন শতগুণ তীক্ষ্ণ!

সকলকে নির্বাক দেখে কুসুম একা একাই নিজের মনে বলে যেতে লাগল, 'ধিক ধিক শত ধিক তাদের, যারা জেনে শুনে ঘাড়ের বোঝার মত আমাকে জলে ঠেলে দিয়েছে। ভালবাসলাম এক জনকে, গলায় পরিয়ে দিল আর একজনের। অভাবের জন্য তো এসব করেছি,

করেছ স্বভাবে। বলবে বামুনের মেয়ে, অজয় কায়স্থ, কি করে বিয়ে হয়? হল না, একজনের গলায় ছুরি দিলে—সমাজ তোমাদের কি দিল? এ গাঁয়ের সমাজপতি জনার্দন কি তোমাদের বন্ধকী জমি খালাস দিয়েছেন? পেয়েছ কি এবারের বর্গা ফসল বাঁশফুল ধান?'

কিছুক্ষণের জন্য কুসুম চুপ করল। ঘরে যে মানুষ আছে তা বোঝা গেল না। কুসুমই আবার বলতে লাগল, 'বৌদি সব দিয়ে একটা কিছু না পালটালে শুধু, আমাকে ধরে টানাটানি করলে তোমাদের শ্রী বৃদ্ধি হবে না। কেবল লোক হাসবে, মুখ বাড়াবে এই মাত্র।'

কুসুম ভাল করে লেপখানা গায় দিয়ে একেবারে চুপ করল।

যাদের লক্ষ্য করে কুসুম এ সব কথা বলল, তাদের মনে কি যে আন্দোলন সৃষ্টি হল বলা যায় না। এই নির্যাতিতা কন্যার জন্য একজনের প্রাণ শুধু অশ্রুভরা মেঘের মত থমথম করছিল—তিনি হচ্ছেন কুসুমের দরদী পিতা সোমেশ্বর। বৃদ্ধ পণ্ডিত স্ত্রী ও পুত্রবধূর তাড়নায় মেয়েকে বিয়ে দিয়েই বুঝেছিলেন কি যেন একটা বিরাট সত্যকে তিনি অস্বীকার করে গেলেন। অক্ষয় এবং অব্যয় একটা প্রেমকে যেন কেটে ঝালাই করে এঁটে দিলেন অপরের সংগে। তিনি সবই জানতেন। কি করে যে কুসুম ও অজয়ের বাল্য, কৈশোর, ও যৌবন কেটেছে তা কি তিনি চোখের উপর দেখেন নি।

তবু তাকে অন্ধ বলত স্ত্রী ও পুত্রবধূ। পাছে কিসে কি ঘটে তাই সোমেশ্বর কুসুমের বিয়ের কথা উঠলেই এড়িয়ে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু যখন স্ত্রী রীতিমত দৌরাত্ম্য জুড়ে দিলেন তখন তিনি নীরব থেকে একেবারে অনিচ্ছায়ই মত দিলেন।

তাই তিনি কখনও কুসুমকে কোনও কড়া কথা বলতে সাহস পেতেন না। অন্যায়ের ওপর আর কত অন্যায় বাড়ান চলে!

'সোমেশ্বরের পূর্ব পুরুষেরা পণ্ডিত ছিলেন। বাড়ীতে চিরদিনই

টোল ছিল। ছাত্র এবং শিষ্য ছিল প্রচুর। সোমেশ্বর যখন দূর দেশ থেকে কাব্যের উপাধি নিয়ে বাড়ী এলেন তখন নানা বিশৃংখলার দরুণ টোলটির ঘটল অপমৃত্যু। তিনি আর তাঁর জীবনে টোল স্থাপন করতে পারলেন না। অনেকবার পত্তনের চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার জনার্দনের পিতার নিরুৎসাহে সে প্রচেষ্টা অংকুরেই ধ্বংস হল। এখন তিনি নিজে নিজেই কাব্যচর্চা আরম্ভ করলেন।

শ্রোতা ছিল কুসুমের মা। তাঁর এসব মোটেই ভাল লাগত না। প্রথম প্রথম চক্ষু লজ্জায় তিনি কিছু বলতেন না। মেঘদূত কিংবা অন্য কোনও কাব্য যখন জমে উঠত তখন তিনি উসখুস করতেন। ধান ঝাড়তে হবে, চাল মাপতে হবে, তেলনুণ আনাতে হবে দোকান থেকে। একটা শ্লোক পাঠ করে যখন ব্যাখ্যা করছেন সোমেশ্বর তখন দেখেন যে রসময়ী নেই। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাব্য বন্ধ করতেন এর পর একদিন কিসের যেন ব্যাখ্যা শুনে রসময়ী বলেই ফেললেন, 'পণ্ডিত বামুনের ছেলে হয়ে কি যে ছাই ভস্ম সব ইতরেমী শিখেছ, ও সব আমাদের বাপ দাদার বয়সেও শুনিনি। কেন, আমার বাবা ও দাদা দেখি ন্যায়ের পণ্ডিত, এসেছেন কাশী থেকে উপাধি নিয়ে। তাঁরা তো তোমার মত অভদ্র নন।

এই উক্তির পর দীর্ঘ পনর কি ষোল বছর কাব্য বন্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে কুসুম যখন একটি একটি করে পাপড়ি মেলতে আরম্ভ করল যৌবনের— চাইতে লাগল গাঢ় চোখে, তখন এক একদিন তিনি মেয়েকে ডেকে মেঘদূত খুলে বসতেন।

সোমেশ্বর ব্যাখ্যা করতে করতে কোন রসলোকে যেন চলে যেতেন। কুসুম যেন প্রিয়তমা বান্ধবীর মত চেয়ে থাকত বিগত যৌবন পিতার দিকে। ক্রমে সেখানে যেন পিতা নেই, কন্যা নেই শোনা যায় শুধু যক্ষিনীর প্রণয়াকুতি আর দূরাগত যক্ষের ক্রন্দন। এমনি করে মুখে মুখে কুসুমের

কাব্য শাস্ত্রে অধিকার জন্মাল। শ্রীমতীর এ সব ভাল লাগত না। রসময়ী তো পরিষ্কারই বলতেন, 'ও মেয়ে বেরিয়ে যাবে।' তাঁর যা হিংসা হত তা স্পষ্ট হয়ে উঠত উগ্র কণ্ঠস্বরে।

শ্রীমতী শ্বাশুড়ীর কাছে এসে চুপে চুপে বলল, 'মা আপনি অনেক সাবধান করেছিলেন—অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন।'

কিন্তু আমার কথা কেউ কানে তুললা না। রাম না জন্মাতে রামায়ণ লিখেও লাভ হল না। বাপ যদি আস্কারা দেন মার আর সাধ্য কি থাকে বৌমা? আমার মরতে ইচ্ছা করছে।'

যত মৃদু স্বরে মধু ঢেলেই সমবেদনা জানাক শ্রীমতী—তত মৃদু এবং মধুরতার কণ্ঠ নয়। তাই লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত শর ঠিকই পৌছাল।

সোমেশ্বর মর্মবেদনায় চেপে চুপ করে রইলেন। কুসুম আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বোধ করল।

হয়ত সোমেশ্বর কিছু বললেও বলতে পারতেন, কিন্তু আজকাল তিনি পুত্রের আয় ও পুত্রবধূর সেবার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সেইজন্য তাঁরা অবচেতন মনে ছিল একটা দারুণ দুর্বলতা ও নৈরাশ্য জনিত ক্লান্তি।

এক যজ্ঞেশ্বর ব্যতীত, এতগুলো তীক্ষ্ণ ধী স্ত্রীলোক ও মহাজ্ঞানী সোমেশ্বর--প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভুল বুঝলেন। সকলের মনই বিরূপ হয়ে রইল অস্বস্তিতে। সংসার মনে হতে লাগল অত্যন্ত তিক্ত যেন কোয়াসিয়ার আরক। বোধ হয় গহন অরণ্যও এর তুলনায় শ্রেয়। কিন্তু সত্যই কি সংসার এত বিস্বাদ? তা নয়। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মধু আছে, পদে পদে কাব্য। কিন্তু এ সকলই বৃথা পরস্পরকে ভুল বোঝার জন্য। এ ভুল মানুষের স্বভাব সঞ্জাত নয়—একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় পৌনে পনর আনাই বণ্টনগত,—চাপান। তাই গৃহে গৃহে জনতা আজ খণ্ডিত বিভ্রান্ত। তাই বুদ্ধিমতী শ্রীমতী দেখতে পারে না

কুসুমকে—আর শ্রীমতী হয়েছে কুসুমের চক্ষু শূল অথচ এরা এক ঘরেরই প্রায় সমবয়সী ননদ ভাইয়ের বৌ।

চিরাচরিত একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে এদের সম্পর্কে—অনেকটা চাঁদের কলংকের মত, কিন্তু সেই কলংককে কেন্দ্র করে পল্লী বাংলার ঘরে ঘরে দেখা যায় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত প্রীতি। কুসুম কিংবা শ্রীমতী কেউ কারুরই পর নয়।

ছয়

অজয় যখন কলেজে পড়ত তখন মেধাবী ছাত্র বলেই তার খ্যাতি ছিল। কিন্তু আসলে সে ছিল একজন মহা অনুভূতিশীল মানুষ। সেই অনুভূতিই একদিন কাব্যাকারে দেখা দেয় তখনকার সাময়িক পত্রিকায়। ছাত্র ও বন্ধু মহলে অজয়ের নাম পালটে যায় অমনি। কেউ শ্রদ্ধা করে, কেউ বা ভালবেসে ডাকতে থাকে কবি বলে।

হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পেয়ে অজয় বাড়ী আসে। আর সে ফিরে যেতে পারল না কলকাতা। তার সংগে সংগেই কবি নামটাও দেশে এল। কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বোধনটা এখানে ব্যংগাকারে ছড়িয়ে পড়ল। দিন.দিন নানাবিধ চক্রান্তে ও মামলা মোকর্দ্দমার ষড়যন্ত্রে যেমন অজয়দের অবস্থা পড়তে লাগল, কবি নামটাও তেমনি উঁচুপংক্তি থেকে নীচুপক্তির দিকে ক্রমে নেমে চলল ধাপে ধাপে।

চক্রবর্তীর পিতার বুদ্ধি ছিল সূক্ষ্ম। সেইজন্য হঠাৎ তাঁর মনে হল অজয়ের বাবার সংগে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। কারণ যতীশ রায় বিদেশে চাকরী করেন—হাতেও কিছু পয়সা আছে।

'যতীন অনেক দিন বাড়ী এসেছে, একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি।'

অতি নম্রভাবে যতীন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কথা বলুন চক্কোবর্তী কাকা? আমার দ্বারা সম্ভব হলে নিশ্চয় সে কথার মার্যাদা আমি রাখব।'

'বস বস যতীন, ওরে যতীনকে কায়স্থের হুঁকোটা জল করে দে এক্ষুণি, ও ভজা। তুমি মুখ দিয়ে প্রতিশ্রুতি না দিলেও আমি বিশ্বাস করতাম তোমার ঐকান্তিকতায়।'

যতীন রায় মহা সন্তুষ্ট হয়ে বসলেন। তামাক এল সুগন্ধি? টানতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

দুটি হাঁটুর ভিতর থেকে, একটি মাথা উঠল শ্বেত ভল্লুকের মত। চোখ দুটি ঘোলাটে, কিন্তু চকচক করছে বুদ্ধিতে। সেই চোখ জোড়া যতীন রায়কে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল এক দৃষ্টে। যখন যতীন রায় মুখটান দিয়ে একটু বিব্রত ও মশগুল হয়ে পড়লেন তখন চক্রবর্তীর পিতা আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'জানত আমাদের লক্ষ্মীনারায়ণ জাগ্রত।'

'জানি কাকা খুব জানি—আমি তো আর ভিন্ন দেশের ছেলে নই। কেন ঠাকুরের কি মন্দির গড়িয়ে দিতে হবে?'

'না।' যে জবাব দিল সে জনার্দনের পিতা নয়—জনার্দনের ভগ্নী—বালবিধবা। বয়স খুব বেশি হলে কুড়ি। শুভ্র বেশ বাসে জয়ন্তীকে অতি পবিত্র বলে বোধ হল। 'না রায় মশায় আমাদের লক্ষ্মীনারায়ণ এখন পর্যন্ত আচ্ছাদনের তলেই আছেন। ইঁটের মন্দিরও মন্দির, টিনের মন্দিরও মন্দির।'

যতীন রায় অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'তবে কি সোনার মুকুট…'

'মনে করেন কি তাও নেই আমাদের ঠাকুরের?'

'না, না, সে কথা নয়—তবে কি জান জয়ন্তী দিদি, যদি ঠাকুরের

আরও প্রয়োজন থাকে, আরও দেওয়া যায়. তাতে তো দোষ নেই। তিনি নির্লোভ, নিষ্কাম—তাঁকে যতই অর্পণ কর না কেন, তিনি হ্যাঁ না কিছুই বলবেন না।'

'তা ঠিক রায় মশায়, কিন্তু আমাদের লোভ তো কিছুতেই চাপা থাকবে না। ভেবে দেখুন মনে মনে আপনিই কি বলবেন?'

ধূর্ত শৃগালের মত একটু হেসে উঠলেন জানার্দনের পিতা। বললে তো অনেক কিছুই তিনি বলতে পারতেন—মেয়ের কথারই আগে টাল সামলাক না যতীন রায়।

'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউর নাম করে সেখানে কাকা আমাকে ডেকেছেন, সেখানে অত ভাবা না-ভাবার প্রশ্ন ওঠে না। জানি ঠাকুর তোমাদের নিজস্ব, কিন্তু গ্রামের আর পাঁচ জনের তো অধিকার আছে সেবা কারার।'

'সেইজন্যই তো বাবা আপনাকে ডেকেছেন। শুনুন তবে—গত রাত্রে বাবাকে স্বপ্ন দেখেছিলেন ঠাকুর, আমাদের কুলগুরুর নাকি বংশ লোপ হয়েছে—এখন ঠাকুরের আদেশ বাবাকে দীক্ষাগুরু হতে হবে রায় বংশের।'

যতীন রায় প্রাচীন হয়েছেন--গুরুকুল নির্মূল হওয়ার তাঁর চিন্তার অবধি ছিল না। তিনি আনন্দে নেচে উঠে বললেন. 'এ তো আদেশ নয় জয়ন্তীদিদি, আশীর্বাদ। আমি আগামী সপ্তাহেই দীক্ষা নেব।'

যথানিয়মে দীক্ষা সারা হল।

জনার্দনের পিতা একান্তে মেয়েকে ডেকে বললেন, 'কি যে বুদ্ধি তোর জয়ন্তী! কায়স্থদের উঠ্‌তি ঘরটাকে একেবারে বিনি স্থতোয় গেঁথে ফেললি। এ গাঁয়ে আর আছে কে—সব তো চাষাভূষা।

'আমার বুদ্ধি তো নয় বাবা—এ একেবারে ঠাকুরের নির্দেশ। বিষয় বিষ নয় রে, ভিত্তিভূমি? সেইটা পোক্ত না হলে কি করে

গড়বি আমার প্রেমের মন্দির ? অফুরন্ত ভোগের সামগ্রী যদি আয়ত্তে না থাকে তবে বুঝবি কি করে ত্যাগের মাহাত্ম্য ? তাই বিষয় সম্পদ আমাদের চাই-ই চাই। এবং তা রক্ষা করার জন্য গ্রামের সামান্য এক জনকেও তুচ্ছ করা উচিত নয়।'

'তুই এত শিখলি কি করে মা ?'

'অন্তর্যামী শিখিয়েছেন।' সেরেস্তা এবং মণ্ডপ বেশী দূর না। বৈধব্যের পর এই দশ বছর ধরে জয়ন্তী লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরেই দিনের বেশীটা ভাগ কাটায়। দশখানা গ্রামের, জেলার, এমন কি কলকাতা হাইকোর্টের খবর পর্যন্ত তার কানে আসে সদা সর্বদা। সামান্য একটি কথারও সে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না করে ছাড়ে না। সে এখন পিতার দক্ষিণ হস্ত।

জয়ন্তী চলে গেলে তার পিতা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ও নিতান্তই হতভাগ্যা—নইলে ও রাণী কেন—বুদ্ধি, বিদ্যা, বিবেচনায় সম্রাজ্ঞী হওয়ার উপযুক্তা।

নতুন একটা সম্পর্ক হওয়ার চক্রবর্তী বাড়ী যতীন রায়ের আসা যাওয়া ক্রমে বেড়ে গেল। একদিন বুড়ো চক্রবর্তী বললেন, 'যতীন কিছু ধানী জমি কর। নগদ টাকা পয়সা কখনও হাতে থাকে না। বৃদ্ধ বয়সের সম্বল—পুত্রের চেয়েও সমধিক এই ধানী জমি যদি সুযোগ বুঝে কিনতে পার।'

'এখন তো হাত শূন্য—সব খরচ হয়ে গেল।'

'ব্যস্ততার কি আছে, পরে ক'রো। কিন্তু এখন আমার খোঁজে চমৎকার ছ বিঘা জমি ছিল। আউশ পৌষ উভয় খন্দ জন্মে। মেঘের মত আউশ আর সোনার মত আমন, দেখলে বুক ঠাণ্ডা হয়। তা থাকগে—পরে ক'রো।'

কি মন্ত্র কানে ঢুকিয়ে দিলেন বুড়ো চক্রবর্তী, যতীন রায় বিদেশে

গিয়ে আর সুস্থ থাকতে পারলেন না। পরে ক'রো, কেবলই তাঁর কানে উল্টা বাজতে লাগল—আজই করো, আজই করো।

যতীন রায় টাকা পয়সা ধার কর্জ্জ করে গুরুর নামে পাঠাতে লাগলেন।

কৃতকর্মা গুরুও একতিল সময় নষ্ট না করে জমি খরিদ করে চিঠি লিখে জানালেন যে, বাবাজিউ কার্য সমাপ্ত।

উত্তরে যতীন রায় জানালেন, আমি একখানা লাঙল জুড়তে চাই। কারণ জমি দখলে রাখা মংগল।

জবাব পেলেন গুরুর, অত দ্রুত সব কিছু করা, ভাল নয়। যারা পূর্ব থেকে বর্গা চাষ করছে তারা খাবে কি।

আর পত্রালাপ হল না। ছুটি পাওনা না থাকলেও পৌষের প্রথম যতীন রায় মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করে দেশে চলে এলেন। এবং ধান দেখে তিনি মনে মনে এত দূর সন্তুষ্ট হলেও যে স্ত্রীকেও বাধ্য করলেন সেই বৎসর দীক্ষা নিতে। এমন হিতাকাংখী গুরু জগতে দুর্লভ।

একদিন কথায় কথায় দলিলের কথা উঠল—তুললেন সদ্য দীক্ষিতা স্ত্রী।

'তোমরা বড় সন্দেহপরায়ণা জাতি।'

'রক্ত মোক্ষণ করা টাকা দিয়েছ—দলিল নেবে, এর মধ্যে সন্দেহ-পরায়ণা জাতির কথা ওঠে কি করে?

'জান আমি সরকারী চাকুরে, আমার নামে কোনও দলিল হওয়া ঠিক নয়।'

'তবে কি সরকারে চাকুরেদের কোনও ভূসম্পত্তির দলিল হলে হবে গুরুর নামে—চমৎকার ব্যবস্থা তো!' ইষ্টমন্ত্র জপ করা স্থগিত রেখে স্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে কেউ ছিল না। স্ত্রী তীব্র

কণ্ঠে ব্যংগ করলেন, 'তোমাদের মত সাধুও ভক্তিমান পুরুষ ছিল বলেই, এককালে নাকি কোনও কোনও জায়গায় চলতি ছিল সদ্য বিয়ে করা বৌকে প্রথম গুরুর কাছে এনে…'

চুপ কর, চুপ কর। একথা কেউ শুনে ফেললে দলিল তো দূরের কথা —বুড়ো চক্রবর্তী জমি পর্যন্ত উপড়ে সাগরের জলে ডুবিয়ে দিতে পারেন। তিনি ভালর অতি ভাল, আবার মন্দের পক্ষে নিতান্তই মন্দ।'

'টাকা পয়সা দিয়ে আমরা অত ভাল মন্দ হতে গেলাম কেন ? আগেই তো বলেছিলাম—ছোট খাট চাকুরের জমিদারী সয় না। উঃ কি ধড়িবাজ!'

স্ত্রীর শেষের মন্তব্যটা তীক্ষ্ণ। যতীন রায়ের বুকে বড় বাজল। তিনি বললেন, 'তুমি আহ্নিকটা তো আগে সারো।' তারপর লাঠি গাছ নিয়ে চক্রবর্তী বাড়ীর উদ্দেশে বের হলেন।

সেখানে রামায়ণ ব্যাখ্যা হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। গ্রাম্য সাধারণ বুঝুক যে চক্রবর্তীও শ্রীরামচন্দ্রের তুল্য। ভক্তির সমুদ্রে তখনকার মত ভোগ বাসনা বিষয়-আশয়ের কথা ডুবে তলিয়ে গেল। যতীন রায় অধিক রাত্রে যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন তিনি গলদশ্রুভাবে গদগদ। রামের মহানুভবতা, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, জানকীর পতিভক্তি তাঁকে উন্মাদ করে দিয়েছে। এত সব বৃহৎ কথার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল তাঁর অতি ক্ষুদ্র ছ বিঘা জমির কথা।

শয়ন কক্ষে ঢুকে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'যা শুনে এলাম তারপরে আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে না। কাল তুমিও সংগে যেও।'

'কেন? দলিল খানা দিয়েছেন বুঝি? তাই বুঝি ভাব আর ধরছে না প্রাণে?'

'না গো, রামায়ণ ব্যাখ্যা শুনে এলাম। একজন চমৎকার কথক এসেছেন যেন কোত্থেকে? যদি তাঁর মুখের ব্যাখ্যা শুনতে! আমি এখনও চোখের জল সামলাতে পারিনি।'

স্ত্রী উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলেন তারস্বরে, ‘ইহ জীবনের সমস্ত পুঁজি খুইয়ে যা করেছ তার কি হল—দলিল ?”

‘সে কথা বলার সময় তো আজ হয়নি।’

‘আর হয়েছে ! হাটে গেলে চাল কিনতে, কিনে নিয়ে এলে গাঁজা। কাল থেকে আমি আর ওর দেওয়া মন্ত্র জপ করব না—তাতে আমার ইহকাল পরকাল যদি যায়ও, যাক। উঃ ভবিষৎ বলতে কিছু রইল না। শেষ পর্যন্ত আমার গয়না কখানাও ওর পেটে গেল।’

‘অস্থির হচ্ছ কেন, জমির তো ধান পাচ্ছ

‘তুমি কিছু বুঝবে না। আয় করেছ, সঞ্চয় করে দেখনি। তার ওপর আবার রইল মানুষের দেনা। আমি পরিষ্কার দেখছি রায় বংশ ডুবল। যেটুকু সমুদ্রে চরা দেখেছিলাম, তা মিছে।’

তার পর দিনই যতীন রায়ের স্ত্রী অসুস্থ হলেন। তিনি আর উঠলেন না। ভিতরে ভিতরে একটু সংজ্ঞা থাকলেও তিনি আর ইষ্টমন্ত্র জপ করলেন না। শুধু এই মায়াময় পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। যারা রইল তাদের হবে কি ?

এ ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে। বুড়ো চক্রবর্তীও আর ইহলোকে নেই, যতীন রায়ও নানা কারণে চাকরী খুইয়ে দেশে এসেছেন। অজয়ের বিয়ে হয়েছে, যতীন রায়ের আর দুটি ছেলেও বড় হয়েছে—অর্থাৎ সেয়ান হয়েছে। একটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা। ঘটনা অনেক ঘটে গেছে—শুধু একটি মাত্র কাজ আজও উদ্ধার হয়নি। সেই ভক্তি সরোবর থেকে আজও যতীন রায় দলিলরূপ রক্তকমলটি চয়ন করে আনতে পারেন নি। বুড়ো চক্রবর্তীর আমলে যে ধান পেতেন, জনার্দনের আমলে এখন তা ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দু এক সন অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। যতীন রায় শয্যাশায়ী। প্রায় বাকশক্তি রহিত। কিন্তু চেতনা আছে সম্পূর্ণ। এখন আর তাঁর মনে

ভক্তি মুক্তির কথা নেই, শুধু বালকের মত আহার্যর লোলুপতা। যখনই তিনি তা ঠিকঠাক না পাচ্ছেন, তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছেন।

অজয় ভাবছে : এই তো বিশ্ব নিখিলের আদিম স্বরূপ অনৈস্বীকার্য —বর্বর চেতনা।

ঢুলু ঢুলু তন্দ্রালু চোখে কবি বলছে : না, না আরও আছে, আরও আছে।

অজয় জবাব দিচ্ছে, কি আছে— কুয়াশা, রোমন্থন, নৈরাশ্য, জড়তা?

কোন উত্তর আসে না।

সাত

সম্পূর্ণ একটা দিন বন্ধ গেছে। আজ নিশ্চয়ই লোক আসবে চক্রবর্তী বাড়ী থেকে। অজয় সকাল না হতেই মুখ হাত ধুতে গেল রওনা দেবে বলে।

গত রাত্রির মহা সংবেদনশীল কবি, আজ প্রত্যুষে কি যেন কি তাড়নায় ফিরে এল গতানুগতিক জীবনে। কেন সে আলো চেয়েছিল, কেনই বা কুসুম তা নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল—কিছুই আজ আর তার মনে নেই। বাড়ী ফিরে গিয়ে কুসুমের কি যে পরিণতি হল তাও কবি একবার চিন্তা করে দেখার অবকাশ পেল না।

হেনা বলল, 'বাবা কাল রসুল এসেছিল।'

'কেন—কেন সে এসেছিল? হঠাৎ একটা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হল কবির মুখে চোখে। ধমনীগুলো বুঝি চঞ্চল হয়ে উঠল। তার তো এখানে আসার কোনও হেতু নেই। কেন থাকবে না? ভেবেছ

যাদের ঠকিয়েছ তারা মূর্খ? তারা আপাতত নীরব বলে শক্তিহীন? তা নয় কবি, তা নয়। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বিষময়—আঘাতের প্রতিঘাত অনিবার্য। শুনে আঁৎকে উঠছ যে?

পিতার অবস্থা দেখে ছুটে মাকে ডাকতে যাচ্ছিল হেনা। কবি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, 'রসুল কেন এসেছিল মা?'

'সে জানতে এসেছিল আমরা কেউ আজ কাল কোথাও বেড়াতে যাবো নাকি। ও তো নাও বেয়ে খায়।'

মেয়েটাও জানে যে রসুল গরীব—সামান্য কেরায়া বাওয়া ওর পেশা। নইলে কেউ উপযাচক হয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে মরে।

কবি তার মেয়ের চাইতেও অনেক বেশী জানে। জানে যে রসুল নামেই মাঝি, নৌকা চলে খোদার ইচ্ছায়, অপরের কৌশলে। তা না হলে সে হালে পানি পায় না কেন? বারমাস দরিয়ায় কে তুফান তোলে?

তবু তো কবি তার থলেটা ফেরৎ দিয়ে এল না। রিক্ত থলেটা কি করেই বা ঘুরিয়ে দেওয়া চলে? নারকেলের শাঁসটুকু কুরিয়ে কুরিয়ে খেয়ে, শূন্য মালাটা কি ফেরৎ দেবে?

তা হয় না।

কিন্তু, কিন্তু স্বীকার তো করা যায়—নতজানু হয়ে বলা তো চলে—আমি তোমারটা নিয়েছি, ফিরিয়ে দেব একটু সময় হলে। চোখের জলে তো বুক ভাসিয়ে দেওয়া যায়, ওরে চোর, কথা না বলে।

সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে···

ওরে, তোর সে কবিতা কই, যে কবিতা তুই একদিন পড়তিস্ তন্ময় হয়ে? মনময় তার সাড়া কই, কোথায়ই বা অনুরণন?

তস্কর চুপ করে রইলি যে ?

তখন বুঝি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছিস ? বাপের কষ্টার্জিত পয়সায় ত্রিতলের মেসের বাতায়ন ভিজিয়ে দিয়েছিস ?

অজয় বলে, ভুল করেছি।

এক্ষুণি সে নিজেই যাবে, রসুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে আসবে—ভাই থলেটা সত্যিই আমি নিয়েছি, তবু আমি নির্দোষ। চলো বুঝিয়ে বলব তুমি আমি একই চক্রান্তে কেমন বিভ্রান্ত।

অজয়ের কোল থেকে বেরিয়ে হেনা চলে গেছে অনেক দূরে কি জানি কি একটা পাখীর ডাক শুনে। বৌ কথা কও, নয়ত ঝুঁটি মাথায় বুলবুলি। চেয়ে আছে এক মনে বাদাম গাছটার মগ ডালের দিকে।

অজয় বেরিয়ে যাবে, সেই সময় তাদের ঘরে শুনতে পেল কান্না। স্ত্রীলোকের কণ্ঠ। যেন বিশেষ পরিচিত।

'ও ঘরে কে মলিনা ?'

'আর এগিও না।'

'কেন ?'

'লাভ হবে না, মিছামিছিই লজ্জা পাবে। তার চেয়ে বরঞ্চ কাজে চলেছ—চলে যাও।'

এমন কি ঘটনা যা মলিনা জানে, অথচ জানতে দিতে চাচ্ছে না স্বামীকে ? অজয়ের আর জিজ্ঞাসা করতেও সংকোচ বোধ হয়—কিন্তু কৌতূহল অদম্য হয়ে ওঠে। তবু সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মলিনা তো মাথা হেঁট করে রয়েছে একপাশে দাঁড়িয়ে।

'ও পাড়ার বসন্ত জেলের মেয়ে না ?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে তো অনেকদিন দেখিনি। ও এখানে আমাদের ঘরে এল কোথেকে ? ওরা তো কক্ষণো আমাদের ঘরে ওঠে না।'

'না—জল-চল্ করেছে ছোট্‌ঠাকুর পো।'

'সঞ্জয়!'

'হ্যাঁ।'

ধীরে ধীরে মলিনা বলে যে প্রায় মাসখানেক ধরে ঐ মেয়েটাকে নাকি তালাচাবি দিয়ে রেখেছিল—ওর বাপ মা। আজ হঠাৎ খালাস পেয়ে ছুটে এসেছে সঞ্জয়ের কাছে। এক্ষুণি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু ঠাকুরপো নাকি রাজী নয়।

'ষোল বছরের একটা কচি ছেলের লেখাপড়া ছেড়ে এই সব কীর্তি, আচ্ছা আমি যাচ্ছি।'

'যেও না।' হাতখানা ধরে ফেলে মলিনা। 'যেও না।'

'কেন যাব না, কি বলছ তুমি—হাত ছাড়ো শীগ্‌গির।'

যে মলিনা বেশী কথা বলে না, সে আবার বাধা দেয়। যেও না —আমাদের কালশত্রু জনার্দন চক্রবর্তী।'

'জনার্দন!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ওৎ পেতে আছে। বাবা মৃত্যু শয্যায়—হঠাৎ মারা গেলে, ওদের হাত করে তোমাকে ভদ্রাসন ছাড়া করবেন। এখনও গলগ্রহ ভগ্নী রয়েছে ঘরে।'

যেন সাপের মাথায় কে একমুঠো মন্ত্রপূত ধুলো ছেড়ে দিল। অজয় ছড়িগাছা নিয়ে পথে নামল।

'এই তো সংসার! এই তো ভাই বন্ধু মিত্র! লেখাপড়ার সংস্রব ছেড়ে অজয় দেশে এসে ভেবেছিল, সংসারের মহাকাব্য রচনায়ই সে নিজেকে নিবেদন করে দেবে। সুখ এবং পরমানন্দই যদি মানুষের কাম্য হয় সে সুখ ও আনন্দ তো রয়েছে সর্বত্রই। কেবলমাত্র কবিতার ছন্দ এবং যতিতে তাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারেনি আজ পর্যন্ত।

কিন্তু কী সুখ তার এ সংসারে? কি আশায় খেয়ে মরা?

সে নির্জন পথে এসে পড়েছে। বৃক্ষ, গুল্ম লতাপাতার জগতে। প্রভাতের ঘুম ভাঙা পরিবেশ। শাখায় শাখায় মত্ত পাখী, বনে বনে ফুল। কখনও পাখীগুলোকেই ফুল বলে ভ্রম হয়, আবার কখনও হাওয়ায় দোলা ফুলগুলোকেই পাখী বলে মনে হয়। পাখী নয়, যেন রঙিন প্রজাপতি। দল বেঁধে এসেছে, চাপ বেঁধে রয়েছে। ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাবে যেন কোন অনামা এক গল্পলোকে।

পায় পায় জড়িয়ে যাচ্ছে ভিজা ভিজা নরম মাটি।

কিছুই যেন আজ কবির চোখে ধরা পড়ছে না। তার অন্তরের নৈরাশ্য বাহিরে এনে দিয়েছে গভীর ঔদাস্য। সে অন্ধের মতই যেন চলেছে।

'কে যাচ্ছ?'

'ব্রজ। কৃষাণ খাটতে যাচ্ছি তিলের ক্ষেতে। ঐ যে দেখছ জাম গাছটা ওর দক্ষিণ পূব টানে ক্ষেত আছে বিজয় মামার। তিল হয়েছে সরস কিন্তু নিড়ান চাই—বড্ড ঘাস জম্মেছে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। বেড়া দেখছ না বাঁশের—তেরছি বেড়া। ওর সমস্ত বেতিগুলোই আমার তোলা।'

আরও কত কি ব্রজ বলত তা বলা যায় না, অজয় জিজ্ঞাসা করল, 'রসুল মাঝিকে দেখেছ?'

'কে রসুল, কে গো কবি? সেই ল্যাংপেঙে মাঝিটা? সেই যার বৌ-র যমজ ছেলে হয় আর মরে? সেই দক্ষিণ পাড়ার ছদনের ছেলে—নায়ে চড়ে সেবার সাক্ষী দিতে গিয়েছিলাম গরু চুরির?'

ব্রজদাসের কথায় একটু যেন হাল্‌কা হয়ে এল কবির মন। 'তবে দেখছি, তুমি তাকে চেন না।'

'কেমন কেমন? এই কটা কটা চুল, ঝাঁকড়া ঝোপের মত যার

দাড়ি, সেই রসুলকে আমি চিনি নে—বল কি ? ও যে সন জম্মে সেবার আমার পুরাদস্তর বয়সের কাল, এক টানে ধান তুলতে পারি এক কাহন—এক লপ্তে আমার জমি ছিল পাঁচ বিঘে···

‘তুমি কি রসুলকে দেখেছ ?’

‘আগে শুনে লও কাহিনীটা।’ একটা দীপ্তিতে চকমক করে ওঠে ব্রজদাসের মুখ।

কি যেন বলবে বৃদ্ধ, কি যেন পক্ক জীবনের অবিস্মরণীয় এক ঘটনা। অনেকের কাছে সামান্য, কিন্তু কবির কাছে অসামান্য বলে বোধ হয়। কারণ তার অনুভূতির কষ্টি পাথরে জগতের যত খাদ বাদ দিয়ে কেবল সোনাটুকুই ধরতে চায়। কি অপূর্ব রেণু—টানে টানে দ্যুতি!

‘এখন কৃষাণ খাটি, তখন কৃষাণ ডাকতাম—জমি ছিল বাঁশবাগানের লামাথানে। নাম করা কৃষাণ ছদন এল, বলাই এল—আর এল হরিদাস। সকলে পান্তা খেয়ে নেমেছে বীজ তুলতে—আমি আর থাকতে পারলাম না—কী যে বীজের চেহারা কবি—আমি নামলাম না খেয়ে। ঘড়িখানেক বীজ তুললাম। গুণে দেখা গেল আমি তুলেছি ওদের এক এক জনের প্রায় দুনো। সবাই বলল, দৈত্যি। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়।

‘কেন না খেয়ে তুমি বীজ তুললে সবাইকে টেক্কা দিয়ে—একেবারে দুনো আঁটি, সেকি যেমন তেমন মানুষের কর্ম? দৈত্য নয় তো কি বলবে ?’

‘জমির জোরে জোর, যেমন স্বামীর জোরে এয়োতি। কবি হয়ে তুমি এটুকু বুঝলে না—তোমাকে আর বল কি!’ দুঃখ রংগ ব্যংগ কত কি যেন একই সময় ব্রজদাসের মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কবি চেয়ে রইল অবাক হয়ে। বৃদ্ধের প্রতিটি বলি রেখায় কত রূপ, প্রতিটি কুঞ্চনে কত প্রতিভা। এ বয়সেরই শুধু দান নয়, অভিজ্ঞতার চরম উৎকর্ষ।

‘দাস তোমার সে জমি কি হল ?’

'প্রহ্লাদ হালদারের স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিল।'

'তারপর?' কবি মহা ঔৎসুক্যে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

'সত্য কথা বলব? তবে একটু বসো এই গাছতলায়। একটু তামাক খেয়ে নি। কাজে দেরী হয়ে যাবে, তা যাক গে। শুনে রাখো, জগতে সবার কাছে বলো উপকার হবে।'

দুজনে একটা আমগাছের তলায় বসে পড়ল। ব্রজ নাড়ার বিনুনী টিপে কল্‌কীতে আগুন ধরাল। ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

কবি চেয়ে দেখল চমৎকার নিরালা পরিবেশ। তার সুমুখে এক বহুদর্শী প্রাচীন আর সে যেন এক জিজ্ঞাসু শিষ্য। কি দর্শন, কি শাস্ত্র যে সে আজ বর্ণনা করবে তা কবি বলতে পারে না। কিন্তু উৎসাহ বোধ করে অপর্যাপ্ত।

'দু সন ধান পেলাম গোলা-ভরা। বয়স অল্প ছিল—শীতকাল, বুড়ো শকুন তখনও পাখনা রোদে দিয়ে বসে থাকত—বেঁচে ছিল দুটো। ছোট ছোট ঘোলা চোখ নিয়ে—মরণের ঠিক আগদশা।'

'শকুনটা কে ব্রজ?'

'যার নজর ভাগাড়ের দিকে। যুবতী স্ত্রীলোক দেখে আমার মাথাটা টনটন করে উঠল। শুধু যুবতী নয় কবি, অতিশয় রূপবতী ছিল প্রহ্লাদের বৌ।'

'কি করে জানলে?'

'আগুন যেমন চাপা থাকে না, রূপের কথাও লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে—সুন্দরীর সাধ সবাইর, পায় ক জনে? একদিন চুপি চুপি গেলাম—নাইতে ছিল ঘাটে, সাধ মিটিয়ে দেখলাম।' ব্রজ থামল, তামাক টানল—তারপর আবার বলতে লাগল ধীরে ধীরে। 'মহাভারত তো কুরুপাণ্ডবের কাহিনী, রামায়ণে আছে রঘুবংশের জীবনী। লিখে

গেছে ব্যাস ও বাল্মীকি। তুমি আমার গল্পটা লিখবে? তুমি তো কবি।'

নির্জনতার দরুণ কবিরও মনটা খুলে গেল, জবাব দিল, 'কত দিন আগে লিখতাম!'

'তা হয়েছে কি? ধীরে ধীরে লিখবে, আমি বারবার বলব, একবার দুবার দশবার।—আচ্ছা বলতে বলতে কি পাপ ক্ষয় হয়, যেমন ঘষতে ঘষতে পাথর?'

'হয় বই কি? কিন্তু কি পাপ তুমি করলে?'

'পাপ, অতিলোভ—পরের জিনিষের ওপর লিপ্সা। কিন্তু এককালে তো দোষের ছিল না, অর্জুনও তো সুভদ্রাকে হরণ করে এনেছিল। কৃষ্ণ বার করে এনেছিল আয়ান ঘোষের স্ত্রীকে।'

'সেখানে যে প্রেম ছিল—তাই বন্ধন মুক্ত করা সহজ হয়েছে।'

'বুড়ো শকুনের পরামর্শ নিলাম, বলল ছোট জাতে দোষ নেই, ফুসলিয়ে আন। সামাজিক ভাল মন্দর ঝুঁকি রইল আমার ঘাড়ে। ফুসলাতে গিয়ে ভালবেসে ফেললাম। সেও পাগল, আমিও পাগল। একদিন বার করেই নিয়ে এলাম। দাদাঠাকুর এখন?'

'বৈরাগী হ, কণ্ঠি বদল কর—তারপর দেখি তোদের কে কি করে?'

'দেখি প্রহ্লাদও হাঁটাহাঁটি করে বুড়ো শকুনটার কাছে।

বোধ করি পরামর্শ নেয়।

কিছু দিন বাদে পুলিশ এল। এসেই, তারা ফিরে গেল। গ্রামের পাঁচজনেও আমাদের কিছু করতে পারল না।'

বুড়ো শকুনটা জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছিস ব্রজ? দেখলি কেউ তোদের একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল? হাভাতের ঘর থেকে এসে যশোদা তোর কাছে ভালই আছে, না?'

'একদিন পায়ের ধূলো দিলেই হয়। যশোদা তো নিত্য বলে।'

'শকুনটা হাসে।'

'তারপর একদিন কোর্টের পরওয়ানা আসে দুপক্ষে মামলা চলে ভয়ংকর। দেখতে দেখতে আমার পাঁচ কুড়া আর প্রহ্লাদের এক কুড়া একত্র হয়ে বুড়ো শকুনের পেটে ঢোকে। আমরা তো শুনে আটাস তোমার বাবা নাকি কবলা করলেন ছ' বিঘে জমি!'

অজয় আশ্চর্য হয়ে চোখ জোড়া কপালে তোলে। 'বল কি!'

'বলব কি! যার জন্য এত মারামারি সেই গেল বিনা চিকিৎসায় মরে। যদি কবি তখন তুমি যশোদার চোখ জোড়া দেখতে! সন্ধ্যে তারার মত আজও আমার বুকে জ্বলছে। তুমি একটা নাটক লেখ —পাঁচ গাঁয়ে তোমার নাম থাকবে ব্যাস বাল্মীকির মত। হ্যাঁ কবি, নাটকটা হবে কিন্তু কড়া, অথচ প্রেমের ভিয়ান থাকবে—তুমি কখনও গয়াতীর্থে যাও নি, দেখনি ফল্গু নদীর ধারা?'

ব্রজর বুকের তলায় যে ধারাটি বইছিল তাই পৃথিবীর বৃহত্তম অভিজ্ঞান। তীর্থস্থান পর্যন্ত ধাওয়া করার প্রয়োজন কি? কবি শপথ করে, 'দাস নিশ্চয়ই লিখব তোমার জীবনী।'

সেদিন রসুলের কথা ঐখানেই চাপা পড়ে।

ওপরে রৌদ্রস্নাত নির্মেঘ আকাশ, নীচে শান্তশ্রী মৃত্তিকার পৃথিবী —মাঝখানে কুশীলব ব্রজদাস, যশোদা, প্রহ্লাদ। আর একটু ভেবে দেখলে, কবি, কুসুম, মধুমালতী। রসুলকেও কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না। তার সংগে সংগে আসে আরও অপাংক্তেয় জনতা, অনামা অচেনা—কেউ হয়ত নির্বাক, কেউ হয়ত নেপথ্যচারী। মৃত্তিকার রঙ্গমঞ্চে তাদের হাসি কান্না শোনা যায়, হাহাকার সুদীর্ঘ বিলাপ। আসে প্রেম, চলে চুপি চুপি অভিসার—এই তো চিরন্তনী মহানাট্য। ব্রজদাস এই নাটকই লিখতে বলেছে—সেই নাটকই কবি লিখবে।

এবার আর দম্ভ ও বৈরাট্যের ইতিকথা নয়, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শুধু ভনিতা নয়—উন্মোচিত করতে হবে যুগধর্মে তৈরী স্বার্থ শিকারী দৈত্য বংশের স্বরূপ। বুঝিয়ে দিতে হবে—ব্রজদাস, তুমি পাপ করনি, আমিও পাপ করছিনে, কিন্তু আমরাই পচে মরছি কংসের কারাগারে। আমরাই আসামী, আমরাই দাগী—আমাদেরই পুরুষ পরম্পরায় নাম লেখা থাকে বিংশ শতকের থানার ভিলেজ ক্রাইম নোট বুকে!

আট

কি যেন পাল পার্বণ ছিল। সকাল বেলা জয়ন্তী ঘুম থেকে উঠেই স্নান সেরে এলেন। তখনও অন্ধকার একেবারে পরিষ্কার হয়নি। গোঁসাই মণ্ডপের সুমুখের তুলসী মঞ্চটা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শীতের স্বচ্ছ আকাশে প্রভাতী তারা জ্বলজ্বল করছে।

এক জন পাইক এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ছোটদি কলাপাতা কাটতে যাব? ক' কুড়ি লাগবে?'

আর একজন এসে জিজ্ঞাসা করল, 'পুরুত ঠাকুরকে কি এক্ষুণি সংবাদ দেব?'

দু' তিন জন দাস দাসী এসেও পৃথক্ পৃথক্ হুকুমের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আজ শীতটা বেশ গাঢ় হয়ে পড়েছে, তবু কেউ উত্তপ্ত শয্যায় শুয়ে থকতে সাহস পেল না।

ঠিক এমনি সময় মালী ফুল দিয়ে গেল। 'ছোটদি পদ্মফুল তো পাওয়া গেল না।'

জয়ন্তী গোঁসাই মণ্ডপের দুয়ার ঠেলে বের হলেন। গায় কোনও শীত

বস্ত্র নেই, শুধু দুধে গরদের আঁচলখানা। সুমুখে একটা আলো থাকা সত্ত্বেও কেউ তার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। বয়স হলেও যে এত চোখ ধাঁধাঁন রূপ থাকে তার নিদর্শন জয়ন্তী। আতপ চাল, উপবাস, কঠোর ব্রহ্মচর্য—তাঁর বয়সের দুধকে ক্ষীরে পরিণত করছে। জলীয় অংশ যেমন তাঁর শ্রীতে নেই, তেমনি নেই স্বভাবে।

'সুকুমারী বৈষ্ণবীর বাড়ী শীতকালেও একটা গাছে শ্বেত পদ্ম ফোটে—কাল পাঁচটা কলি ছিল, তবে বলছ কি করে যে পদ্মফুল পাওয়া গেল না?'

'সে যে দু কোষ পথ!'

'চাকরান ভোগ কর যে বিত্তটা তাতে কি ধান কম হয় বাবা?'

উপস্থিত সবাই বলে উঠল, 'যাও যাও মালীর পো—আর কথা বলো না। দু কোষ পথ আর ক' কদম? এই ঘড়ি খানেকের মধ্যেই ফিরতে পারবে।'

'তা হবে না সুদর্শন—এই পূজোয় বসতে বসতেই চাই। চাকরান বিত্ত মৌরসী পাট্টা নয়—খাটতে না পার সরকারে ছেড়ে দাও।'

'খাব কি ছোটদি? বুড়ো হয়েছি বলে তো পেটটা মরেনি।'

'এত কাল খেয়েও যদি পেট না ভরে থাকে তার জন্য তো আমরা দায়ী নই বাবা। তোমাদের উদর স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা এসেও ভরাতে পারবে না।'

'তা ঠিক!' খুব ধীরে ধীরে দুটি কথা বলে বৃদ্ধ সুদর্শন চলে যায়। পথ চলতে চলতে ভাবে, তার জীবন প্রদীপ স্তিমিত হয়ে এল—তবু পলতে তেল চায় কেন? তেল চাইলেই বা পায় না কেন?

দাস দাসীরা হুকুম নিয়ে এদিক ওদিক চলে গেল।

ছোটদি একটা বিশেষ কি কথা ভাবতে ভাবতে যেন ঠাকুর মণ্ডপের ভিতর ঢুকলেন।

সুদর্শন তখনও অনেকটা এগুতে পারেনি। তখনও তার মনের চিন্তা খেই হারায়নি। হাঁটতে যে পারছে না, গতি যার পংগু—তাকে ঠেলে ঠেলে হাঁটায় কে?

জীবনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে এগিয়ে এসেছে—কখনও হেঁটে, কখনও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে। দেবতার পূজার জন্য ফুল জুগিয়েছে নানা বর্ণের, নানা গন্ধের কিন্তু কই তার তো পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি হল না? তার তোলা ফুলে পূজা করল যারা তাদের ওপরই তো দেবতা প্রসন্ন। তাদের গৃহই তো পূর্ণ ধানে ধান্যে। কত কাদা, কত কাঁটাই যে লেগেছে তার গায়! দাগ এখনও আছে—তবু দেবতার মমতা বোধ নেই।

কেন সে বৃদ্ধ হল, কেনই বা তার শিরা উপশিরা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে? তার জন্য দায়ী কে? সে তো পুষ্প চয়নে, মালা গাঁথায় কখনও বিরতি দেয় নি—কিন্তু তারই জীবনের মাল্য যে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে।

হায় ভগবান, তুমি ফুলও নিলে পূর্ণ যৌবনও লাভ করলে—মালীর দিকে একটি বারও ফিরে তাকালে না। এ কৌশল কোথায় শিখলে শ্রীহরি?

বুড়ো সুদর্শনকে ঠকিয়েছ, কিন্তু তার ছেলে পুলেকে আর ঠকাতে পারবে না। দিন দিন তাদের চোখ খুলে যাচ্ছে। তারা পরের জমিতে আর কৃষাণ খাটবে না। বন্দরে গিয়ে মোট বইবে, তবু আর ছোটদির মারফতে তোমাকে ফুল জোগাবে না। অকালের পদ্মের কথা ভুলে যাও, শীতের অযাচিত শিমূলও পাবে না।

ঠাকুর, সাধে কি কালাপাহাড় জন্মে ছিল!

ফুল নিয়ে সুদর্শন যখন ফিরে এল, তখন ছোটদি ভিন্ন চিন্তায় মগ্ন। ফুল ঠিকঠাক পাঁচটাই বটে। সুদর্শন তো দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—আচ্ছা জাহাঁবাজ মেয়েলোক তো!

পূজা প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। সুদর্শন এতটুকু হয়ে গেল

ভয়ে। কিন্তু ছোটদি কিছু বললেন না। যে ফুলের জন্য এত গরজ সেই ফুলই রইল মণ্ডপের বারান্দায় রৌদ্রে পড়ে।

'তারপর স্থলোচন?'

পুরুত ঠাকুর আসতে পারেনি, এসেছে তার কনিষ্ঠ ছেলে। তার পেট থেকে টেনে টেনে কথা বার করছেন ছোটদি।

কিশোর স্থলোচন ঘেমে ওঠার জোগাড়। বারবার তার আচমন করতে ভুল হচ্ছে। একটা ঢোক গিলে স্থলোচন জবাব দিল, 'আমি তো নিজে কিছু দেখিনি—পাড়ার সবাই বলাবলি করছিল।'

'কি বলাবলি করছিল? যা শুনেছ তাই বলো না লক্ষ্মী ভাইটি। এবার পূজোয় তোমার জন্য এক জোড়া কাপড় বেশী বরাদ্দ করে দেব। সত্য কথা বলবে লজ্জা কি।'

কাপড় এক জোড়া কেন পাঁচ জোড়াও যদি বরাদ্দ হয়, তবু এমন একটা অশ্লীল ঘটনা ছোটদির সাক্ষাতে ব্যক্ত করা স্থলোচনের পক্ষে যে কি দুরূহ বলা চলে না। সে আবার লজ্জারুণ হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, বিষয়টা অশ্লীল বই কি!

বাইরে পদ্ম ফুলগুলোর পাপড়ি শুকিয়ে যেতে বসেছে। স্থদর্শন স্থির করল এ সকলই বড় লোকের খামখেয়ালী। ভক্তির নামে প্রজাপাইক আশ্রিত ব্যক্তিকে জ্বালান শুধু। তার যে কি দুঃখ হচ্ছিল ফুলগুলোর দুর্দশা দেখে। কিছু বলারও উপায় নেই সহ্য করাও মুস্কিল। সে মণ্ডপের চৌকাঠে ঠক করে একটা শুষ্ক প্রণাম করে চলে গেল।

'বলো বলো চট করে বলে ফেল। আমি কিছু মনে করবো না।'

'কুস্থমদিকে নাকি হাতে হাতে ধরে ফেলেছে তার দাদা।'

'কখন?'

'রাত তখন আর ছিল না নাকি।'

'কোথায়?'

এইবার স্থলোচন চুপ করল। আর বলা চলে না।

কেন যেন ছোটদির চোখজোড়া সহসা জ্বলে উঠল। 'হারামজাদা, কোথায়? একটুখানি দুধের ছেলে…'

'ছোটদি তোমার পায়ে পড়ি—কবির বিছানায়—কারুকে বল না যেন। আমার কোনও দোষ নেই, আমি তো পরের মুখে শুনে এলাম।'

'মন দিয়ে পুজো কর, নইলে তোমার রক্ষা নেই। আবার কাঁদছ?'

স্থলোচন জোর করে কান্না চাপল, জোর করেই শাস্ত্র বহুল পূজায় মন দিল। ছোটদি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন।

অকালের পদ্মগুলো খেয়াল খুশির অর্ঘের মতই শুকিয়ে যেতে লাগল।

'জনার্দন, নিবারণ, যোগেশ, কবি কোথায়?'

জনার্দনই জবাব দিলেন,' কেন, ঐ তো কবি কাজ করছে।'

'কাজ করছে! সে যে দুদিন কাজে কামাই দিয়েছে, তা আমাকে জানাওনি কেন?'

সেরেস্তা সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা তো কোনদিন বলবৎ ছিল না। জনার্দন পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে রইলেন। ছোটদির এ নিতান্তই কড়াকড়ি। কিন্তু মুখে জনার্দ্দন না বলেও পারলেন না,'আচ্ছা এখন থেকে তাই হবে। কে ছুটি নেয়, কামাই করে তোমাকে জানান হবে প্রত্যহ।'

বালবিধবা ছোটদি সারাজীবন অত্যন্ত নিগ্রহ ও কাঠিন্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে সকলের মনে এমন একটা ছাপ ফেলে ছিলেন যা সত্যই গুরুতর। তাই সেরেস্তা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। তিনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ কোনও কাজেই মন দিতে পারল না। তিনি চলে গেলে মনে হল একটা যেন ভার কমল।

যেতে যেতে ছোটদির মনে হল—তিনি যেন কতকটা বাড়াবাড়িই করলেন।

'স্থলোচন পূজার কত দূর?'

'প্রায় শেষ হয়ে এল ছোটদি—আমার তো দোষ নেই, আমি...' বলকের আবার কণ্ঠরোধ হয়ে আশার জোগাড় হল।

'তুমি আবার কাঁদবে নাকি? ভারী তো ছিচ্‌কাঁদুনে ছেলে দেখছি। তোমার মার বয়সী আমি একটু মন্দ বলেছি, তার জন্য চোখে জল। ছিঃ ছিঃ। তুমি বড় হয়ে কি যজমান শিষ্য রাখতে পারবে। এই নাও কাপড় এক জোড়া—পূজার সময় আবার পাবে।'

বালক সুলোচন অনেকক্ষণ বাদে চেয়ে দেখল ছোটদির মুখখানা। যে ছোটদি পূর্ণ দশ হাত সরংগের বদলে গামছা দেন এবং তাও সময় সময় তুলে রাখেন পুরুতের ডালা থেকে কিছু পয়সার প্রতিশ্রুতি দিয়ে—সেই ছোটদিই দিচ্ছেন কিনা এক জোড়া কাপড়! সুলোচন ধরতে সাহস পায় না কাপড় জোড়া।

পূজার মন্ত্র কিছু ভুল-চুক করে সুলোচন পূজা সমাপ্ত করল। দক্ষিণাও সাংগ হল। হাজার রকম উপচারের মধ্যে তার যৎসামান্য যা পাওনা, তাই সে গুছিয়ে নিল সযত্নে।

'ওকি কাপড় জোড়া নেবে না?'

'ছোটদি আমি আর কক্ষণো কিছু তোমার কাছে বলব না—কাপড়ও চাইনে। তুমি বাবার কাছে আবার কিছু বলো না।' সুলোচন উঠে দাঁড়াল।

'আচ্ছা বোকা ছেলে তো! কাপড় ফেলে গেলে আমি কিন্তু সব তোমার বাবাকে বলে দেব। তুমি দিন দিন বড্ড নষ্ট দুষ্ট হয়ে যাচ্ছ। তোমার—'

'আবার তুমি রাগ করছ? আচ্ছা আমি এই কাপড় জোড়া নিলাম।' ভয়ে ভয়ে সুলোচন কাপড় জোড়া তুলল। এখনও তার ষোল আনা বিশ্বাস হচ্ছে না যে সম্পূর্ণ এক জোড়া কাপড় তাকে ছোটদি দিলেন! 'তুমি আমার সম্বন্ধে তো কিছু বলবে না?' বালক হলেও সুলোচনের

মনে ঐ নষ্ট দুষ্ট কথাটা বারবার আঘাত করছিল। ঠিক তাৎপর্য বোধ হচ্ছিল না, তবু তার ক্রিয়া হচ্ছিল। সে স্থির করল আর মরে গেলেও এসব কথা ছোটদির কাছে কখনও ব্যক্ত করবে না। কি ঘৃণায় কথা, সে কিনা নষ্ট দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে! কেউ ঢাক বাজিয়ে গেলেও সে কানে আংগুল দিয়ে থাকবে।

'তোমাকে কাপড় দিলাম কেন জানো ?'

'না।'

'তোমার বাবা মা জিজ্ঞাসা করলে বলো পার্বণের সরংগ। তুমি জেনে রেখো, সত্য কথা নিঃসংকোচে বলেছ বলে, ভালবেসে।'

সুলোচনের দুটি চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। মণ্ডপ ত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বে ছোটদির পায়ের ধূলো নেবে বলে এগিয়ে গেল।

নিয়মানুবর্তিনী ছোটদি তার চিবুকে একটা চুমো খেয়ে বললেন, 'ওকি থাক থাক।'

কাজ কর্ম সারা করে কবি যখন উঠতে যাচ্ছিল, তখন কে যেন বলল 'ছোটদি ডাকছেন।'

'হঠাৎ!'

'যাও না, গেলেই টের পাবে।'

'ছোটদি আমাকে কি ডেকেছেন ?'

'হ্যাঁ কবি একটা কথা ছিল—কিন্তু এখন অনেক বেলা হয়ে গেছে—বরঞ্চ সন্ধ্যার পর দেখা করো। আমাকে এখানেই পাবে।'

কবি বাড়ীর দিকে চলে গেল। ছোটদি যে রূপ নিয়ে সেরেস্তায় প্রবেশ করেছিলেন, যে কণ্ঠস্বরে সকলকে উদ্ব্যস্ত করে নিয়েছিলেন, তাঁর সে রূপ, সে কণ্ঠ কোথায়? কিন্তু কেন দেখা করতে বললেন সন্ধ্যার নির্জনে? অনেক চিন্তা করেও কিছু স্থির করতে পারল না কবি।

সে খাওয়া দাওয়া করল অন্যমনস্ক ভাবে। ছোটদির কথা সে কেন

যেন কিছুতেই ভুলতে পারল না। নিত্য যে সময় আসা উচিত তার অনেক পূর্বেই সেরেস্তায় এল। কাজ কর্মে তেমন মন বসল না। একটা শংকা ও রহস্যময় অনুভূতিতে সে যেন অভিভূত হয়ে রইল। থলে চুরির কথাটাও মনের ভিতর আবর্তিত হল কয়েক বার।

নিত্যকার চাইতে আজ গোঁসাই মণ্ডপে আরতি হল একটু জাঁক-জমকের সংগে। বাদ্য থামল, প্রসাদ বিতরণ সারা হল—যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেল কিছু সময় বাদে।

ছোটদি জ্যোৎস্না ভরা বারান্দায় বসে রয়েছেন। কি যেন একটা নৈশ ফুলের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। শীত ও পড়েছে যথেষ্ট। ছোটদি একবস্ত্রা। পিঠের সাদা ধবধবে কাপড়ের ওপর একরাশ সর্পিল চুল। হয়ত আহ্নিকে মগ্ন।

'ছোটদি!'

'কে?'

'এখন খেতে চলো—আর শরীরটাকে কত কষ্ট দেবে?' জানার্দনের স্ত্রী এসে সুমুখে দাঁড়াল। 'এত উপোষও করতে শিখেছে!'

একটু কারুণ হাসি দেখা গেল ছোটদির মুখে।

এমন সময় কবি এসে উপস্থিত হল। জনার্দনের বৌকে ছোটদি হাত ইসারা করতেই সে ভিতর বাড়ীর দিকে চলে গেল।

'ছোটদি!'

'কি? বসো কবি মণ্ডপের বারান্দায় উঠে। ঐ আসনখানা টেনে নাও।'

'কি জন্য ডেকেছেন আমাকে?'

'বলছি, বসো।' ছোটদি হাতের কাছের কি কি যেন গুছিয়ে রাখলেন। চারদিকে তাকালেন একবার। শোন কবি। মনুষ্য জন্ম আমরা ধারণ করেছি কেন, পোকা, মাকড়, পশুও তো হতে পারতাম?'

'তা ঠিক। আরসোলা হওয়াও আশ্চর্য ছিল না।'

'মনুষ্য জন্ম এই জন্যই ধারণ করেছি যে আমরা যুক্তি বুদ্ধি ও বিবেকের আশ্রয়ে চলব—তা যদি না চলি, তা হলে অমোদের সমস্তই কি বৃথা নয়? আমরা যে জীবশ্রেষ্ঠ বলে অহংকার করি তার মূল্য কি?'

'কিছু নয় ছোটদি, কিছু নয়। এই যেমন আরসোলা—' ধিক ধিক—শত ধিক তাকে। সে একজন কবি হয়ে বারবার একি একটা দুর্গন্ধী পোকার কথা তুলছে! এত ঘাবড়ে যাচ্ছে কেন একজন স্ত্রীলোকের সুমুখে?

'মানুষ যখন পশু নয়, তখন তাকে একটা রীতি নীতি আদর্শ মেনে চলতে হবে। যখন তখন তার খামখেয়ালী করে, সমাজের চিরাচরিত গণ্ডী ভেঙে এগিয়ে যাওয়াকে কেউ বরদাস্ত করবে না। বোধ হয় আমারও যে মত তোমারও সেই মত—কি বলো কবি?'

'নিশ্চয় ছোটদি।'

'তোমরা রায় বংশের ছেলে, বিশেষ কথা কি তোমার বাবা আমার বাবার মন্ত্র শিষ্য। তোমরা এদেশের কেঁচো গোসাপ নও। কদিন ধরে তোমার ছোট ভায়ের সম্বন্ধে একটা কথা শুনছি। কথাটা কি সত্য? যদি সত্য হয় তবে সাবধান হওয়া উচিত।'

কবির ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। কিন্তু এ জ্বর তো ছাড়ার নয়—কাঁপুনি রয়েছে যে হাড়ে! সে নয়, সঞ্জয়। কথা একই—শুধু বদলেছে নামটার আকৃতি। একটা গোপন লজ্জায় সে ম্রিয়মান হয়ে রইল।

'সঞ্জয়ের কিবা বয়স, তার কথা তেমন ধরি নে। আর ভেবে দেখলে ধরা চলেও না।'

তবে কাকে দায়ী করতে চাচ্ছে ছোটদি—জেলের মেয়েটাকে নাকি?

সেটার যে আরও অল্প বয়স, আরও তরল বুদ্ধি। যে পাত্রে ঢালবে, তেমনি আকার ধারণ করবে।

'তোমাদের কারুকে কিন্তু কবি এক হিসেবে দোষী করা চলে না।'

'কেন বলুন তো ছোটদি?' কবি এঁর কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ দেখে অবাক হ'য়ে যায়। এই কি সারা জীবনের জপ তপের নিষ্ঠুর পরিণতি? এই কি ঈশ্বর জিজ্ঞাসা? এই কি হিন্দু নারীর সতীত্ব? কবির চির বিশ্লেষণশীল মন এই বিভ্রান্তা নারীর জন্য সহানুভূতিতে নরম হয়ে ওঠে।

একটু কি যেন চিন্তা করে, চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ছোটদি জবাব দেন, 'কুসুম যদি খারাপ না হত, তবে অবশ্যই সে নিজের স্বামীর ভিটার গিয়ে বসবাস করত। মানুষে মিথ্যা দুর্ণাম রটাতে পারত না। তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোনও দিনই কিছু মতান্তর নেই, তবু বুঝে-সুঝে চলো। রাত অনেক হয়েছে, আজ তবে এসো।' ছোটদি ত্বরায় আসনখানা গুছিয়ে রেখে বাড়ী ভিতর চলে গেলেন।

কবি যেন উঠতে পারছিল না। আশ্চর্য, কে যেন তার পায়ের শক্তিটুকু হরণ করে নিয়েছে যাদু মন্ত্রে।

নয়

ভোর না হতেই কুসুম উঠে নিত্য নৈমিত্তিক কাজে মন দিল। গত রাত্রে যা ঘটেছে, যার ফল হওয়া উচিত ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী —তার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কুসুম যেন নির্বিকার। গোসাঁই পূজার যাবতীয় কাজ কুসুমই করত। ছোট্ট মণ্ডপখানা পরিপাটি করে লেপা, ভোর বেলাই ফুল সংগ্রহ করে আনা, তামা কাসার বাসন গুলো ঘাটে নিয়ে গিয়ে মাজা—কোনটায় অপরের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হত না। আজও তা হল না।

গত রাত্রির অপ্রীতিকর ঘটনাটা সে যেন মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দিয়েছে, এমনি একটা ভাবই তার সমস্ত কাজ কর্মে প্রকাশ পেতে লাগল।

কেউ ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই সে ফুল তুলতে বেরিয়ে পড়ল। মালী বাড়ী থেকে সে পাণ্ডুর জাবা তুলে নিয়ে এল দুটো। আনা উচিত ছিল বলে, সে নিয়ে এল না বলে।

গোঁসাই ঘরের কাজ সারা করে সে মন দিল সংসারের কাজে। বাসি এঁটো বাসন কোসন মেজে, সে চড়িয়ে দিল ভাতের হাঁড়ি। এখানেও তার উচিত ছিল ভ্রাতৃ বধূর নিকট জিজ্ঞাসা করা, কিন্তু সে তা করল না। সে যেন আনন্দে আহ্লাদে আত্মহারা। কোনও কাজই তার গায়ে লাগছে না আজ।

এত আনন্দের কারণ কি?

সে তার মনের তলার যত নিরানন্দকে জোর করেই বুঝি তাড়িয়ে দিতে চায়। তখনকার মত হয়ত আগুন চাপা পড়ে তুষের গাদায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। সে জ্বলুনি কিছু সময়ের

জন্ম কুসুম যেন টের পায় না। তাই কাজ করে যায় হেসে খেলে উদ্দাম চাঞ্চল্যে।

ঘুম থেকে উঠে গোসাঁই মণ্ডপের দিকে চেয়ে সোমেশ্বর অবাক। আশ্চর্য হয়ে গেল রসময়ী এবং শ্রীমতী পর্যন্ত। যজ্ঞেশ্বর ভাবল, আজ একটু সকালই যা হক দুটি জুটবে। শ্রীমতীর পাল্লায় পড়লে কবে না হয় বেলা তৃতীয় প্রহর।

কুসুম রান্না বাড়া সেরে, সকাল সকাল সবাইকে খাইয়ে, আবার স্নান করে এল। নিজে খেল পেট ভরে। শ্রীমতীকেও বেড়ে দিল ষোড়শোপচারে। শ্রীমতী মনে মনে ক্রুদ্ধা হল। এত ভাজা-ভুঝি কেন, তেল আসে কোত্থেকে? বামুনের বাড়ী, না আছে ঘানি, না আছে সরষে ক্ষেত।

কুসুম খেয়ে উঠে বিশ্রাম করতে গেল। শীতের বেলা, সবে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ—গাছপালার ছায়ায় মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা ঘলিয়ে এল। গত রাত্রে কুসুমের ভাল ঘুম হয়নি, সে চোখ বুজে রইল। কোথায় ঘুম? একটু তন্দ্রাও তো আসছে না চোখে। এমন অটুট স্বাস্থ্য, তার ওপর সুদীর্ঘ অবকাশ। এত অবকাশ দিয়ে সে করবে কি? আরও যদি কাজ থাকত পাহাড়ের সমান উঁচু, সে ঠেলে ফেলত সবিক্রমে। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই, কাজ করে যে একটা কিছু করবে তার ও সুবিধা নেই। যদি ভূঁইতে গিয়ে কৃষাণ খাটতে পারত, যদি ফলাতে পারত রবি শস্য, যদি আল ভেঙে জল টেনে দিতে পারত ক্ষেতে, তবে নিশ্চয়ই অভাবও মিটত, এ অবকাশেরও জ্বালা কমত। কিন্তু উপায় নেই কোনও দিকে একটি পা বাড়াবার। খাটতে গেলে খাটুনি নেই, বসে থাকলেও ষোল আনা পেটে অন্ন নেই। শুধু পায়ের ধুলো আর সম্মান বেচে কদ্দিন চলে? যদিও বা বাবার পায়ের ধুলো এখন পর্যন্ত লোকে কিনছে, কুসুমের দাদাকে তো কেউ গ্রাহ্যই করে না। তবু

তার ওপরই সংসারের মোটা ভরসা—ভাঙা খুঁটির ওপর যেন আটচালা!

ভাঙবে, ভাঙুক, চুরমার হয়ে এসেছে। আগুন দেখা যায় টিমান, কিন্তু অত্যন্ত সতেজ।...

বিচ্ছেদহীন, বিরামহীন অবকাশ—কুসুমের মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। দপদপ করে কপাকের রগ দুটো।

একটা দুপুর কাটাতেই এই, কি করে কাটবে তার সারাটা জীবন?

উঁচু তাল গাছটার ওপর বসে একটা চিল ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ডেকে উঠল। গুটি চারেক চড়ুই এসে চালের বাতায় নীরবে আশ্রয় নিয়ে ঝিমাতে লাগল। এ কিসের ইসারা? মানুষও কি অমনি চায়?

খাদ্য চায়, নিদ্রা চায়, সংগে সংগে চায় দাম্পত্য জীবন?

শুধু তাই নয়।

মানুষের আকাংখা আরও গভীরতর। সে হৃদয় দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে অবিচ্ছিন্ন সুখ ও সমৃদ্ধি গড়তে চায়। এই বৃহত্তম প্রাপ্তির জন্যই সংসার। আয়োজন চলে শিশুকাল থেকে।

নারী ও পুরুষের প্রেম কামনা করে একটি হেমাভ স্মৃতি—মায়ার পুত্তলি—নৃত্যরত ভোলানাথ। যেখানে নরের মৃত্যু, সেখানে জড়ের বিড়ম্বনা, আর যেখানে নারীর মৃত্যু সেখানে জননীর আবির্ভাব।

কুসুমের যে এখনও নারী জীবনই সার্থক হল না। জননীর স্বপ্ন তার কাছে তো আজ একান্তই আকাশ কুসুম। চারদিকে তো সে কিছুই দেখতে পায় না। যাকে নিয়ে বহু স্বপ্ন এবং সম্ভাবনার ইমারৎ মনে মনে খাড়া করেছিল, সে তো অনেক দূর যেন সরে গেছে। দিগন্ত বিসারী সমুদ্রে ধূ ধূ করছে তার মাস্তল। কুসুম কি সে অর্ণব পোতের সন্ধান পাবে? ডেকে ফিরিয়ে ভিড়িয়ে আনতে পারবে তার ভাঙা বন্দরে?

ছিল স্বামী, তাকেও তো সে এক রকম ত্যাগ করেছে বিয়ের

রাত্রিতে। স্বামী পণ্ডিত এবং ধর্মভীরু—সে তর্ক করেনি। বরঞ্চ হেসে হালকা করতে চেয়েছে সমস্ত বিষয়টা। এখন পর্যন্ত সে বিয়ে করেনি, কিম্বা সে প্রস্তাব ও তার মুখে কেউ শোনেনি। হয়ত সে প্রত্যাশা করে যে কুসুম ফিরবে। কিন্তু বেচারী তো জানে না, কুসুম শ্বশুরবাড়ী আর ফিরে যাবেন। যদিও বা সে এক আধ বার যায়, কিন্তু কোনও সান্নিধ্যেরই আশা নেই তাকে দিয়ে। যে-ফুলে যে দেবতার পূজা হবে না সে ফুলের দিকে চেয়ে থাকলে লাভ হবে কি!

কুসুমের দুঃখ হয়, আবার হাসিও পায় একটা কথা মনে পড়ে। যে দিন তার স্বামী প্রথম অধীর হয়ে শয্যাপার্শ্বে এল, ব্যাকুল আগ্রহে জড়িয়ে ধরল ওর কোমরখানা, কুসুম রাগে লাজে দিল তার স্বামীর হিন্দুয়ানীর চিহ্ন টিকিটাই কেটে।

বেচারী অবাক হয়ে রইল খানিক। একি নৃসংশ ব্যবহার!

তারপর হয়ত ভাবল: কুসুম নিতান্তই ছেলে মানুষ। ওর কাছে সবই সম্ভব। ওকে শাসন করা উচিত এ হেন রস ভঙের দরুণ, কিন্তু তাতে তো তার ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হবে না। মিছামিছিই কুসুম হবে ক্ষুণ্ণ। টিকি হয়ত যত্ন করলে তিন সপ্তাহেই গজাবে, কিন্তু কুসুম যে মেয়ে ওর মন হয়ত ছ সপ্তাহেও পাওয়া যাবে না।

বাপের বাড়ী চলে আসার সময় কুসুমের কাছে সমস্তই ধীরে ধীরে বলেছে পণ্ডিত—নইলে কুসুম এসব জানল কি করে? একটি নম্র মৃদুভাষী মনুষ্য ছায়া কুসুমের সুমুখে এসে দাঁড়ায়। ক্ষমা এবং বিনয় যেন তার চোখ মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছে। কুসুম ত্বরায় চোখ ফিরিয়ে নেয়। চিনেও সে যেন চিনতে চায় না, বুঝেও সে বুঝতে নারাজ।

দ্বিপ্রহর অনেকটা ঢলে পড়েছে, তন্দ্রা এসেছে যেন শীতের শেষ বেলার চোখে। তারই মোহ ছড়িয়ে পড়ছে বাগানের ঘন ছায়ায়। বাতায়ন পথে শুধু অতন্দ্র দীর্ঘ অবকাশ নিয়ে চেয়ে রয়েছে কুসুম।

কখনও তার চোখ পড়ছে ছায়ায়, কখনও নির্মেঘ আকাশের সামিয়ানায়।

ঘুম যখন এল না, ভাবতে ভাবতে ভাবনাও যখন কুসুমের ফুরাল না—সে তখন কতগুলো কাগজ পত্র খুলে নিয়ে বসল। অনেক দিনের পুরান বাণ্ডিল, মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গেছে—মাঝে মাঝে দাগ পড়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হয়েছে অসংখ্য। কুসুম যথেষ্ট যত্ন করেই রাখে, কিন্তু সময়ের ক্ষত নিবারণ করা তো তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

এ কাগজ পত্রগুলো একদিন সে মলিনার বাক্স থেকে গোপনে নিয়ে এসেছিল। তখন কিছু মূল্যবান সামগ্রী যে বাক্সে ছিল না তা নয়, কিন্তু কুসুমের লোভ ছিল না সোনা দানায়।

পরে একদিন কথা প্রসংগে মলিনা জিজ্ঞাসা করছিল, কুসুম কিন্তু শ্রেফ না বলেছিল। 'আমি তো জানি নে বৌ।'

সে কাগজগুলো খুলে পড়তে আরম্ভ করল…

কবিতাটির নাম, বেকার।

বড় চমৎকার নাম তো! এ কবিতাটি সে তো কোনও দিন পড়েনি। কাগজের ভাঁজে আত্মগোপন করেছিল নিশ্চয়। একেবারে দেখি ছিঁড়ে গেছে।

ধূমায়িত ভাঙা লণ্ঠনটিরে শয্যা শিয়রে জ্বালায়ে রাখি
কি দেখিছ বসি এখনো বন্ধু, মেলিয়া ও দুটি ব্যাকুল আঁখি ?
পাড়াপড়শীরা ঘুমে অচেতন, সারা বস্তির নিভিল বাতি
এখনো তোমার চোখে ঘুম নেই—নেশার আবেশে রয়েছ মাতি ?
ঘরেব কোনায় ফিরিছে মুষিক, চামচিকাগুলি ঝাড়িছে ডানা,
সারা দিনমান জোটেনি আহার, চারিভিতে এবে দেবে কি হানা ?
খবরের ওই কাগজের পাতে কি করিছ অত অন্বেষণ ?
কোনো নাগরিকা দিয়াছে কি আজি মোহময় শুভ বিজ্ঞাপন ?

নগরীর কোন শৌধ-শিখরে অপরিচিতার বিজনাবাস ?
ভরা বসন্তে কভু অলিন্দে থাকে কি এলায়ে অলকরাশ ?
কভু সে প্রভাতে ঘোরে পার্কেতে বাসন্তী শাড়ি লুটায়ে ঘাসে ?
জরীর চটিতে জড়ায় শিশির, রেশমী কিরণ কপোলে ভাসে ?
বাতায়নে তার জাপানী টবেতে ফোটে কি গোলাপ রক্ত লাল ?
মেয়েলী আখরে রাঙা মখমলে কার লাগি বোনে স্বপন-জাল ?
চাই বুঝি তার গৃহশিক্ষক নিতি নির্জন সন্ধ্যাকালে ?
অভাগা বেকার একি দুরাশার বিজলী আঁধার গগন ভালে !

কাল তার সাথে করিবে কি দেখা আহার বিহার ভুলেছ তাই।
ছেঁড়া ধুতিখানি সুনিপুণ হাতে রিপু ক'রে রাখো এখনি ভাই।
টুইলের ছেঁড়া সার্টের বুকে লাগায়ে লওনা নতুন তালি
গুছায়ে রাখিও ঝড়ো রাঙা চুল—আঁখি পরিখার মুছিও কালি।

কি পড়াবে তারে, কি ভাষা শিখাবে, কাহার কবিতা সে বাসে ভালো
মনের কোনায় জ্বলিবে কি তার বিশ্ব ব্যথার নিশানী আলো ?
নীলাভ আষাঢ়ে শুনাবে কি তারে যত মজুরের দুঃখ গাথা
অধীর আবেশে নামিয়া পড়িবে আয়ত আঁখির সজল পাতা।
নিবায়ে আলোক দেখিবে সে চাহি হৃদি-দিগন্তে জাগিছে তার
সারি সারি কত ময়লা কুটির সেঁতে সেঁতে ভিজা অন্ধকার।
বণিকের পাপ লেলিহ লেহনে কত মজুরের যুবতী প্রিয়া
না যেতে নিমেষ হলো নিঃশেষ ছিল যে রূপসী অতুলনীয়া।
হয়ত তখন চিমনি শিখরে দেখা দেবে প্রেত পাংশু শশী
তুমিও নীরব, জগত নীরব, নীরব বিধুরা অষ্টাদশী।

জগতের যত বস্তি-কাহিনী, নীলাভ আষাঢ়ে শুনায়ো তারে
কামনার শিখা নিবায়ো তাহার শত বেকারের অশ্রুধারে।

বড় দরদ দিয়ে লিখেছে কবি। পড়তে পড়তে মন একেবারে গলে যায় কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু ফাঁকি রয়ে যাচ্ছে। সমস্ত অন্তর ঠিক যেন একান্তভাবে সাড়া দিতে চাচ্ছে না। অন্নহীন বস্ত্রহীন বেকার মানুষের ক্লিষ্ট নিষ্পেষিত স্বরূপ কি এই? যার বর্তমান দুর্বিসহ ভবিষ্যত ঘন তমিস্রাবলুপ্ত, তার কি মর্মকথা এই? এ তো দুঃখ বিলাস, কবির কিশোর মনের স্বপ্নিলন উচ্ছ্বাস! এ কবিতা যে পড়বে, তার তো চিরদিন বেকার হয়ে থাকতেই ইচ্ছা করবে। কর্ম্মহীন জীবনের খানিকটা মর্ম কুসুম আজকাল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। গ্রাম গাঁয়ে তবু কিছুটা আশ্রয় আছে, সহর সম্বন্ধে সে যা শুনেছে তা তো তপ্ত-তৈল-কটাহ।

কোন্ অষ্টাদশীর ধ্যান করেছে কবি? নগরীর শৌধ-শিখরে যার বাস? তার জরির চটিতে শিশির জড়াতে পারে, কিন্তু লোভাতুর বেকারের দিকে সে কি চেয়ে দেখবে? যদিও বা দেখে হয়ত ছুঁড়ে মারবে চটি।

মারুক, স্বপ্নবিলাসী কবি একটু ঘা থাক।

অজয়ের চোখে কি এখন আর সে স্বপ্নবিলাস আছে? না, না—দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে সে যে এখন নিখাদ সোনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তো অজয়কে আরও ভাল লাগে।

ভাল লাগে বলেই একবার একান্তে দেখা করে কুসুম জিজ্ঞাসা করবে—কেমন করে কাটবে ওর এই দীর্ঘ অবকাশ? একটি দুটি দিনের নয়, জীবনের অগুণতি সকাল, সন্ধ্যা, বৈকাল ও রাত্রির। কতকাল তার পরমায়ু কে জানে!

নিজেকে মনে হয় একখণ্ড প্রস্তর। প্রস্তরেও তো একদিন পা ছুঁইয়ে ছিলেন দেবতা, কিন্তু তার কোন আশা নেই। কুসুম যেন অহল্যার চাইতেও অভিশপ্ত !

কবে যেন অজয় বলেছিল : কুসুম, এই যে নিপীড়িত জনতা তারাই একদিন সাম্য আনবে সমাজে। একদিন ক্ষুধার এ করাল মূর্তি থাকবে না, দারিদ্র্যেরও এ ভয়াল ছায়া আর দেখবে না। দর্শন্ বলো, বিজ্ঞান বলো, আজ সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। প্রচণ্ড বাধা পাচ্ছে সত্যি, তবু প্রাচীর ভাঙল বলে। তুমি আমি হয়ত জনতার তূর্য-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি নে, হয়ত শুনেও তা বুঝতে পারছি নে, জগতে শোনা এবং বোঝার লোক রয়েছে অজস্র। তাদের পুঁথি পুস্তক যদি তুমি পড়তে !

'তুমি তো পড়েছ !' একটু যেন দুঃখ মিশ্রিত স্বরে মন্তব্য করে কুসুম। 'তুমি তো শুনেছ তাদের তূর্যধ্বনি !'

'না কুসুম, আমিও সম্যক কিছু পড়িনি, তবে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি—কানে যা শুনেছি, মর্মে তা সঞ্চয় করেছি, ধীরে ধীরে বহু দিন বসে কৃপণের মত।'

তবে আজ যে অকৃপণের মত বিলিয়ে দিচ্ছ ? যদি তোমার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায় ? যদি আমরা লুট করি ?'

একান্তেই কথা হচ্ছিল—সন্ধ্যার আঁধারে ছিল মাত্র দুটি প্রাণী। কুসুম ও কবি।

'কেউই তো লুট করতে চায়নি কুসুম—শুধু তুমি মাত্র আনন্দ বাড়ালে। নাও না যা পার জোর করে কেড়ে। আমার যা কিছু সামান্য বৈভব তা তো দিতে চাই, কই তুমি ছাড়া কেউই তো আগ্রহ দেখায়নি আজ পর্যন্ত।' কবি একটু চুপ করল, হঠাৎ এগিয়ে এসে কুসুমের হাত দুখানা ধরে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আমায় ব্যংগ করলে ?'

'না গো না। অতি বড় হৃদয়হীন ছাড়া কি তোমায় কেউ ব্যংগ করতে পারে? না গো আমি তোমায় ঠাট্টা করিনি।'

কিন্তু কুসুমও তো জানে কত লাঞ্ছিত, কত অবজ্ঞাত এই মানুষটি কনকপুরে!

মুখের দিকে চেয়ে কুসুমের অত্যন্ত মমতা হয়েছে। তবু সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে—এই লাঞ্ছিতেরই পর পারে উত্তরণ-অনিবার্য।

যদি তার সংগে কুসুমও যেতে পারত!

কবি একদিকে চলে গেছে, কুসুম চলে এসেছে ভিন্ন দিকে। পারবে, সে-ও পারবে, লাঞ্ছিত জনতার স্বাক্ষর রয়েছে তারও ললাটে।

'পিসী?'

'কে?'

'আমি হেনা। সেদিন কে বলত চাল দিয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ী বয়ে! সের পাঁচেক সরু চাল?'

'জানি নে।'

'দেখত এ ডালাখানা কার? মা বলছিল তোমার হাতে বোন, সত্যি নাকি? এই ডালায় করেই বুঝি নিয়ে গিয়েছিলে চাল?'

'চুপ কর ডেঁপো মেয়ে, বৌদি শুনলে আর রক্ষা রাখবে না।'

'আচ্ছা চুপ করলাম, তা হলে বেশ বোঝা গেল যে এ তোমারই কর্ম। কিন্তু বলতে তো হয় নইলে মানুষে ধার শোধ দেয় কি করে? আজ না পারি একদিন তো আমার বাবা ভাল চাকরী পাবে, তখন তো যার যা এনেছি কড়ায় ক্রান্তিতে চুকিয়ে দিতে হবে।'

'ফের বকবক করছিস চুপ করবিনে?'

'আচ্ছা না হয় চুপ করলাম, কিন্তু পিসী—'চোখ দুটে পাকিয়ে হেনা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

কুসুম চোখ রাঙাল, 'একবিঘত্ কাঁকুড়ের দেড় বিঘত্ বিচি!'

'চললাম পিসী।'

'ডালাটা যে নিয়ে যাচ্ছিস, যদি রায় বাঘিনী দেখে—রেখে যা ও-খানা।'

'বা:রে এখানা তো তোমাদের ডালা নয়, আবার বলবে কি ?

'তবে যে বললি আমার হাতের বোনা। নাকে চোখে মিথ্যা কথা !'

হেনা একটু ফিক করে হেসে বেরিয়ে গেল। ঐ ফাঁকিটুকু দিয়েছিল বলেই তো পিসীর পেটের কথা বার হল।

কুসুম অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

দশ

ছোটদি জয়ন্তী অযাচিত ভাবে কেন যে এমন হিতোপদেশ দিলেন তা কবি অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারল না। তবে তার মনে হল ছোটদি যখন এ বিষয়ে নাক গলিয়েছেন, তখন এর পরিণাম একটা কিছু গুরুতর অবশ্যম্ভাবী। জটিল দলিলের মামলা, সূক্ষ্ম পূজা পার্বণ ও সামাজিক তর্ক, স্থাবর অস্থাবর জমি জায়গা ক্রয় বিক্রয়ের স্বত্বের মৌলিক গবেষণা ছাড়াও যে ছোটদির আর একটা দিক রয়েছে তাই যেন কবি আবিষ্কার করল। এত সংযম ও কৃচ্ছ্র সাধনার অন্তরালে একি বাড়বাগ্নি ? রূপসী ছোটদির একি ক্ষুধা ?

কবি খানিক ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর ভাবল হয়ত সেই যা আবিষ্কার করেছে, তা আবিষ্কার নয়—তার মানসিক দৌর্বল্যের বিকার মাত্র।

রাত্রে শুতে যাওয়ার পূর্বে কবি জয়ন্তীর কথা মন থেকে ইতি করে

দিয়ে শুয়ে পড়ল। যার সংগে স্বার্থ ছাড়া কোনও হৃদয়বৃত্তির যোগাযোগ নেই, তার কথা অকারণ ভাববে কেন? ইতি ইতি ইতি...

কিন্তু কখন যেন কবির অজ্ঞাতে এই ইতি কথা পুনরাবৃত্তি লাভ করল। তার মনে হল ছোটদির কথাও তার ভাবা প্রয়োজন।

তিনি বিধবা হয়েছেন অকালে। যদি ধরে নেওয়া যায় নিষ্ঠুর নিয়তিরই অভিশাপ, সে অভিশাপও খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। বিধবার কি বিয়ে হয় না?

অজয় ভাবে এ কি নিষ্ঠুরতা? জনতার অভিশাপ কি লাগে না? রূপ বলো, রস বলো, ফল বলো—যে তরুর পত্রে শীর্ষে কাণ্ডে উঁকি ঝুঁকি মারে দিন রাত, সে তরুকে কি অস্বাভাবিক উপায়ে করা হবে বন্ধ্যা?

কি না ছিল জয়ন্তীর! নীলোৎপলের মত চাহনি, সর্পিল চুল, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অংগভরা রূপ। কোনও কাজেই তো লাগল না। একটা সহজ স্রোত ধারাকে যেন পাথরের দুর্গ প্রাচীরে বন্ধ করে সৃষ্টি করা হয়েছে শাস্ত্রের আদর্শ—হিন্দু নারীর সতীত্ব! বিবেকের বদ্ধজাল।

ঘৃণা হয় অজয়ের।

কখন যেন ধীরে ধীরে অজয়ের অবচেতন মনে একটু একটু করে দরদের সর জমতে থাকে এই কঠোর ভাষিনী ছোটদির ওপর। বদ্ধ জলায় যদি কিছু দূষিত বীজাণু জন্মে থাকে তার জন্য দায়ী আর যে-ই হক ছোটদি নন। ছোটদি নিষ্পাপ—তিনি গহন অরণ্যের গভীর সরোবরের শ্বেত শতদল।

কবির চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে, জয়ন্তীর মত কোটি কোটি বঞ্চিতা নারীর মুখ—যুগযুগান্তের সাক্ষী যারা। কত রূপ, কত শক্তির যে অপচয় হয়েছে! কত লালিত্য, কত মাধুর্য যে খেয়াল খুশিতে ধ্বংস হয়েছে! শুধু অকাল বৈধব্যই কারণ নয়, নিতান্ত অকারণও আছে লক্ষ রকম। ঋষি আশ্রমের বল্কল ধারিণী কুমারী কন্যা থেকে, আধুনিক মানে-না-ম্লানা শাড়ী

পরিহিতা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টেলিফোন গার্লটি পর্যন্ত কবির মানস পটে মিছিল করে দাঁড়ায়। বঞ্চিতা এই নারী জনতার ভিড়ে ছোটদিকেও দেখা যায়। আসে মধুমালতী, আসে কুসুম—সে মহা মিছিলে বাদ যায় না রসুলের স্ত্রী এবং জেলের মেয়েটা পর্যন্ত। কারুর কারুর কোলে কাঁদে পিতৃপরিচয়হীন, পুষ্টিহীন শিশু, প্রেত শাবকের মত—শ্রেষ্ঠী সভ্যতার নির্মম উপঢৌকন। খাদ্য, বস্ত্র, পথ্য সম্রাটের কুক্ষিগত—কাঁদে কন্ট্রোলের শর জর্জরিত জনতা।...

কিন্তু ওকি! স্থানে স্থানে ওকি দেখা যায়?

ক্রন্দন নেই, অগ্নি ঝড়—বিপ্লবের পূর্বাভাস। কবি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। নিপীড়িত নারী জনতার সংগে মশাল হাতে এগিয়ে আসছে কারা? বঞ্চিত সর্বহারা এক পুরুষের দল। এলো বুঝি কনকপুর অবধি, এলো বুঝি কবির দোড় গোড়ায়।

ওরে কুসুম, ওরে হেনা, ও মধুমালতী দোর খোলো। বিংশ শতকের গণ-বিপ্লব যে তোমাদের শিয়রে এসে দাঁড়াল!

'বাবা, বাবা—ওঠো।'

জড়িত কণ্ঠে অজয় জবাব দিল, 'কেন?'

'ভোর বেলা তোমাকে বোবায় ধরেছে! ওঠো, উঠে বসো। পূব দিক ফর্সা হয়ে এসেছে। শিগ্‌গীর ওঠো। নয়ত ঠিক হয়ে বালিশটা নেড়ে শোও।'

হেনার সংগে সামান্য একটি কথা বলে কবি আবার তন্দ্রাতুর হয়ে পড়ল। সমস্ত মুখমণ্ডল তার মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মিছিল নেই বটে কিন্তু বিপ্লবের রুদ্র ধ্বনি এখনও তার কানে বাজছে। আবহমান কালের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্তি যেন বৈজ্ঞানিক যুগ ধর্মে দানা বাঁধছে। এখন আর পুরুষ নারীর ভেদ নেই, তাই জয়ন্তীকেও ধরে নেওয়া যায় ভাঙনের দলে—কবি যেন ওদেরই পুরোধা হয়ে চলে। হাতে তার অগ্নি-মশাল।

সেদিন কবির ঘুম ভাঙে একটু বেলায়।

অনেক স্বপ্নই কবি দেখল, শুধু বাস্তবিক যা করণীয় তাই সে করল না। মনে মনে সে রচনা করল কিনা গণ-বিপ্লবের অগ্নি ঝড়! রসুলের সন্ধানে তার কি আবারও যাওয়া উচিত ছিল না? আজই সে যাবে। এক্ষুনি সে রসুলের বাড়ী হয়ে তারপর কাজে গিয়ে যোগ দেবে। কৈফিয়ৎ— তা একটা যা হক কিছু দেবে।

মাঠের পথ ভেঙে অনেকখানি এগিয়ে গেছে কবি। কে যেন পিছন থেকে ডাকতে ডাকতে এল। দুর্দান্ত সূর্যের তেজে ঠিক তাকে ঠাহর করা যাচ্ছে না দূর থেকে। কবি দাঁড়িয়ে পড়ল। বিষম বিরক্তি—সেই ব্রজদাস, যার কথা শেষ হবে না এক দুপুরে।

আহা, সে রুষ্ট হচ্ছে কেন? দাসের কথা তো ফুরাবার নয়। প্রেমের কথা কি শেষ হয় কখনও? আবার যে প্রেম স্বাভাবিক সমাপ্তি রেখায় এসে ফলে মুকুলে সার্থক হল না—তার কি দাহ নিবৃত্তি হতে পারে কোনদিন? দাস শুধু প্রেমে নয়, জীবন সংগ্রামেও বঞ্চিত। শঠের পরামর্শে একেবারে দেউলিয়া, এমনি অবস্থায়ই মানুষ বিবাগী হয়। ঠকে, ঠেকে টিকিট কেনে কাশীর। কিন্তু সে পথ তো দাস আজ পর্যন্ত ধরেনি। সে এখনও কৃষাণ খাটে পরের ভুঁইতে কপালের ঘাম পায়ে ফেলে। আশ্চর্য ঐ মানুষটা—ও গড্ডালিকা প্রবাহে উদ্ধত ব্যতিক্রমের পাহাড়।

'কবি একটু দাঁড়াও।'

মাথা নত করে দাঁড়ায় কবি।

'ওকি?'

'তোমাকে নমস্কার।'

দাস সংকুচিত হয়ে পড়ে। 'না, না আজ আমি আর তোমায় বেশী বিরক্ত করব না। কেবল একটু আমার ঘরখানি দেখে যাও। কথা আছে মাত্র একটি। ঐ তো আমার বাড়ী। ঐ তো তুলসী মঞ্চ

যশোদার। ঐ তার শ্মশান। অনেক দূরে রাখিনি—তা হলে কথা বলব কার সাথে ?'

'সে তো মৃত। সে তো গত হয়েছে দাস।'

মাথা নাড়ে ব্রজ। 'না, না—যাত্রা গানের পালা শোননি ? জবাব দেয় আড়াল থেকে।'

নেপথ্যচারিণী ! বিশ্বাস করে না কবি, কিন্তু এই মূঢ়ের বিশ্বাস তখন তখনই ভাঙতেও মন সরে না তার।

সত্যই বৈষ্ণবের বাড়ী বটে !

পথের দুপাশে শীতের গাঁদা ফুল যেন নানা বর্ণের পাখা মেলে রয়েছে। উড়লেই যেন উড়ে যেতে পারে স্বর্গে। এত চোখ ধাঁধান রঙের কবিতা বোধ হয় ময়ুরের পেখমেও থাকে না। কবি চেয়ে থাকে এক মনে। যে মন এসময় মগ্ন থাকার কথা ছিল মিথ্যা হিসাবের তেরিজে, সেই মনই মগ্ন হয়ে যায় রূপের সাগরে।

'যশোদা রুয়েছিল গাছ, আমি জীইয়ে রেখেছি জল ঢেলে, সার দিয়ে। তখন ছিল পাতলা পাতলা, এখন হয়েছে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। বড় সৌখিন ছিল যশোদা। কত রাজ্যের যে ফুল গাছ জোগাড় করে এনেছিল !'

ব্রজ একে একে তার যশোদার স্মৃতিগুলো দেখাতে লাগল কবিকে। কেবল ফুলগাছ—এ যেন ফুলের পৃথিবী। শীতের বাতাসেও ভেসে আসছে এমন একটা মিহি সুবাস, যা বোধ হয় ফুলের নয়, যশোদারই দেহ-সৌরভ।

'এই লতা ফুলগুলোর নাম জানিনে কবি, কিন্তু শীতেও ফোটে। রাত্তির বেলা এসো তুমি, দিক্-রাত্তিরে যশোদাও আসে।'

'পাগল।'

'নইলে বেঁচে আছি কি করে ?'

রোদে পোড়া ব্রজদাসের কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের দিকে বারেক তাকায় কবি। কোনও মন্তব্য করেই ওর মনে আঘাত দিতে পারে না। ভুল যদি বেঁচে থাকারই মূলধন হয়, সে ভুল না ভাঙাই ভাল। একটা আধপাগলা গ্রাম্য কৃষাণ, সে এতও ভালবাসতে জানে! শুধু সে কৃষাণ নয়, সে যে বাঙলা দেশের বৈষ্ণব। তার বৈশিষ্ট্যের তুলনা মেলা ভার এ পৃথিবীতে। পরকীয়া প্রেম সাধনায়, সে যে স্বকীয়তার স্বর্গে চলে গেছে। বেঁচে যে আছে, সে ব্রজদাস নয়, তার ছায়া—জল নয় মৃগতৃষ্ণিকা!

যদি চক্রবর্ত্তীর পিতার শ্যেন দৃষ্টিতে না পড়ত তবে হয়ত ওরা আজ মানুষের মতই বেঁচে থাকত। বলিষ্ঠ সন্তান প্রসব করত সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যশোদা। জীবন মধ্যাহ্নে এমন সান্ধ্য পূরবী নিশ্চয় শোনা যেত না। কিন্তু সে কথা এখানে একান্তই অবাস্তব। কবি একটা নিশ্বাস ছাড়ে। এমনি ফলে মুকুলে কত সমৃদ্ধি যে ওরা যুগে যুগে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলেছে। ওরা দৈত্য নয়, দানব নয়—মানুষ কিন্তু শিকারী জিঘাংসু মানুষ, ছদ্মবেশী বিভীষণ।

পুষ্প কুঞ্জ, তুলসী মঞ্চ অনেক কিছুই দেখাল ব্রজ।

'কবি দেখে রাখো, নাটক যখন লিখবে তখন এগুলো তোমার কাজে লাগবে। সন্ধ্যাবেলা যশোদা চুল এলিয়ে ওখানটিতে বসত—ঐ করবী ফুলগাছটার গোড়ায়। বর্ষাকালে তার পায়ের ছাপ পড়ত এই উঠানখানার সারা বুকে। এসো এসো দেখে যাও এখনও সে চিহ্ন দু একটি আছে। তুমি আমার কাহিনীটা তো সত্যি লিখবে?'

'তাতে আর সন্দেহ কি দাস—বড্ড দেরী হয়ে গেছে, আজ তবে আসি।'

'না না কবি তুমি যাবে কি করে? যে কথাটা বলব বলে তাই তো এখনও বলা হয় নি। ঘরের ভিতর এসে একটু বসো বলছি।'

যশোদা কবে মরে গেছে, তার স্পর্শ এখনও যেন সর্বত্র বর্তমান। এই

তো ছিল, কোথায় যেন একটু কাজ কর্মের তাড়ায় দৃষ্টির বাইরে গেছে—এমনি ছোঁয়াই যেন দেখা যায় ঘরের প্রতিটি বস্তুতে। সলতে, প্রদীপ, খড়ম, আসন—সবই তো ঠিকঠাক গোছন। মাথা আঁচড়াবার কাঁকইও একখানা রয়েছে বারান্দার চালের বাতায়।

'কি বলবে দাস ?'

'শেষ অংকের বয়ান।' হঠাৎ ব্রজদাসের মুখে রক্ত ঠেলে ওঠে। সে ত্বরায় ঘরে ঢুকে একখানা তীক্ষ্ণ হাতিয়ার নিয়ে আসে। মুক্ত বারান্দায় ঝলমল করে ওঠে অস্ত্রখানা।

কবি হতবুদ্ধি হয়ে যায়। 'ও কি দাস ?'

'আমি খুন করব। পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে, তুমি কিন্তু ভাই ঘটনাটা লিখে দিও নাটকে। আজ তবে যাও,—শীগ্‌গির এসো কিন্তু সময় করে। আর যদি নাও দেখা হয়, যা শুনেছ, যা বুঝেছ তাই দিয়ে শেষ করো নাটক ?'

কবি দ্রুত বেরিয়ে আসে।

সে আর ভাল মন্দ কিছু বলতে পারে না। বৈষ্ণবের একি মনোভাব ? একি তার সংগ্রামী রূপ ? কোনও বৃহত্তর চেতনা ব্রজদাসের নেই, অথচ তার ভিতরই জেগেছে যুগধর্মী হুতাশন। কবি ভাবতে ভাবতে আনন্দে অধীর হয়ে চলে। চমৎকার শেষ অংকের সমাপ্তি।

দেরী হলেও কবি রসুলের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। মাঠখানা পেরিয়ে গেলে আর মাত্র রশিখানেক একখানা ফলের বাগান। কবি দ্রুত পায় হেঁটে চলে। যত কাছে আসে তত তার বুকটা দুরু দুরু করতে থাকে। মুখোমুখি হওয়া মাত্র সে কি করে তার সমস্ত মনের কথা এক সংগে ঢেলে দেবে তা বার বার আবৃত্তি করতে থাকে। ভাষা যেন কঠিন না হয়, ভাব যেন উচ্ছ্বাসে অর্থ হারিয়ে না ফেলে! এ পাপীর অনুতাপ

বিদ্ধ স্বীকারোক্তি নয়—দরদী বন্ধুজনের আত্মবিশ্লেষণ। মমতায় গাঢ়, বেদনায় দ্রব, ব্যঞ্জনায় অতি সূক্ষ্ম অর্থবহ।

মাঠের পরে খাল। খালের বুকে সাঁকো।

কবি যেমনি সাঁকোর ওপর উঠেছে, অমনি রসুল নাও নিয়ে ভাটিয়ে চলে গেল খালের মোহানার দিকে। তরতরে স্রোত—নৌকা কি দাঁড়াতে চায়!

'এখন নয় মুহুরী-মশায়—এখন মাপ চাই, দেখা করব সাঁঝের সময়।'

'না, না তোমার কোনও ভয় নেই—আমার একটা কথা ছিল।'

'ক্ষমা কর এই বেলাটা—এই কেরায়াটা বেয়ে ফিরলাম বলে। এই তো যাব আর…'অনেক দূরে চলে গেছে রসুল। তার কথা আর বোঝা গেল না।

তবু কবি উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার পেটে কিসের প্রলেপ রসুল। কাদা কেন…? ও রসুল তোমার কি হয়েছে?'

রসুল জবাব দিল যে বিশেষে কিছু হয়নি—একটু জ্বলুনী হয়েছিল গত রাত্রে।

'কিসের জ্বালা রসুল—কিসের?'

প্রতিধ্বনি শোনা যায় যেন—ক্ষুধার।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আর কবির সংগে রসুলের সাক্ষাৎ হয় না।

এগার

'ছোটদি উত্তর লক্ষীপুরের প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছে। নায়েব রাম সুন্দর সেখান থেকে বাস তুলে মধ্য পাড়ায় এসে পত্র দিয়েছে। এই তার চিঠি।'

গোঁসাই মণ্ডপের কাছে জনার্দন এসে দাঁড়ালেন। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সংগে সংগে কাছারী ভেঙে লোকজন এসে সারি দিয়ে দাঁড়াল। সর্বশেষে রইল কবি ও নবাগত পাইকটি। অবস্থা দেখে মনে হল যে এমন একটা স্বার্থের কেন্দ্রে আঘাত লেগেছে, যার জন্য আহত হয়েছে ছোট বড় সকলেই। মায় এ মুল্লুকের যারা নিয়ম মত খাজনা আদায় দিচ্ছে তারা পর্যন্ত।

একখানা কাপড়ের মোড়ক খুলে পাইক পত্র বের করল। জনার্দন চিঠিখানা ছোটদির নিকটে রাখলেন। 'এই যে নায়েবের পত্র।'

'আমাকে ছুঁয়ো না দাদা।'

জনার্দন সরে দাঁড়ালেন। সংগে সংগে সারি বদ্ধ জনতা একটু নড়ে উঠল। শুদ্ধাচারিনী ছোটদির দিকে তাকাল সসম্ভ্রমে।

'এ তল্লাটের ও কি খাজনা বন্ধ হয়েছে যে সবাই এসেছ সেরেস্তা ছেড়ে? যাও, যে যার কাজ কর গে। পরামর্শের দরকার হলে জেলায়ই যাওয়া যাবে। দাদা তুমি কিন্তু যেও না।'

একটা যেন ধাক্কা খেয়ে কর্ম্মচারীরা সরে গেল।

'তুমি দাদা কেমন মানুষ যে গ্রাম শুদ্ধু হেঁজি-পেঁজি সবাইকে নিয়ে এসেছ। ভেবেছ ওদের দিয়ে বুঝি উপকার হবে? বরঞ্চ অপকারেরই আশংকা আছে যথেষ্ট। পাড়ায় পাড়ায় হৈহৈ আর ঘোঁট পাকবে দিন রাত। বলার কিছু ছিল না, তুমিই তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।'

চতুরতার জন্য জনার্দনের যতই খ্যাতি থাক তিনি এ ক্ষেত্রে মাথা নত করতে বাধ্য হলেন।

'চিঠিখানা পড়।'

জনার্দন কম্পিত হস্তে পত্রখানা খুলে পড়তে লাগলেন। যপ তপ আহ্নিকের কথা ভুলে গিয়ে ছোটদি একান্ত মনে শুনে যেতে লাগলেন।

'রামসুন্দর লক্ষ্মীপুর ছাড়ল কেন?'

'এ আর বুঝলে না, প্রাণের ভয়ে। ছোট বড় উত্তম মধ্যম সব জোট হয়েছে কখন কি করে তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

'কেন কাছারীতে পাইক পেয়াদা নেই? ঢাল, সড়কী, বন্দুক?'

জোটের মহল, গুটি আষ্টেক মাত্র লোক। ঢাল সড়কী দিয়ে করবে কি? বন্দুক একটা দিয়েই বা ক জনাকে ঠেকান যায়?'

'থানা রয়েছে, পুলিশ রয়েছে, দরকার হলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত আছেন—পালিয়ে এল রাম সুন্দর! আর তার হয়ে তুমি কিনা দাদা ওকালতি করছ! আচ্ছা বৈষয়িক জ্ঞান তো তোমার!' ছোটদি ক্রমান্বয়ে উঁচু পর্দায় চড়ে গেলেন।, স্বধীন সরকারের এমন সুশাসনে, সুবন্দোবস্তে ও যদি ভয় পাও তো সম্পত্তি রক্ষা করবে কি করে? প্রয়োজন হলে তো পুলিস সাহেবেরও সাহায্য আমরা পেতে পারি।'

ভ্রাতা ভগ্নীর কণ্ঠ এখন একেবারে সেরেস্তা অবধি ভেসে আসছে। যে যার কাজ কর্ম্ম বন্ধ রেখে কান খাড়া করে রয়েছে।

পুলিশ সাহেব দূরের কথা, থানা থেকে সাহায্য আসতে আসতে হয়ত ওদিকে খুন হয়ে যেত দু চারটা চাই কি রামসুন্দর···।'

'তা হলে তো জলের মত বিষয়টা হালকা হয়ে যেত—জোটও ভেঙে যেত এক ধাক্কায়।'

দূরের সেরেস্তা চমকে উঠল।

জনার্দন অনেক ক্ষণ পর্যন্ত ভগ্নীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে

বললেন, 'ছোটদি আমি কক্ষণো অতটা তলিয়ে বুঝতে সাহস পাইনি।' তারপর তিনি কেমন যেন একটা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বেড়ায় টানান যপের মালাটার দিকে। মালাটা কী সুন্দর !

রামসুন্দর অনেক দিনের পুরাত কর্ম্মচারী। তার জন্য একটা দুর্বলতা ছিল জনার্দনের মনে। তাই তিনি ও-বিষয়টা আপাতত চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়লেন।

'দুশ বিঘা জমি খরিদ করা যায় জলের দরে। ভাবছি যেমন ডামাডোল ও সব এখন থাক।'

'জমি কোথায় ? এত সস্তা যে ?'

'জোটের মহলের লগ্ন ক্ষীরেশ্বর নদীর চরে। সংবাদটা রামসুন্দরই জানিয়েছে। বিবাদী জমি সামান্য একটু হ্যাংগামা হতে পারে। তবে সে আশা করে যে লক্ষীনারায়ণ জিউর আমাদের ষ্টেটের ওপর যে কৃপা তাতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হবে না। সহজেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। যদি চার ঘর শক্ত লেঠেল প্রজা বসান যায়, তবে সব সায়েস্তা হয়ে যাবে দুদিনে।'

'বলছ তো সমস্তই, আবার ভয়ও পাচ্ছ দেখছি। যা করবে, তা স্থির চিত্তে ভেবেই করা উচিত। তারপর ফলাফল শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউর হাতে। গীতায় শ্রীভগবান কি বলেছেন জানো—হে অর্জ্জুন…'

জনার্দনের বিদ্যা শুভঙ্কর পর্যন্ত। অতি প্রয়োজনে তিনি শুভঙ্করের জ্যাঠামশায়কে না হয় নজির খাড়া করতে পারেন, তা বলে গীতার উদ্ধৃতি তাঁর তো জানা বা বোঝার কথা নয়। তিনি জয়ন্তীকে বাধা দিলেন, 'গীতায় ভগবান যা বলেছেন তা শুনে আমি কি করব ? তোর ভয়েই তো আমি এখন পর্যন্ত কিছু স্থির করতে সাহস পাইনি।' এই বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে এখন আমাদের জমি খরিদের কথা না ভাবাই ভাল। তার ওপর আইনের বাঁধন যেখানে খুব শক্ত নয়—'

'দিব্যি কাপুরুষের মত উক্তি করলে যা হক। আইনের বাঁধন শক্ত কখন, যখন তার সংগে থাকে শক্তি।'

'কি, কি বললি ছোটদি, কি বললি ?'

'বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। শক্তি মানে আইন করে, দুর্বলে তা মেনে চলে। এই যে পুরুষানুক্রমে মানুষ জমি জায়গা ভোগ করছে, কত আইন, কত ধর্ম ভেসে গেছে, জোর যার তার হাতেই শেষ পর্যন্ত স্বামীত্ব এসে দাঁড়িয়েছে। শক্তিই আইন—শক্তিই স্বত্ব, এই হল জগতের তত্ব।'

ধুরন্ধর জনার্দন কতক্ষণ মোহাবিষ্টের মত ছোটদের দিকে চেয়ে রইলেন। তার দেহ মন যেন রসাপ্লুত হয়ে উঠল। এ কি রস তিনি তা ব্যক্ত করতে পারেন না, তবে অনির্বচনীয় একটা আস্বাদ আছে। জয়ন্তীর মুখে দেবী সুলভ দীপ্তি, হৃদয়ে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় বুদ্ধির বিকাশ —ও যে কি তা স্থির করাও তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য! ওকে মানুষ বলে ধরে নিলে, শ্রেষ্ঠতম মানবী আর দেবতা বলে ধরে নিলে, শ্রেষ্ঠতম দেবী।

'দাদা, এই যে কত লোক খেতে পাচ্ছে না, আমাদের গোলা ভরা ধান, একি আইন, না ন্যায় ধর্ম ? এই যে কত লোক শীতে উলংগ প্রায়, আর আমাদের বাক্স বোঝাই কাপড় এ কি আইন, না এর কোনও যুক্তি আছে ? তবু আবাহমান কাল ধরে এই চলে আসছে। রাম রাজত্বের কথাই ধর না, তখন কি দেশে গরীব দুঃখী ছিল না ? ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কি চোখের জল কখনও শুকিয়েছে ? নিজের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করতেই হবে, শক্তি আমাদের মূলাধার—তবে স্পৃহা রাখবে না কিছুতে এই-ই হল গীতা ভাষ্য।'

'রাম সুন্দর কি করবে ?'

'তাকে এসে আমার সংগে দেখা করতে বল।'

'আচ্ছা।' একটু ইতস্তত করে জনার্দন ফের বললেন, 'জয়ন্তী, একটা কথা বলব ?'

'বল না। অত দ্বিধা দ্বন্দ্বের কি আছে?'

'তুই বয়সে ছোট হলেও এতদিনে বুঝলাম, তোকে ছোটদি বলে ডাকাটা আমারও সার্থক হয়েছে।'

'কি যে সব বল দাদা! তুমি আমার গুরুজন।' জয়ন্তী সত্য সত্যই একটু যেন লজ্জা অনুভব করেন।

'হ্যাঁরে নিস্পৃহ মানে কি?'

'কেন তুমি কি জান না?'

'জানি তো। আবার ভাবি তুই যখন বলেছিস, তখন বোধ হয় ওর এমন একটা গূঢ় অর্থ আছে যা আমাদের জানা সম্ভব নয়।'

উজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের আলোকে ছোটদির মুক্তার মত দাঁত কটি দেখা গেল। সেই দাঁতে সূর্য রাশ্মি ঠিকরে পড়ে এমন একটা ক্ষণদ্যুতি বিচ্ছুরণ হল—যার কাছে শীতের নির্মেঘ দুপুরও ম্লান হয়ে যায়।

কিন্তু ছোটদি হাসলেন একটি ম্লান হাসি। হেসেই বললেন, 'এই দেখ না আমার চাল চলন—এমন শীতেও এক-বস্ত্র, আহারে নির্লোভ, অর্থে নিরাসক্তি। বর্তমানে উদাস, ভবিষ্যতে আস্থাহীন—যা বিগত তা তো সবই তুমি জান দাদা। নিস্পৃহ মানেই এই—এর চেয়ে ভাল নজির বোধহয় জগতে দুটি নেই।'

কতক বুঝে কতক না বুঝে মাথা নাড়ালেন জনার্দন। তার মনে যে কি ভাব উদয় হল তা তার মুখ দেখে বোঝা গেল না।

ছোটদি আবার কি যেন একটা পূজার কাজে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি আর মুখ তুললেন না। চকিতে দু ফোঁটা চোখের জলই পড়ল নাকি তাই বা কে জানে! তিনি মুখ যখন তুললেন তখন দূরে সেরেস্তায় কাকে বুঝি অস্পষ্ট দেখা গেল। গৃহের আবেষ্টনে আলো অন্ধকারে বেশ সুন্দর সুঠাম বলেই যেন মনে হল। এ মনে

হওয়ার হয়ত কোনও হেতুই নেই, তবু ক্ষনিকের জন্য ছোটদির বুঝি বা আজ ভাল লাগল কবিকে।

বেলা অনেক হয়েছে, সেরেস্তার লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—জনার্দন বললেন, 'ছোটদি আমি তবে যাই। অন্য সময় কথা হবে। বেলা অনেক হল কিন্তু কিছুই যেন মীমাংসা হল না। এমন বেকায়দায়ও পড়লাম শেষ কালে।'

'শেষ কাল বলে স্থির করলে কাকে? এ শেষ নয়—প্রথম, অংকুর। বাবার আমলে কখনও প্রজা জোটের কথা শুনেছ? আর তোমার আমলে এই নিয়ে তিন তিন বার খাজনা বন্ধ আন্দোলন হলো। এ কিসের আভাস একবার ও কি চিন্তা করে দেখেছ?

জনার্দন মাথা নাড়ালেন। তাঁর মুখখানা অন্ধকার হয়ে এল ছোটদির আতংক বিহ্বল চাহনি দেখে। তিনি খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন—ক পা পিছিয়ে এসে ছোটদির কাছে দাঁড়ালেন।

একটা চির বাধ্য ক্ষুধার্ত নিঃস্ব জনতার ঝড় দেখা যাচ্ছে। সে ঝড় আমাদের ঠাকুর দেবতার কর্ম নয় থামান। আজই ভেবে অস্থির হ'য় না—চেষ্টা করতে হবে ওদের শিরদাঁড়া ভেঙে কৌশল বানচাল করে দিতে।'

'কি করে?' আরও নিকটে এগিয়ে এলেন জনার্দন। যেন কান চোখ মুখ নাক দিয়ে তিনি গিলে ফেলবেন ছোটদির জাবাব। ধন্য জয়ন্তী—এত সব পূজা-আচ্চা পাল পার্বণের মধ্যে বসেও, চিন্তা করে নানা প্রকার সুক্ষ্ম কথা! জনতা, ঝড়, ক্ষুধার্ত, এ সব আবার কি কথা!

'জমির স্বত্ব যতটা সম্ভব জমিদারের হাতে আনতে হবে। নিলাম করিয়ে জমি দখল কর, নইলে আপুষে কবলা কর—ফসলের উপর সোজা-সুজি নিজের ক্ষমতা অর্জন করাই এখন কাজ। মধ্য স্বত্বের কথা ভুলে

যাও, যে কদিন আছে ভাল, তারপর জমির জোরেই লড়বে। ওরা না খেয়ে উপোষ করে আর কদিন শিং নাড়াবে।'

'তাতে ও যদি শেষ পর্যন্ত সুবিধা না হয় ?'

'তার জন্যই তো এখন থেকে তোমায় কিছু কিছু শেয়ার কিনতে বলছি কাপড়ের কল-টলের—তোমার মাতাতো শ্বশুর কি করছেন ? তাঁদের সংগে যোগাযোগ রাখলে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। তোমাদের ছোটদির শিক্ষা আর কতটুকু ? যাই, উঠি আজ আমার একাদশী—এখন পর্যন্ত নিয়মের একটু কিছুও করি নি। হ্যাঁ সময় মত কবিকে পাঠিয়ে দিও একবার।

সন্ধ্যার পর আবার কবির সংগে একান্তে সাক্ষাৎ।

ছোটদি জল তরংগের মত হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নায়েবী করবে নাকি ? মুহুরী থেকে নায়েব…?'

একি অদ্ভুত প্ররোচনা ! মানুষের জীবন নিয়ে খেলা ? কবি চুপ করে থাকে।

'তোমার মত বোকার কাজ নয়—যাও। না, না শোন—তোমাকে দিয়ে কিছু আশা নেই। তবু একটা কথা, যদি উত্তর লক্ষ্মীপুর একান্তই আমাকে যেতে হয় তুমিও সংগে যাবে। পারবে তো ? দারোগা পুলিশের সংগে কথা বলা, জেলায় যাওয়া, আমার একজন উপযুক্ত সহচর চাই।'

কবি এবারও নীরব হয়ে থাকে। না বলাও যেমন অসম্ভব, অনুমোদন করাও তেমনি এক গুরুতর সমস্যা।

বার

জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্না অপূর্ব আলোকে ভরে গেছে বন, প্রান্তর, নভোদিগন্ত। একাদশীর চাঁদ ষোলকলায় পূর্ণ নয়, কিন্তু তবু কত আলো তার। কবি মেঠো পথে এসে পড়েছে। দূরের গ্রামগুলি মনে হচ্ছে স্বপ্নলীন। কোলাহল নেই, চঞ্চলতা মিলিয়ে গেছে, শুধু ঘুম, আর ঘুম। যেদিকেই চোখ তুলে তাকাও না কেন, কেবলই দেখবে তরলায়িত জ্যোৎস্নায় এক অনিন্দ্য শ্রী ধরেছে পৃথিবী। দিনের গাঢ় শ্যামশোভা রাত্রে মনে হচ্ছে বুঝি বা ঈষৎ নীলাভ—কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট কোনও দরদী শিল্পীর তুলির প্রলেপ। কিছুই স্পষ্ট নয় কিন্তু ব্যঞ্জনা রয়েছে অপর্যাপ্ত। কেমন যেন দক্ষিণা বায়ু বইছে একটু একটু। শীতটা আজ কমই লাগছে —অনেকটা প্রথম বসন্তের মত। একটা কোকিলেরও ডাক শোনা গেল নিকটের ঐ পলাশ গাছটার চূড়ায়। আশ্চর্য এই দেশ, চমৎকার এর পল্লীঋতু—শীতেও ডাকে বসন্তের কোকিল।

কিন্তু তার ভিতরেই ছোটদি, তার ভিতরেই জনার্দন।

ছোটদির প্রস্তাবে চিন্তা হয়েছে কবির। সে একা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। এ প্রস্তাব নয়, আদেশেরই নামান্তর। কখন তামিল করার হুকুম আসে কে জানে! কবির চোখে প্রকৃতির এই যে অপরূপ দৃশ্য, কিছুই ভাল লাগছে না। সে কেবল দেখছে যেন ভ্রাতা ভগ্নীকে। সমাজ দেহের কতখানি গভীরে এরা শিকড় ছড়িয়েছে!

আজ আর ছোটদির জন্য সহানুভূতি কিম্বা দরদ নেই কবির। উদ্যত কৃপাণের তলে এসে তার বিশ্লেষণী শক্তি ভিন্ন পথে চালিত হয়েছে। সে উলংগ জিঘাংসু একটা সরীসৃপের বিকট মূর্তি দেখতে পেয়েছে পরিষ্কার। সে ভেবে আশ্চর্য হয় এত স্বচ্ছ দৃষ্টি তার ছিল কোথায়! যত দার্ঢ্য,

এবং অতি বৈরাগ্যের তলায় কি এমনি ক্লেদাক্ত সর্পের বাস? কোনটা বিষহীন, কোনটা বা উগ্র বিষধর।

আপাতত গোলামী যখন ছাড়া যাবে না, তখন ছোটদির কথা অমান্য করার প্রশ্নও ওঠে না—হয়ত যখন তখন ছাড়তে হতে পারে কনকপুর। এমন সাময়িক অনুপস্থিতি একটা বিশেষ কথা নয়, সবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে ছোটদির জন্য। তাই আজ রাত্রেই কবি রসুলের সংগে সাক্ষাৎ করে যাবে। ঐ তো তার বাড়ী, ঐ ছাতিম গাছটা ছাড়ালে আর কত দূর!

শীতের মাঠ হলেও এখনও রোদে ফেটে চৌচির হয়নি—কলাই মটর লকলকে পাতা মেলেছে ধানের, নরম নরম শুকনা কাটা ঝোপের ওপর। আকাশের দিকে যেন আকুল হয়ে চেয়ে আছে শিশিরের আশায়। হাজার গণ্ডা পথ যায়নি হাজার দিকে। মাত্র গেছে কয়েকটি সরু ফালি তিন চার দিকে, কখনও বা একটু বেঁকে কখনও বা কিঞ্চিৎ ঘুরে কলাই মটরের ক্ষেত চিরে।

কবিতা ছিল ধানে, কবিতা ছিল কলাই মটরের ক্ষেতে। কত রূপসীর রূপার খাড়ু যে জড়িয়ে ধরেছে ঐ লতার কোমল আঁকড়ায়! সে সব কাব্য এখন আটকা পড়েছে গঞ্জে গঞ্জে মহাজনের গোলায় নয়ত চক্রবর্তীর মত কবির হিসাবের খাতার মোটা মুনাফার ছন্দে। রুদ্ধশ্বাসে যে ছন্দের তাল রেখে চলেছে কবি, রসুল অমনি অপাংক্তেয় যারা—গলায় তাদের ফাঁসির দড়ি লটকান যেন। এত জ্যোৎস্না মনে হয় ঘোলাটে। কোকিলের ডাক মনে হয় বুঝি বা ব্যাংগ!

মাঠের পর বাগান ছাড়িয়ে কবি রসুলের বাড়ীর ভিতর ঢুকল। গাছপালার ছায়ায় উঠানটুকু আবছা অন্ধকার। কোন ভিটিতে ঘর চেনা দুষ্কর। প্রদীপ বা লম্ফ নেই কেন? বাড়ীটা কি ভুল হল? না, না, ঐ তো জোড়া তাল গাছ। মিষ্টি খিরসাপাতি তাল জন্মে ভাদ্রে।

'রসুল, রসুল!'

অন্ধকারে বামা-কণ্ঠের জবাব আসে, 'মাঝি বাড়ী নেই। ডাক্তার-বাড়ী গেছে। বসেন ঐ পিঁড়েখানায়।'

এ তো রসুলের স্ত্রীর গলা নয়, তবে উত্তর দিল কে? সচরাচর কোনও মুসলমান স্ত্রীলোক তো কথা বলে না অপরিচিত স্বজাতির সংগে পর্যন্ত।

'আমাকে চিনলেন না? আমি ডালিম জান, চেরাগ আলির মেয়ে। ঐ তো আমাদের বাড়ী।'

ডালিম জানকে এ তল্লাটের কে না চেনে? হয় ত তার পিতাকেই অনেকে চেনে না। অবশ্য এর একটা কারণও আছে। তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই—

মায়ের পেটে থাকতেই ডালিম জানের সম্বন্ধ স্থির হয়। বিয়ে হয় ন' বছরে পা দিয়ে। মামাতো ভাই বর, একেবারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাজ, ডালিম জান ঘর করতে যায় খুশি মনে। তখন তার বয়স চৌদ্দ কি পনর। স্বামী কৃষাণ খাটে এক নাম করা গোমস্তা বাড়ী। তাদের চাষে কম পক্ষে দু'শ বিঘা জমি। কাদেরকে গৃহস্থ বাড়ীর কেউ হিসাবেই ধরত না—হিসাবে এল সে বিয়ের পর।

'এত দেরী কেন রোজ বিহানে? ভুঁইতে লাঙল দেবে কখন?' একদিন সর্দার গোমস্তা জিজ্ঞাসা করে, 'দেরী হয় কেন নিদ (ঘুম) ভাঙতে? কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?'

কাদের লজ্জায় হাসে। জবাব যোগায় না তার মুখে।

লাঙল জোয়াল গোছাতে গোছাতে তার মতই একজন কৃষাণ উত্তর দেয়, 'মিঞার নয়া সাদী হয়েছে।'

সর্দার গোমস্তা বলে, 'তাই নাকি? তাই নাকি? বেশ তো—একদিন তোমার বাড়ী যাব বৌ দেখতে।'

এটা ঠিক নিয়ম নয়। গোমস্তা বাড়ীর বৌরা কবরে যাওয়ার পূর্ব-ক্ষণ পর্যন্ত থাকে প্রায় অসূর্যম্পশ্যা—কিন্তু কাদেরের স্ত্রী, নিতান্ত একজন দিনখাটা কৃষাণের বৌ, সূর্য উদয় হয়েই নিত্য দেখে যার মুখ, তার পক্ষে এটা ঠিক প্রযোজ্য নয়। গোমস্তা বাড়ীর মত আব্রু আবডাল পাবে কোথায়? তার ঘরের তো পূব দিকের বেড়াখানাই ঝরঝরে!

নববধূরা নাকি কথায় কথায় লজ্জারুণ হয়ে ওঠে—এ ক্ষেত্রে নবীন বর কাদেরও হল তাই, আশ্চর্যই বটে। সে কিছু বলতে পারল না।

'তোর বৌ দেখতে কেমন?'

স্বাস্থ্য যদি সৌন্দর্যের পরিপূরক হয়, তা ছিল ডালিম জানের অপর্যাপ্ত। কিন্তু কি করে বলা চলে এসব প্রায় নানার বয়সীর কাছে?

পূর্বের কৃষাণটি জবাব দিল, 'কাদেরের নসিবকে হিংসে করতে ইচ্ছা করে।'

'তুমি দেখেছ নাকি? ওর বাড়ী বুঝি যাতায়াত আছে তোমার? ভাল-না হালিম, ভাল না।'

'এ তো নতুন নয় সর্দার, ছোটকাল থেকে অভ্যেস। ওর বাবা ছিল আমার বাজানের দোস্ত (মিত্র)।'

'তা হক, ও এখন লায়েক হয়েছে, বিয়ে সাদী করেছে—যখন তখন ওর বাড়ী যাওয়া গুণা (পাপ)।'

শাস্ত্র এবং উপদেশ হালিমকে আটকাতে পারে না। সে আগের মতই আসা যাওয়া খোস গল্প করে। কোনও কোনও দিন রাত হয় দুপুর। হালিম গান গায় মিষ্টিগলায়, বন্ধু বান্ধবী কান পেতে শোনে। কাদের মাঝে মাঝে তামাক সাজে, ডালিমজান মেহেদী রঙানো হাতে পান সুপারি জোগায়। কাদের ভাবে মানুষ বেহেস্তের স্বপ্ন দেখে, এই তো সেই স্বর্গ—ডালিমজান এক 'হুরী' (পরী)।

শীত যায়, বসন্ত যায়, গ্রীষ্ম আসে—নানা রাজ্যের জমিতে চাষ পড়ে

আউসের। আমনের ভুঁইও পাট করা প্রয়োজন। সর্দার গোমস্তা ওদের দু বন্ধুকে ইচ্ছা করেই দূরে এক বিলান জমিতে পাঠায়। 'রোজ বিহানে আর দেরী হবে না, চাষের মরসুমে রইতে হবে ওখানেই তোলা-বাসায়।' চোখ পিটপিট করে সর্দার হাসে।

হালিম বলে, 'তা হলে এক কাজ কর, বৌকে পাঠিয়ে দাও বাপের বাড়ী। কি করবে, সংসার ভাঙল।'

'কেন, কেন, সংসার ভাঙবে কেন কাদেরের? ও মাঝে মাঝে বাড়ী আসবে। আচ্ছা দেখি ওকে নিকটে কোথায়ও দিতে পারি কি না। প্রথম চাষটা তোমরা দাও তো গিয়ে।'

কাদের স্ত্রীর পাহারায় হালিমের মাকে রেখে হালিমের সংগেই চলে যায়।

সপ্তাহ খানেক না যেতেই কৃষাণদের তোলাবাসায় খবর আসে ডালিম-জান সংবাদ পাঠিয়েছে, এক্ষুনি যেতে হবে বাড়ী। কে যেন তার বেড়ায় টোকা মেরে বলে গেছে আসবে আগামীকাল গভীর রাত্রে বিবিজানের সংগে নাকি শা-নজর (শুভদৃষ্টি) করতে। হালিমের মা কালা। সে বলেছে যে ওসব কিছু নয়, কিন্তু কেন জানি কাদেরের বৌ সুস্থ হতে পারে নি।

খবরটা পাওয়া গেল ঠিক সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে। দু বন্ধুতে হেঁটে চলে জোর কদমে মেঠো পথ ভেঙে। কাঁটা ঝোপ, ভাঙা শামুক, বেতের লকলকে আঁকড়া কিছুই তারা গ্রাহ্য করেছ না।

বাড়ী পৌছে তারা জিজ্ঞাসা করে, 'কি সম্বাদ?'

'একটু সবুর করেন, দেখবেন'খন কাণ্ডখানা। ঐ পূবের বেড়ায় টোকা মারে।'

ওরা ওৎ পেতে চুপ করে থাকে।

দুপুর রাত্রে সত্যই টোকা শোনা যায়। 'ভয় পেও না বিবিজান —আমি তোমার বান্দা।'

দু বন্ধুতে হুড়মুড় করে যাকে জড়িয়ে ধরে তাকে ঠিক চেনা যায় না আঁধারে।

পাড়া গাঁয়ের দুর্ধর্ষ মেয়ে ডালিমজান একখানা ধারাল কাটারী নিয়ে ছুটে আসে। আগু পিছু না ভেবে পোঁচ বসিয়ে দেয় ধাঁ করে।

'খুন, খুন করলে গো, খুন…'

দু বন্ধুতে চমকে ছেড়ে দেয় লোকটাকে। এত বড় একটা গুরুতর ঘটনা তারা হিসাব করার আগেই ঘটে যায়। তারা অনুমানে ঠিক করে নেয় মানুষটা কে।

সর্দার গোমস্তা কাটা কান ঢেকে থানায় গেল। হালিম ও কাদের ধরা পড়ল খুনের দায়। সাজা হল খুনের জন্য নয়, খুনের প্রচেষ্টার জন্য—অর্থাৎ কানের অগ্রভাগে তো নয়, কোপ মেরেছিল ঘাড়ে, তাই ফসকে, সর্দার সাহেবের গেছে একখানা কান কেটে। এজলাসের করুণা উৎপাদনের জন্য সর্দার গোমস্তা অনেক কেঁদেছিল খণ্ডিত কানখানা দেখিয়ে। সে ভুলেও ডালিমজানের কথা তোলে নি, পাছে মামলাটা যায় হালকা হয়ে। হালিম ও কাদের নিজেদের পক্ষে যা বলল তাতে কোন ক্রিয়া হলনা। যেন এজলাস থেকে পিছলে গেল।

হালিম এবং কাদের যখন ধরা পড়ল, ডালিমজান বাপের বাড়ী চলে এল। এমনি সময়, এমনি অভাগিনীদের কাছে নতুন নতুন প্রস্তাব আসে বিয়ের। কিন্তু ডালিমজানের কাছে কারুর সাহস হল না গোঁফে আতর মেখে এগুতে।

ডালিমজান বাপের ঘরেই আছে, কিন্তু পেট চালায় নিজের হিম্মতে—আর সময় অসময় যেটুকু পারে পরের বিপদে আপদে সাহায্য করে দরদী মা, মাসী অথবা বড় বহিনের মত।

সেই ডালিমজানই কথা বলছিল কবির সংগে।

ডালিমজান সম্বন্ধে সকলের যেমন একটা ভয় ছিল, কবির তেমনি ছিল

একটা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা। এই দলিতা বঞ্চিতা মুসলিম্ নারীর মধ্যে রয়েছে কেমন একটা অনমনীয় দৃঢ়তা! শত লালসার সুযোগ থাকলেও ও রেখেছে নিজেকে একান্ত করে দূরে সরিয়ে। অন্ন বস্ত্রের অভাব হলেও ও রয়েছে নিজের সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে বেঁচে। ও সাধু নয়, দেওয়ানাও নয়, তবুও পৌছে গেছে যেন জীবন তপস্যার একটা কেমন সিদ্ধির কোঠায়!

কবি নিকটে এসে বলল, 'রসুল কোথায়? ঘর আঁধার কেন?'

'বৌর দুটো যমজ মরা বাচ্চা হয়েছে। বৌর হুঁশ নেই, ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই। মাঝি গেছে ডাক্তার-বাড়ী। পথে তেল কিনতে পারলে নিয়ে আসবে। তা আপনি এয়েছেন কেন, ও তো আজ যেতে পারবে না।'

'আমি ওকে ডাকতে আসিনি ডালিমজান, এসেছি এমনি একটু কাজে, তুমি কিছু মনে কর না। মাঝি না আসা পর্যন্ত আমি বসছি।'

কবি খানিক বসে রইল বাইরে। আবছা এবং আবডালে জ্যোৎস্না এখানে প্রেতিনীর রূপ ধরেছে। ঘরের ভিতর কিছুটা ঠাহর পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু ভয় করছে ভাল করে তাকাতে। বুক কাঁপছে ভাবতে। এ ভাবেই বা কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা যায়? ডালিমজানই বা গেল কোথায় কবিকে একা ফেলে? রসুলের বৌ কি বেঁচে আছে, না মরেছে? কবিকে কি মৃতের পাহারায় বসিয়ে রেখে ডালিমজান অদৃশ্য হল? ও কি সত্যই ডালিমজান?

'তামাক নেই, বিড়ি খাবেন?'

কবির যেন চমক ভাঙল। না, না আমি ওসব খাইনে। তোমার এত কষ্ট করার কি ছিল! এমন বিপদের সময়...'

'মুহুরী মশায়, আমাদের বিপদ ছাড়া সুখের সময় কতক্ষুণ? অতিথি-বিতিথ এলে এর মধ্যেই আদর-যত্তন করতে হবে। সময়ের আশায় থাকলে, সে সময় আর আমাদের নসিবে জুটবে না।'

'আমি তো বিড়ি তামাক খাইনে।'

'পান ?'

'তার চেয়ে বরঞ্চ দেখ একটা আলোর বন্দোবস্ত হয় কি না, আমি বৌকে একবার দেখতাম।'

ডালিমজান অনেক চেষ্টায় একটা মশাল সংগ্রহ করে জ্বালিয়ে আনল। এ কোনও তেলের মশাল নয়, কি যেন এক প্রকার ফল বেটে শুকিয়ে এ মশাল প্রস্তুত—জ্বলছে টিমিয়ে।

এই অনুজ্জ্বল আলোকে কবি রক্ত জলের কাঁথা-কাপড়ের মধ্যে যে দৃশ্য দেখল—তা অসহনীয়, ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। কবি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল এখানে ডালিমজানের মত মেয়েই কেবল মাথা ঠিক রেখে কথা বলতে পারে, পারে সেবা করতে—কবি নিতান্তই অপাংক্তেয়।

'মাঝি কোথায় গেছে ?'

'আপনাদের পাড়ায়।'

'যাই তাকে ডাক্তার নিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে বলি গে। এত দেরী করা তো উচিত নয়।'

'উচিতের কথা বলছেন—উচিত কিনতে যে মসল্লার কাজ তাই তো মিঞার হাতে নেই। হয়ত যখন উচিত জোগাড় হবে তখন তার কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

কবি উঠে পড়ল। তার চোখের সুমুখে কেবল রসুলের বাড়ীর দৃশ্যটা ভাসতে লাগল। সমস্ত জ্যোৎস্না-ভরা আকাশে কেমন যেন কালি কালি রক্তমাখা মেঘ দেখা যাচ্ছে। অথচ তার মধ্যেই কুহু। এ সকলই কবির কাছে অসহ্য বলে বোধ হচ্ছে। ঘৃণা হচ্ছে জ্যোৎস্নার মরীচিকার ওপর, বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে যত কোকিলের ডাকে! আজ তার কাছে চরম সত্যই ঐ রক্ত। ক্ষমা নেই, বিলাস নেই, খুনের বদলে খুন। চিত্ত-বিভ্রান্তকারী কোকিলের জন্য বন্দুক।

কবি সোজা রসুলের খোঁজে ডাক্তার-বাড়ীর দিকে চলে এল। তার সংগে পথেই দেখা।

'ডাক্তার ?'

'এল না, পাঁচটা টাকা অন্তত নগদ চাই।'

'বল কি—শুনলেও যে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। চামার নাকি !'

'সবে সে কাল ধার করে ওষুধ এনেছে। আমি তো সংগে ছিলাম, আমার নায়েই গিয়েছিল—কি আর বলি বলত ? ও-ও তো গরীব ডাক্তার।'

কবির রাগটা হঠাৎ জল হয়ে যায়। সে আশ্চর্য হয়ে তাকায় রসুলের দিকে। ওর মুখে কি আছে ? ছুটি মাত্র ক্ষীণ বিষন্ন চাহনি। শরীরটা তো একখণ্ড চিতায় দগ্ধ কাঠ। তবু কত মমতা কত দরদ ! ডালিমজানের ভিতরও এই জিনিষটা দেখতে পেয়েছিল কবি।

কবির মনে রসুলের একটা ছবি ছিল, তার পাশে আজ এসে ডালিমজান দাঁড়াল। কবি সম্ভ্রমে যেন ছুটি রক্ত গোলাপের মালা দিল ওদের কণ্ঠে। তোমরা আমার নমস্য।

'রসুল আমার সংগে এস—দেখি একটা ব্যবস্থা করতে পারি কি না টাকা পাঁচ টার।'

কবির মনে পড়ল থলেটার কথা। তার ভিতরও ছিল ঐ পরিমানই অর্থ। সুযোগ যখন এসেছে তখন তাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে হবে—পরিশোধ করে দিতে হবে দেনা।

কবির আনন্দ হয়, নেচে ওঠে বুক।

অজয় বলে, চুপ, নেচো না মূর্খ ! এক হাতে নিয়ে, ভিন্ন হাতে দিয়ে লাফাতে চাও ছাগলছানার মত ? গতানুগতিক নৃত্য ছেড়ে দাও। চিরাচরিত দয়া, মায়া, দাক্ষিণ্য যাঁদের এক চেটিয়া তাঁদের পন্থা এঁড়িয়ে

চল। পূর্ব দিগন্তে তরুণ অরুণ, নতুন পথে পা বাড়াও। কবি, তুমিই না প্রগতির দিক-দিশারী ?

'মুহুরী মশাই কেন গিয়েছিলে আমার বাড়ী ?'

কবি অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, 'এমনি।'

খানিকটা এগিয়ে ওরা এসে এক জায়গায় থামল। 'তুমি এখানে দাঁড়াও রসুল—আমি এক্ষুণি আসছি।'

কবি একটা লাউমাচা ছাড়িয়ে একখানা ছোট্ট রান্নাঘরের কাছে এসে ডাকল, 'কুসুম, কুসুম !'

নিশিপদ্মের মত কুসুম বেরিয়ে এল খন্তি হাতে। 'কি, এমন হঠাৎ যে !'

'পাঁচটা টাকা দিতে পার ?'

'এই জন্য এত মিষ্টি গলায় ডাকা ?'

এ তো কবির মধুর কণ্ঠ নয়, অত্যন্ত আকুতিপূর্ণ আবেদন। কুসুম যদি উল্টা বোঝে কবি কি করবে ?

'বড় দায় ঠেকেছি কুসুম। এমন দায় জীবনে আর কখনও ঠেকিনি। যদি সম্ভব হয় পাঁচটা টাকা ধার দাও। টাকা অবশ্য আমি পরিশোধ করব।'

'তোমার দায় ঠেকার কথা পরিষ্কার বলতে পারছ, অন্যের দায় ঠেকার কথা কখনও কান পেতে শোননি। আমি এমনি ধার দিতে পারব না, সুদ চাই।'

'তাই দেব—টাকায় চার আনা নিলেও রাজী।'

'সরল ভাবে বলছ ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু টাকা আনি কোথায় পাব ?'

'শেষ কালে এই কথা বলছ ? তুমি অত নিষ্ঠুর হয়ো না, যে কোনও

উপায় জোগাড় করে দিতেই হবে—আমি বড় দায়গ্রস্ত।' কবির একখানা হাত কুসুমের করতলে লগ্ন হয়।

আর কি থাকা যায়, আর কি ভাবা চলে; আর কি ঠাট্টা জোগায় মুখে? কুসুমের হৃদয় উথলে ওঠে।

এ প্রেমের পীড়ন নয়, অভাবেরই লেন দেন। কুসুম হাত ছাড়িয়ে ঘরে যায়। সিন্দুরের কৌটায় সঞ্চিত টাকা পাঁচটি তুলে আনে।

'এই নাও।'

'ধন্যবাদ।'

কুসুমের কানে কিছু ঢোকে না। সে শুধু অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে। রক্তমাংসের মানুষটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, মনের মানুষটা যেন আরও দৃঢ় হয়ে আসন পাতে।

'রসুল, এই যে তোমার টাকা—চলো আমি তোমার সংগে ডাক্তার নিয়ে আবার তোমার বাড়ী যাব।'

'সেকি কথা, এত কষ্ট করবে?'

'তুমি অত আশ্চর্য হয়ো না, আরও কথা আছে।'

নিতান্তই পরম মুহূর্ত আগত, চরম সত্য কথাটুকু বলে ফেলবে। কিন্তু কেমন জানি ভাষা হারিয়ে ফেলতে লাগল কবি। হাজার হলেও সে মানুষী ভাবাবেগ রক্ষা করতে পারছিল না। তবু তাকে বলতেই হবে এ নির্জন পথে অতি সংগোপনে বুঝিয়ে। রসুল তো বোকা!

'মাঝি!'

'কি?'

গলা বন্ধ হয়ে গেল কবির। আবার দুজনে কতকটা পথ ছাড়াল। আর তো সময় নেই, ঐ ডাক্তার-বাড়ী। কবি যেন সবিক্রমে নিজের কণ্ঠ থেকে ভাষা টেনে আনল। 'রসুল যে থলেটা তোমার চুরি

গিয়েছিল, সেটা আমিই নিয়েছিলাম। অতএব এ টাকার জন্য তুমি চিন্তা কর না, আমিই যেন ফিরিয়ে দিলাম।'

'বলেন কি, বলেন কি, এ হতে পারে না—তুমি চুপ করেন।'

এর পর যত করেই কবি বোঝাতে গেল, ততই অবিশ্বাস্য হয়ে উঠল রসুলের কাছে।

কবি শ্রান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিল।

তের

রসুলের বাড়ী যাতায়াতে সপ্তাহ খানেক গত হল। অনেক চেষ্টায় ঘোটা সুস্থ হয়েছে। রসুলও কাজ কর্ম করছে নিয়ম মত। কিন্তু এই যে নিয়মের সূক্ষ্ম সুতো কখন একটু টানেই ছিঁড়ে যায়, তা বলা যায় না। ভাবলে এদের জন্য ভাবনার যেমন শেষ নেই, কাঁদলেও কাঁদার তেমনি অবধি নেই।

সেই জন্যই অনেকে বিরক্ত হয়ে এ সমস্যাকে চাপা দিতে চেয়েছে, ভাগ্য এবং নিয়তির হাতে সঁপে দিয়ে।

কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সে পরিষ্কার দেখছে—

অর্থ ও স্বার্থের জালখানি ফেলা হয়েছে চমৎকার করে ছড়িয়ে। হাতে দড়ি রয়েছে, সুদৃঢ় তটে দণ্ডায়মান শিকারীর। মৎসকুল খাবি খাচ্ছে। টানে টানে ক্রমান্বয় এগিয়ে আসছে তটপ্রান্তে। এই মুহূর্তেই জালের ফাঁস ছেঁড়া উচিত, নইলে মৃত্যু অনিবার্য। এ ভাগ্য নয় অদৃষ্টও নয়, শিকারীর চক্রান্ত! জাল ছিঁড়তেই হবে, ভাঙতে হবে যত মান্ধাতার আমলের জীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো।

কিন্তু স্থান কাল পাত্রানুযায়ী উপায়ে তো এখনও অনাবিষ্কৃত। কবি হাটে চলে গবেষণা করে মনে মনে। বহু তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে তার হৃদয়ের রসায়নাগার, বহু মৌলিক উপাদানও সংগৃহীত হয়েছে দুঃখ, ক্লেশ, নিপীড়নের। এখন চাই, তপ্ত রশ্মি, যার স্পর্শে চকিতে জন্মাবে নতুন এক অদ্ভুত যৌগিক পদার্থ—যার তেজে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গ্লানি-মুক্ত হবে নিমেষে। ক্ষ্যাপার মতই মনে মনে গবেষণা করে কলমজীবী মুহুরী। চাই তীক্ষ্ণ তপ্ত রশ্মি।

'বাবা, এত দেরী হল যে আজ? সবাই ঘুমিয়ে গেছে, আমি শুধু একা ভয়ে জেগে রয়েছি।'

'তোমার মা?'

'শরীরটা ভাল না, বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মা এখনও খায়নি। আমি খেয়েছি, কিন্তু ঘুমোতে পারছি নে ভয়ে।'

'এত ভয় কিসের মা?'

কাঁথা-কাপড় ঠেলে হেনা উঠে বসল। পিতার কাছে এসে বলতে লাগল, 'বাবা আমি গাংগুলী বাড়ী গিয়ে যা দেখে এসেছি, তা আর বলব কি, ভীষণ! এখনও বুক কাঁপছে ভাবতে।'

'কি দেখে এসেছ যে অত ভয় পেলে?' কবি মেয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাকে সাহস দেওয়ার জন্য সস্নেহে তার চিবুকখানা তুলে ধরল। 'কি দেখেছ মা?'

'গাংগুলী কাকার ছোট্ট ছেলেটা শুকিয়ে লিক্‌লিকে হয়ে গেছে—এখন আর কাঁদতে পারে না, কঁকায় শুধু। এমনি একটা ভূতের ছানার ছবি ছিল আমার একখানা বইতে। সেই যে ছড়ার বইটা কুসুম পিসী কিনে দিয়েছিল আমাকে।' কবিকে অন্যমনস্ক দেখে হেনা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বুঝি মনে পড়ছে না?'

কবি মেয়ের কথায় কোনও জবাব না দিয়ে যে ভাবে এসেছিল, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেল সন্তর্পণে।

হেনা অবাক হয়ে রইল।

কতটুকুই বা পথ! কিন্তু আসা তো হয়নি, রাখা তো হয়নি প্রতিশ্রুতি। কবি এমন অমানুষ হয়ে গেছে যে ভাবতেও ক্লেশ বোধ হয়। কবির ইচ্ছা করে নিজেকে আঘাত করতে। বেতো পংগু ঘোড়ার ওপর ক্রোধান্ধ হয়ে যেমন চাবুক চালাতে চায় মনিব।

শোষিত জর্জরিত পংগু আত্মা বলে, আর তো সইতে পারি নে তোমার এ নির্মম অবিচার। দিন কাটে আমার বেশ্যাবৃত্তিতে, রাত কাটে তারই জের সামলাতে, তারপর যদি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি আমার পংগু অকেজো হয়ে যায়—হে নৃসংশ তার জন্যও কি চালাবে চাবুক?

কবি মর্মবেদনায় চুপ করে পথ চলে।

একটি স্তিমিত-প্রায় দীপাধারের তলে সেদিনের সেই নৃত্যরত ভোলানাথ হাঁপাচ্ছে। আর তারই শিয়রে কংকালসার মা জেগে বসে রয়েছে। হেনা যে ভয় পেয়েছিল তা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়।

চুপে চুপে কবি ঘরে ঢুকল।

গাংগুলী ছবি আঁকছে নীরবে ঘরের একপাশে বসে। শিল্পী এত নীরব যে তার এ স্তব্ধতা কবির সাহস হচ্ছে না ভাঙতে।

মধুমালতীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল কবি। কি বলবে, কেমন করে তার উপস্থিতি জানাবে, তাই ভেবে পাচ্ছে না।

মধুমালতী কি সজাগ নেই, শিল্পীও কি নিশ্চল—নইলে কেউই একটু নড়ছে না কেন? কেবল মাত্র কানে আসছে ছেলেটার শ্বাসের শব্দ। এ তো ভয়ংকর নীরবতা! এর ভিতরে কবির না আসাই ভাল ছিল।

এখন মনে হচ্ছে মধুমালতী ঝিমোচ্ছে, মাঝে মাঝে তার তন্দ্রা ভাঙছে। আবার যেন চোখ বুজছে সে।

গাংগুলীকে যেন দেখাচ্ছে পাথরের প্রতিমূর্তির মত। কোন্ ভাস্কর যেন দরিদ্র মধ্যবিত্ত বাঙালীর একটি প্রতীক উৎকীর্ণ করেছে অতি সুদক্ষ হস্তে। এ ঘরের মধুমালতী এবং শিশুটিও তাই। এর পাশেই যদি কেউ রসুল, তার স্ত্রী ও ডালিমজানকে উৎকীর্ণ করত তবে বোধ হয় দৃশ্য ও ব্যঞ্জনাটা আরও পরিপূর্ণ হত। এ শুধু বাংলার নয়, বৃহৎ বিশ্বেরই প্রতীক—প্রতীক চক্রবর্তীর বিপরীত শিবিরের।

মধুমালতী হাসছে। অসম্ভব, অসম্ভব। স্তিমিত দীপশিখায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত কবি ভুল দেখছে—হয়ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কবির মাথাই বিগড়ে গেছে। কি করে এ অবস্থায় মধুমালতী হাসতে পারে! তবু সন্দেহ হয় কবির। ইচ্ছা করে, ছুটে গিয়ে প্রদীপটা উজ্জ্বল করে দিতে। কিন্তু প্রদীপটাও যে তৈল শূন্য—শুধু পল্‌তেটাই পুড়ছে।

আবার ওকি দৃশ্য দেখতে হল কবিকে? এই নৈশ আবহাওয়াও শিল্পী ঘামছে। শীত এখনো শেষ হয়নি একেবারে। এত ঘাম এল কোত্থেকে? ফোঁটা ফোঁটা জমেছে কপালে ও মুখে। দাড়ি গোঁফের জংগল ভেদ করে নীচে পড়ছে। শিল্পী কি তার সমস্ত স্নায়ু-চেতনার লাগাম খুলে দিয়ে জোর কশাঘাত করেছে তার কল্পনার ঘোড়াগুলোকে?

কবি এমনি ঘাম ঝরতে দেখেছে রসুলের, ঠিক এমনি ঘাম গড়াতে দেখেছে বিত্তহীন ঠিকা কৃষাণদের। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরে ওরা যখন লগি মারে কিংবা লাঙলের ফালগুলো প্রাণপণে মাটিতে চেপে ধরে তখন ওদের ললাটে, গণ্ডে ও দেহে যে ঘর্মের বন্যা নামে, সেই প্লাবনই এখন এসে নেমেছে শিল্পীর দেহে।

প্রদীপটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে। হয়ত গাংগুলী সংজ্ঞা হারাতে পারে, কবি এগিয়ে যায় তাকে ধরতে।

ও কি অদ্ভুত ছবি এঁকেছে শিল্পী! অদ্ভুত নয়, ভয়াল ভয়ংকর! কবির দেহে যেন কাঁটা দিচ্ছে।

রমণীর পেলবতা কই ? কই নগ্নশ্রী উর্বশীর ? অচ্ছোদ সরসী তীরের বিজয়িনীই বা কোথায় ?

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত গৌরব
অনাদৃত—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনোও জড়িত তাহে,—আয়ু পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,—
লুটায়ে মেঘলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে ;—নূপুর রয়েছে পড়ি,
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।...

এ যে গৃধিনী ও লক্ষ লক্ষ কংকালের ছবি—শ্মশানের চাইতেও ভয়ংকর দৃশ্য !

মন্বন্তর ?

কোথায় ?

পৃথিবীর যে কোনও দেশে, যে কোনও রাষ্ট্রে। ভারত, জার্মানী, ইটালী, এমন কি হলিউডের আশপাশেও অসম্ভব নয়—কষ্ট-কল্পনা নয় যে কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

বহু মূল্যবান্ তূলি নেই রঙ নেই অতি মহার্ঘ—কিন্তু ছবি ফুটেছে কি মর্মস্পর্শী ! রেখায় রেখায় কি বাস্তব অন্তর্দাহী স্পর্শ ! কবি উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

গাংগুলী সত্যই শিল্পী, সত্যই উজ্জ্বল প্রতিভা ! কিন্তু তার অন্ন জোটেনা। কবি ভাবে এ বঞ্চনার জন্য কে না ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ?

গাংগুলীর বড় ছেলেটি এসে হাত ধরল অজয়ের। কোনও দিন

তাদের মুখে যে কথা শোনা যায় নি, তাই আজ শোনা গেল। 'এদিকে একটু সরে আসুন কাকা, কথা আছে।'

অজয় সরে এল। 'কি কথা ভানু?'

'আজ দু'দিন ধরে কিছু সুবিধা হচ্ছে না।'

কিসের সুবিধা হচ্ছে না; তা কবি বুঝল নিমেষে। ঠিক করে বললে বলতে হয়, আজ দু'দিন ধরে জুটছে না একেবারে। কিন্তু এর সূচনা হয়েছে বহুদিন ধরে। তারই পরিণতিতে শিল্পীর ঐ দশা।

হায়রে শস্য শ্যামলা ধন ধান্যে পুষ্পেভরা বসুন্ধরা! একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখো তোমার সন্তানের অবস্থা!

কিন্তু তোমার দোষ কি? এখন তো সবে ফাল্গুন মাস। বলতে গেলে এখনও মাঠের ধানই গোলায় ওঠেনি! এর মধ্যেই এত হাহাকার! জমিতে কি ফসল কম হয়েছে, চক্রবর্তী কি ধান কম পেগেছেন? তা যখন নয়, তখন সত্যকারের যে দাবীদার সে কেন থাকবে উপোসী তার স্ত্রী পুত্র নিয়ে? জন্মের সংগে সংগেই কি সে সংগত স্বত্ব পায়নি বিশ্ব নিখিলের মানবীয় অধিকারের? সে কি জারজ, বর্ণ সংকর? নীতি ও আইনের অগ্রাহ্য? সে আখ্যা শিল্পীকে দেওয়া চলে না, চলে না দেওয়া ভূমিহীন নিঃস্ব রসুলকে, সে আখ্যা প্রযোজ্য নয় ব্রজদাস ও বুড়ো সুদর্শনের বেলাও।

অর্থনৈতিক সরস তরুর কাণ্ডদেশে যে মেরুদণ্ডহীন একপ্রকার পরগাছা জন্মেছে, তাদের বরঞ্চ ঐ আখ্যাই দেওয়া চলে। সত্যিকারের কি তাদের পুরুষানুক্রমিক মৌলিক অধিকার আছে শিল্পী, ব্রজদাস ও রসুলের মত? এই জল জমি জংগল ও সূর্যকরের ওরাই তো শাশ্বত ওয়ারিশ।

শ্রম তো কস্মিনকালেও ক'রে দেখেননি শ্রীল শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী, মাথার ঘাম তো পায়ে ফেলে দেখেননি কোনদিন—তবে দাবীটা কিসের?

শেষের প্রশ্নের জবাবটা চায় কবি।

চৌদ্দ

কবি ভাবতে ভাবতে বাড়ী এসে পৌছাল।

সে বাড়ী এসেছে কিছু চাল সংগ্রহ করে নিতে। অন্তত দুটো বেলার আন্দাজ।

'মলিনা, মলিনা—ওঠো তো।'

কবির আওয়াজ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল স্ত্রী।

'চাল কোথায়?'

'কেন? চাল দিয়ে করবে কি, রান্না হয়েছে।'

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে কবি বলে, 'রান্নার কথা শুনতে চাচ্ছে কে? জিজ্ঞাসা করছি চালের কথা। কাল যে আধমণ চাল আনা হল—সবই বুঝি খরচ করেছ? জিনিষটা আনতে না আনতেই যত রাজ্যের ধার দেনা শোধ না করলেই কি হত না? আমি তোমাদের নিয়ে এমন জ্বালাতেও পড়েছি।'

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এতগুলো জবাবদিহির মধ্যে পড়ে মলিনা একেবারে হতবাক হয়ে গেল।

'কি, কথা বলছ না যে?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, তোমার সে চাল থেকে তো একটা দানাও খরচ করিনি।' মলিনা জবাব দিল।

'মিথ্যে কথা! তবে সে চাল গেল কোথায়?'

দুঃখে অপমানে মলিনার প্রতিবাদ করার মত আগ্রহও নষ্ট হয়ে গেল।

বিয়ের পর অবধি সে এমনি হাজারও অপমান নীরবে সয়েছে। দোষ নেই তবু আঘাত, অপরাধ নেই তবু সাজা। যখন নববধূ ছিল, তখন মন ছিল, স্বাস্থ্য ছিল আশা ছিল ভবিষ্যতের। এখন তার কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই। তাই আর কিছু যেন সহ্যও করতে পারে না মলিনা। বিশেষ করে স্বামী যদি হয় অবিবেচক। তারপর, যে ঝগড়া তর্ক ক'রে নিজেকে হালকা করতে পারে তার কথা স্বতন্ত্র। গার্হস্থ্য জীবনে সুখ ছিল, সে সুখের মূলেও কুঠার পড়েছে অর্থনীতির তারতম্যে। অজয় কবি, মলিনা তার জীবনের শোক দুঃখ কল্পনার ছবি—এদের মধ্যে কি বিরোধ সম্ভব ?

ঐ সামান্য উত্তেজনাতেই হেনার তন্দ্রা ভাঙল্। সে বলল, 'বাবা, সব চালই তো রয়েছে দাদুর কাছে।'

'সেখানে গেল কি করে ?'

এর পিছনেও একটা সুদীর্ঘ কারণ রয়েছে।

মধ্যম পাণ্ডব বিজয় ছিল কাঠ-গোঁয়ার। কিন্তু সে ছিল সংগীতপ্রিয়। পিতা মৃত্যু শয্যায়, বড় ভাই সংসারের চিন্তায় অস্থির, তবু তার আধুনিক সংগীত চর্চা বন্ধ হয়নি একটি দিনের জন্যও। বেসুরো গানে এবং বেতালা হারমোনিয়ম বাদনে সে যখন-তখন অতিষ্ঠ করে তুলত বাড়ীর সবাইকে। গান সে বন্ধ করে দিতে পারত এবং এসময় তা করাও উচিত। কিন্তু সে যে তা করেনি, তারও হেতু একটা ছিল জব্বর।

পিতা এখন তখন। জ্যেষ্ঠ সংসারের খাওয়া পরার অতিরিক্ত কিছু ভাবছে না। মধ্যম যে, সে তো চুপ করে এসব সইতে পারে না। সে তার বিবাহের চিন্তায় মগ্ন। এসময়টি বৃথা গত হলে তার জীবনে আর কি সুসময় আসবে ?

অনেক চেষ্টা তদ্বিরে সে একখানা জীর্ণ ময়ূরপংখী নাও জোগাড় করে রেখেছে ঘাটে। বাইছা (মাঝি) দেশেরই একটা কৃষাণ ছেলে। তাকে ডাক দিলে আর কথা নেই। যতীন রায়ের একটা সাবেকী

প্রকাণ্ড পকেট-ঘড়ি ছিল। সেইটা কাছে রাখত মধ্যম পাণ্ডব। কারণ সময়ের মূল্য তার চেয়ে আর কে বেশী বোঝে ভাইদের মধ্যে!

যখন খুশি মধ্যম পাণ্ডব দিগ্বিজয়ে বের হত। সংগে থাকত সময় নির্দেশক সেই ঘড়িটা আর গানের যন্ত্রটা। হঠাৎ যদি কোথায়ও এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে জয় করা সম্ভব হয়, এবং সেখানে প্রয়োজন হয় সদগুণের পরিচয় দেওয়ার, তখন একমাত্র অস্ত্র তার আধুনিক বেসুরো সংগীত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে এসব পাণ্ডবোচিত রণযাত্রার ব্যয়-সংকুলন হত কি করে?

স্বল্পভাষী যুধিষ্ঠিরের ট্যাঁক কেটে। অর্থাৎ ঘরের জন্য সংগৃহীত তণ্ডুল কিংবা অমনি কিছু হাত-সাফাই করে বেচে। এটা নিতান্তই প্রকাশ্য গোপন ব্যাপার। অপ্রমেয় বলের অধিকারী হলেও তা করত স্বভাবভীরু তস্করের মত। বড়কে ছোটর শ্রদ্ধা করা চিরাচরিত প্রথা তো!

সেই মধ্যম পাণ্ডবের ভয়েই যতীন রায় চাল আধমণ রেখেছেন শিয়রের কাছে। এখন অজয়েরও সাধ্য নেই যে ঐ চাল থেকে কিছু বের করে আনে এমন একটা জরুরী প্রয়োজনেও। যতীন রায় যদি কোন ক্রমে টের পান তবে একটা অনর্থক ঘটবেই ঘটবে। তিনি এখন যুক্তি তর্কের বাইরে।

'মলিনা তুমি রাগ করেছ, দুঃখিত হয়েছে, এখন উপায়? এ যে বড় গুরুতর ব্যাপার। কি করা যায় বলত।' কবি গাংগুলী বাড়ীর সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল। 'খাদ্যাভাবে দুধ শুকিয়েছে, দুধের অভাবে শিশু।'

'আমি যে কতক না জানি তা নয়, কিন্তু ওরা তো কারুর কাছে কিছু বলবে না।'

'আজ বলেছে। কিন্তু এতদিন বললেই বা তুমি কি করতে?

আমাদেরও তো প্রায় একই অবস্থা। সবে কিছু বেশী চাল আনলাম তো কাল।'

মলিনা খানিক চুপ করে রইল। কি যেন চিন্তা করল নিবিষ্ট মনে। সদাসর্বদাই সে শ্বশুরের কাছে যাতায়াত করে। সেবা যত্ন ঔষধ পথ্য তার ওপরই নির্ভর। সে গেলে যতটা সন্দেহের বিষয় না হবে, তার চেয়ে অনেক বেশী সন্দেহের কারণ হবে অজয় গেলে। একটু পূর্বের মান অপমানের কথা ভুলে সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মলিনা উঠে গেল। স্বামীর জন্য এই স্বল্প-ভাষিণী নারীর টান ছিল সত্য, কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর মহত্তর প্রেরণায় সে উদ্বুদ্ধ হল এখন।

যতীন রায় ঘুমুচ্ছিলেন। মলিনা সন্তর্পণে এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। অন্ধকারে একটা বিশেষ অসুবিধা হতে লাগল তার। ঠিক চুরি নয়, অথচ চুরির সামিলই যেন কাজটা! তার নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠল। হাত দুখানা লাগল কাঁপতে।

কেমন যেন একটা দুষ্ট গ্রহের ফের ছিল। ঠিক এর একটু আগেই মধ্যম পাণ্ডব এই ঘরে ঢুকেছিল তার নিত্যকারের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে। সে একেবারে শ্বাস বন্ধ করে রইল। মশা কিংবা মাছি হলে সে একটা কোনও ফুটো ফাটা দিয়ে অদৃশ্য হতে পারত, কিন্তু গলগ্রহের মত বসে খেয়ে তার শরীরে যে স্থূল মাংসপেশী জন্মেছিল তা সহজ সরল দ্বার-পথ ছাড়া নির্গমন দুঃসাধ্য। সেই দ্বার-পথেই ভ্রাতৃবধূ এসে প্রবেশ করল। তার হাতের শাঁখা ও লোহার শব্দ অত্যন্ত পরিচিত।

যতীন রায়ের ঘুম নিতান্তই পাতলা! এই সামান্য আনাগোনার শব্দেই তা ভেঙে গেল।

কি করছে বৌদি? চাল সরাচ্ছে গোপনে? হ্যাঁ তাই তো, ঠিক তাই। তা হলে মধ্যে মধ্যেই এসব ঘটে, আর যত দোষ নন্দ ঘোষের! দাদার বুঝি খাঁকতি পড়েছে টাকা পয়সার, তাই পাঠিয়েছে বৌদিকে। সকাল

বেলা হয়ত নামটা রাষ্ট্র হবে হতভাগা ভীমসেনের। মধ্যম পাণ্ডবের মগজে খুন চড়ে গেল। সামান্য কিছু সূক্ষ্ম চিন্তা করাও তার পক্ষে দুষ্কর। বৌদির ওপর যতটা রাগ হওয়ার কথা, তার চতুর্গুণ ক্রোধ হল নিরীহ দাদার ওপর।

যতীন রায় যখন সঠিক বুঝতে পারলেন যে চাল চুরি যাচ্ছে, তিনি মর্মভেদী আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কে কে চাল নেয় রে?'

মধ্যম পাণ্ডবের হাতে একটা ব্ল্যাক ক্যাট সিগারেটের টিনে একটি মাত্রই সিগারেট অবশিষ্ট ছিল। উত্তেজনার মুখে সে দেশলাই জ্বালিয়ে তা ধরাল।

'তুমি বৌমা! তুমি!' যতীন রায় একবার মলিনা, আবার বিজয়ের দিকে চেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। 'উঃ একি বিশ্বাস করা যায়—উঃ! নরাধম!'

'কোনও দিন বিশ্বাস কর না বলেই তো আজ হাতে হাতে ধরিয়ে দিল্যাম বাবা। যাদের যত সাধু ভাব তারা তত সাধু নয়।

'তুই চুপ কর হারামজাদা, আমার সুমুখ থেকে দূর হ।' রুগ্ন যতীন রায় একেবারে শয্যায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

দাঁতে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি ভীমসেন অদৃশ্য হল হাতের সিগারেটটা টিপে নিভিয়ে।

বিজয় যাওয়ার সময় বৌদির যে অবস্থা দেখে গেল, তা যদিও তারই অশুভ বুদ্ধির পরিণাম, তবু তার অন্তরে যেন আঘাত লাগল। আসলে সে একেবারে তো অমানুষ নয়, অমানুষ করেছে তাকে বিকৃত এক অব্যবস্থায়। সংসারের অভাব-অভিযোগের টানা-পড়েনের টানে সে শিক্ষা দীক্ষা পায়নি যা পাওয়া উচিত ছিল। তার মনটা অনেকটা বোনা হয়েছে তাঁতী-বাড়ীর ফাঁকি দেওয়া জালি গামছার মত। জোলো জিনিষেরও কিছুটা গুণ থাকে। তাই এখন প্রকাশ পেল তার স্বভাবে।

ইতিমধ্যে মলিনা কিছুটা মানসিক বল সঞ্চয় করল। এবং তখন তখনই কিছু না বলে চালগুলো নিয়ে প্রস্থান করল অন্ধকারে।

'ও ঘরে যে একটা হট্টগোল শুনলাম।'

'কিছু না। তুমি আর দেরী না করে চলে যাও।'

অজয় তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পনর

ছেলে মৃত্যুমুখে, মা হাসছে—এ একেবার অবিশ্বাস্য সত্য কথা। কিন্তু অজয় স্বচক্ষে দেখেছে। তাই সে কিছুতেই মন থেকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না। ঘুমের ঘোরেও সে খুঁজে বেড়াতে লাগল কারণ। মালতীর সমস্ত চেহারাটা যেন শ্মশানের পোড়া কাঠের মত হয়ে গেছে এই অল্প কয়েকটা দিনে। শোকে মানুষ পাগল হয়, কিন্তু এমন ধারা দগ্ধ হয় কিসের উত্তাপে? ভাবতেও শিউরে ওঠে অজয়। সে বাড়ী ফিরে সুস্থ চিত্তে ঘুমাতে পারে না।

'ওকি বাবা, তুমি ছটফট করছ কেন?'

'তুই এখনও ঘুমাসনি মা? আশ্চর্য!'

'ঘুম ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। কেবলই মনে পড়ছে কাকীমার কথা। আজ কাল দু বেলাই ওর জলের কলসীটা আমিই এগিয়ে দিয়ে আসতাম বার আনা পথ। হ্যাঁ বাবা কাকীমা এত শুকিয়ে গেছে কেন?'

এর সহজ উত্তর কবির কাছে স্পষ্ট।

কিন্তু কনকপুরের এই নিস্তব্ধ পরিবেশ ছড়িয়ে চলো, উত্তর শুনতে পাবে ভিন্ন রকম। হয়ত নৈশ জনশূন্য পথে তোমার সংগে সাক্ষাৎ

হবে কোনও ত্রিপুণ্ডকধারী বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর। ধুনীর আগুনের পাশে উজ্জ্বল দীপ। বৃদ্ধ শাস্ত্রপাঠে মগ্ন। বেদান্ত, দর্শন, উপনিষৎ সকলের নির্যাস দিয়ে যেন তৈরী তার প্রজ্ঞা। তিনি কত প্রচীন তা স্থির করা দুরূহ। তিনি হয়ত নিস্পৃহ ভাবে বলবেন, এ দেহীর কর্মফল, তুমি ভেবে কি করবে, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর।

অজয় সে কথায় আর তৃপ্তি পায় না। সে পলাশ মাদারে আকীর্ণ পথ ছাড়ায়, কনকপুরের অতি প্রাচীন শ্মশান ছাড়ায়, নদী নালা ডিঙিয়ে এসে ওঠে বণিক সম্রাটের গড়া সহরে। এখানে বেদান্ত দর্শনের বালাই নেই। এখানে শোষণতন্ত্রের শুধু বিশুদ্ধ হিসাব। আর দেখা যায় গাণিতিক বিবৃতি।

কে বলে এ অনাহার ?

রোগ, ব্যাধি, অবহেলা। অশিক্ষার প্রতিফল। দেখো খাতায় খাতায় বিশেষজ্ঞের নির্ভুল খতিয়ান।

যদি মধু মালতী মারা যায়, হয়ত সংস্কারান্ধ প্রতিবেশীরাও মাথা নাড়িয়ে বলবে, এ বিধাতার দুর্জয় অভিশাপ।

কেন মারা যাবে শিশু, কেনইবা মরবে তার মা ? এই বিংশ শতকে বিশ্ব প্রেমের যুগে পৃথিবীতে কোন্ প্রহননটা নেই ? গ্রাম গ্রামান্তরে সরকারী চিকিৎসালয়, এখানে ওখানে ধন-কুবেরের খেয়াল খুশির দাতব্য প্রতিষ্ঠান, বড় বড় সহরে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সোসাইটি—কিসের অভাব দরিদ্রের ?

তবু কনকপুরের অন্ধকারে বসে গাংগুলী পরিবার ধ্বংস হতে বসেছে। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের পর এইটাই কি অষ্টম এবং চমকপ্রদ নয় ?

ঘরে আঁধার, বাইরে আঁধার—কেবল কবির মনে একটি প্রশ্নভরা সন্ধানী আলো জ্বলতে লাগল। সমস্ত জগতের অংগে অংগে গলিত ক্ষত। কোথায় কাব্য, কোথায় বিলাস ? রক্ত ঝরছে অহোরাত্রি। কেন এই

পীড়ন, কেন এই ছলনা ? যদি ভুল করে আঘাতই করলে, তাকে নিরাময় কর। ভুলের মাসুল দাও। সত্যিকারের এ তো ভুল নয়—এ তো ইচ্ছাকৃত অপরাধ। তাই তো চিকিৎসার নামে চলছে জোড়াতালি। অন্নহীন, পুষ্টিহীন দেহের জন্য কোয়াশিয়া কি বড় জোর টি, বি, সেনিটোরিয়াম—জীবন্ত অভিনয়ের স্থলে প্রাণান্ত প্রহসন !

‘কবি, কবি, ও কবি—কবি ঠাকুর ওঠো।’

‘কে ডাকছ ?’

‘বলাই। এক্ষুণি চক্কোবর্ত্তী বাড়ী যেতে হবে।’

‘কেন ?’

‘সে এখন কি শুনবে, সেখানে গিয়েই শুনো—থানায় যেতে হবে।’

‘থানায় !’ কবি দোর খুলে বেরিয়ে এল। ‘বস বলাই, বস। পিঁড়িখানা টেনে নাও। থানায় যেতে হবে কেন এত রাত্রে ? সকাল বেলা গেলে চলবে না ? ব্যাপার কি ?’

‘সে এখন কি শুনবে, ওখানে গিয়েই শুনো—ডাকাত ধরা পড়েছে।’

‘ডাকাত।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া লম্বা চওড়া, হাতে কুড়ুল।’

‘আর অস্ত্র পেল না, কুড়ুল হাতে ডাকাত এল ? বল কি বলাই, বিশ্বাস হচ্ছে না।’

‘না যদি পেত্যয় হয় পরে শুনো। এখন ঝটপট চলো তো গায় জামা দিয়ে। ওঁরা বসে রয়েছেন। ডাকাতটা আর কেউ নয়, তোমার আমার নিতান্ত পরিচিত লোক।’

কবি আবার আশ্চর্য হয়, আবার প্রশ্ন করে।

বলাই বলতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, ‘সে সব এখন শুনে করবে কি—আমাদের ব্রজদাস।’

‘সত্যি !’

'বিশ্বেস না কর নিজের চোখে দেখবে চলো।'

কবি ভেবেছিল অতি প্রত্যূষে উঠেই একবার গাংগুলী বাড়ী যাবে, কিন্তু সে সব কথা ভুলে গিয়ে সে বলাইকে অনুসরণ করল।

ব্রজদাসের জীবনের একটা সংঘাতময় চরম মুহূর্ত শেষ হল। এর ইংগিত সে অনেক পূর্বেই দিয়েছিল কবিকে। তখন কবি কতক বিশ্বাস করেছে, কতক করেনি। প্রতিশ্রুতি দিয়েও লেখা হয়নি কিছুই।

কতদিন ধরে কবির অনভ্যাস! ছেঁড়া তারকে সে আবার সুর করে বাঁধবে, সুপ্ত প্রতিভাবে সে আবার যত্ন করে জাগাবে, মরচে-পড়া অনুভূতিকে সে আবার শান-পালিশ দেবে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। এতে যদি তার প্রাণও যায়, তাকে একটিবার শেষ চেষ্টা করে দেখতেই হবে। ব্রজদাসকে যে কবি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার চেয়েও বড় কথা—ঐ প্রতিশ্রুতির সংগে সংগেই সে বিশ্বজনতার কাছে দায়াবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দায়িত্বের ঋণ রেখে কবি তো কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

কবি সেরেস্তায় ঢুকেই দেখল সত্য ব্রজদাস। হাত ও কোমর বাঁধা নীল পাগড়ি দিয়ে। নিকটে একজন চৌকিদার ব'সে। কবির প্রাণটা হু হু করে উঠল ব্রজদাসের অবস্থা দেখে। চোখ দুটো আরও বসে গেছে, কপালের হাড় যেন আরও অনেকটা ঠেলে উঠেছে।

ব্রজদাস নাকি খুন করতে এসেছিল জনার্দনকে।

কবির ইচ্ছা করে ব্রজদাসকে মুক্তি দিয়ে সত্যিকারের আসামীকে ধরে দিতে।

কবি ভুলে এগিয়ে গেল ব্রজদাসের কাছে। চৌকিদার নিষেধ করল। ব্রজদাস বলল 'চললাম কবি, 'শেষের বয়ানটা একটু এদিক ওদিক হল। আমি যে চেষ্টা করেছি এই কথাটা অন্তত লিখে দিও।' কথা শেষ করে নির্ভীক যোদ্ধার মত ব্রজদাস একটু হাসল। কবি অবাক হয়ে রইল।

শেষ রাত্রি। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে চক্রবর্তী বাড়ী। ব্রজদাস

সেই যে হেসে একটু চুপ করেছে, আর কোনও কথা বলেনি। সে যেন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে! মহা বর্দ্ধিষ্ণু এক ব্যক্তির প্রাণ হন্তারক ধরা পড়েছে, কিন্তু কি যেন অজ্ঞাত কারণে তাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। আপাতত সে আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হলেও, সাধারণের কাছে একটা সম্মান আদায় করে নিচ্ছে। কবি মনে মনে ধন্যবাদ জানান ব্রজদাসকে।

ভোর বেলাই ব্রজদাসকে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিও করতে হল অনেককে। ফালতু লোকও গেল পাঁচ সাত জন। জনার্দনের হুকুম মত সমস্ত গুছিয়ে দিয়ে কবি ব্রজদাসের সংগে সংগে খানিকটা এগিয়ে গেল।

বলাই বলল, 'আর কতদূর যাবে তুমি, বাড়ী ফের।'

'যাই।' বলেও কবি আরও অনেকটা পথ অগ্রসর হল। ব্রজদাসের সংগে কোনও কথা বলল না, কিন্তু মাঠ ছাড়াল বুড়ো-ঠাকুর-ঝি তলার।

কনকপুরের শেষ প্রান্ত।

'আর কতদূর যাবে কবি ঠাকুর? এতেই বেলা দুপুর হবে।'

'ও।' কবির হুশ হল। সে থমকে দাঁড়াল। 'তাইতো বলাই, তাইতো।'

ওরা সবাই অনেকটা এগিয়ে গেল।

কবি অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'দাস আমাদের জন্য কি রেখে গেল?'

নির্জন প্রান্তরে বাতাসে যেন কানাকানি হল কেন, ওর কীর্তি!

কবি বাড়ী ফিরে এল দ্বিপ্রহের পরে।

মলিনা জিজ্ঞাসা করল, 'ঘটি গামছা দেব? সারারাত জেগে ভোরবেলা আবার কোথায় গিয়েছিলে? হেনাটা মিছেমিছিই হয়রান হয়েছে সারা রাজ্য খুঁজে।'

'ঘটি গামছা দেবে কি, আমি এক্ষুণি আসছি গাংগুলী বাড়ীর খবরটা জিজ্ঞাসা করে।'

মলিনা ধীরে ধীরে বলতে গেল, 'আজ সকাল বেলা ভোলানাথ...'

'চুপ কর মলিনা। আমার আর যাওয়া হবে না—ঘটি গামছা দাও। সত্যি সত্যি কি ঈশ্বর আছেন? মূর্খ মানুষ এখনও পূজা-আচ্ছা করে কোন্ বিশ্বাসে?'

কবির চিত্ত সমুদ্র মথিত করে সহসা দুটি মুখ দেখা দেয়। একপ্রান্তে একটি পুষ্টিহীন বালকের মুখ অপর প্রান্তে বহু ঝঞ্ঝাক্লিষ্ট এক বৃদ্ধের।

ষোল

ব্রজদাসের কথা নিয়ে বেশ উত্তেজনার মধ্যে কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল এই কনকপুরবাসীদের। শুধু সে কথায় যোগ দিল না কবি। সে একেবারে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল। খায় দায় কাজ কর্ম করে ফরমাস মত—কিন্তু থাকে যেন অনেক দূরে সরে। গাংগুলী বাড়ীও সে যায় না, রসুলেরও সে খোঁজ নেয় না। তার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে সমস্ত ব্যবহারিক জগতের ওপর।

একদিন কবি কাজে যাচ্ছে, কুসুম ডাকল, 'কবি একটু দাঁড়াবে।'

'কেন কুসুম?'

'ভেবেছিলাম একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।'

'এখন কি স্থির হয়ে শুনতে পারব? যদি সামান্য কিছু হয় তো বলতে পার।'

'সামান্যই। কিন্তু এখন না হয় থাক, অন্য সময়ই বলব। আবার তোমার সংগে দেখা হচ্ছে কখন?'

'তুমি যখন বলবে।'

'স্রেফ মিথ্যা কথা। আমার ইচ্ছায় কি তুমি চলো? আমার কথা মত কি তুমি আসবে? তোমার কাছে আমি সে প্রত্যাশা করিনে। বরঞ্চ তুমি যদি একটা সময় নির্দিষ্ট করে দাও তখন না হয় আমিই ফের আসব।'

'সন্ধ্যা বেলা এই পুকুর পাড়ে,—কেমন মন্দ হবে কি? আমি একটু সকাল সকাল ফিরতে চেষ্টা করব আজ। তুমি সময় মত এসো। পরের কাজ, সামান্য কিছু দেরী হলে না হয় অপেক্ষা ক'রো।'

'সেকি ভাল দেখাবে? নির্জন সন্ধ্যা, পুকুর ধার, রাত্রিও হতে পারে।'

'তবে কি করতে বলো—সত্যিই তো কারুর চোখে পড়লে নিতান্ত অশোভন হয়ে দাঁড়াবে।'

'হক। তুমি ঠিক সময় মত এসো, তারপর বোঝা যাবে। লোক নিন্দার ভয় করেই তো আমরা মরলাম। জীবনে যেটুকু শান্তি পেতাম তাও গেল ঐ করে করে। এক পা এগুতে দু পা পিছাই।'

'কেন এত সংকোচ বলত?'

'তোমরা রমনীকে ভূষণের নামে শিকল পরিয়েছ লজ্জা সংকোচ ও ও ভয়ের। তা তারা আজও ছিঁড়তে পারেনি, অনেকে আদৌ বুঝতেই পারেনি তোমাদের যে কি কৌশল। ধন্য তোমাদের পুরুষ জাতটা।'

'এইবার কুসুম রাগের মাথায় নির্বিচারে সবাইর ঘাড়ে দোষ চাপালে। সকলেই কি দোষী? আমাদের ভিতরও কজন ঐ দুর্বলতা গুলো এড়িয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছে? ঐ দাস্য মনোবৃত্তি গুলি তাদের জন্যই একান্ত করে তৈরী, সমাজে যারা শোষিত বঞ্চিত।

তুমি ভাবছ শুধু তোমার কথা; আমি ভাবছি জগতের কথা। অনেক দেরী হয়েছে, আর নয়—সন্ধ্যা বেলা দেখা হবে।'

কবি চলে গেল।

ওগো গুণময় আর একটু কি দাঁড়ান সম্ভব হল না! যখন তখন না বুঝে তোমার ওপর কত রাগ করি, কত কটু কথা বলি, সে কথা কি তুমি মনে রাখ না? সমস্ত গরলকে মন্থন করে কি অমৃত করে তোল? হে বিশ্বদরদী তোমাকে তো কেউ চিনল না। কেউই তো দিল না তোমার উচিত মূল্য।

কুসুম নিজেই বা কতটুকু দিয়েছে! বোধহয় না বুঝে আঘাতই করেছে অতিরিক্ত। অনুশোচনায় কুসুমের হৃদয় আজ ব্যথায় ভরে উঠল। তার হৃদয়ের ব্যথাতুর আকাশে অমনি কনকপুরের সামান্য অজয় বিশ্ব দরদী রূপে আলো ছড়াতে লাগল।

কুসুম হর্ষে দুঃখে, এক অব্যক্ত অনুভূতিতে অধীর হয়ে বাড়ী ফিরে এল।

বাড়ী ফিরে একখানা চিঠি পেল সে। 'এ খানা কে খুলল?'

অনেকদিন বাদে শ্রীমতী জবাব দিল, 'ভুল করে আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। ভেবেছিলাম তোমার কাছে কে আর চিঠি লিখবে, ওখানা লিখেছে আমার সই আল্লাদী দাসী। ছোটবেলায় দুজনে কত বৌ বৌ খেলেছি পুঁই মাচার নীচে বসে। বরকে বিদায় দেওয়ার কথা উঠলেই আল্লাদীর সেকি কান্না। আমি কনের মা হয়েও না কেঁদে পারিনি। আমাদের দিন কাল ভাব ভালবাসা সবই ছিল আলাদা।'

কুসুম মনে একটা আনন্দ নিয়ে এসেছিল, চিঠি পেয়েই তা কতকটা উবে গেল। আর সে ঘাঁটাতে চাইল না শ্রীমতীকে।

কুসুম শ্রীমতীকে চিনত ভাল করেই। সে যে ভুল করে চিঠি খুলেছিল তা নয়, খুলেছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। যদি কুসুম পণ্ডিতের

লেখা পত্র ইচ্ছা করে না পড়ে, তাই রেখেছিল একেবারে ছিঁড়ে তার দৃষ্টি পথে খুলে। কুসুম এতদিন দেখে কি বৌদির পেট ব্যাথার কারণ বুঝতে পারে নি!

পণ্ডিতের সমস্ত পত্রটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

যদি কেউ এসে বসবাস না-ই করে তবে মিছেমিছি পৈত্রিক ভদ্রাসনটা আগাছার জংগল করতে ফেলে রেখে লাভ কি? আমার একার পক্ষে কলকাতার চাকরী এবং দেবীপুরের বাড়ী দু'টো সামলান অসম্ভব। অনেক চিন্তা করে দেখেছি দেশে খাওয়া পরার অভাব না থাকলেও আমার পক্ষে সামান্য এই অধ্যাপকের বৃত্তিটুকুই অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিক্ষার পরিবেশ ত্যাগ করে এখন আমি থাকব কি নিয়ে। তুমি একান্তই যদি দেবীপুর না আস, তবে আমাদের ভদ্রাসন ও তার সংলগ্ন জমি জায়গা স্থির করেছি কোনও দরিদ্র পরিবারকে দান করে দেবো। সে শুধু আমাদেব পৈত্রিক বিগ্রহ শিলার নিত্য পূজার ভার নেবে। তোমার মতামত ব্যতীত তো কিছু করতে পারি নে, তাই লিখে জানালাম। প্রয়োজন হলে আসতে ও পারি—চিন্তা করে জবাব দিও। কোনও ব্যস্ততার কারণ নেই। ইতি

স্বামীকে কুসুম ভালবাসে না, হয়ত অনেক সময় তার চিঠি অবহেলা করে পড়ে না। কিন্তু যেখানে এ পত্র ইতি হল সেখানেও তার যেন কেন থামতে ইচ্ছা করছিল না। কোনও আবেগ, চঞ্চলতা কিম্বা অনুযোগ পণ্ডিতের পত্রে নেই, তবু কুসুম ইতিকথার পরে আরও অনেক কথা চেয়েছিল। বিরতির পর সুরের রেশ! শেষের পরও অশেষ।

এ পত্রে তা পাওয়া সম্ভব নয় বলেই কুসুম তথনকার মত তা তুলে রাখল একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে।

স্বামীকে কি লিখবে তাই ভাবতে লাগল সারা দিন ধরে। কুসুমের মতামত চেয়েছে পণ্ডিত। পণ্ডিতের কাছে ওর মতামতের এমন একটা কি মূল্য থাকতে পারে তাই বুঝে উঠতে পারে না কুসুম। সে পণ্ডিতকে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না, জীবন ভরে তুচ্ছ করেই এল, তবু পণ্ডিত কোন দুরাশা নিয়ে অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছে? নদীর চিড় খাওয়া তীরে দাঁড়িয়ে একি পাণ্ডিত্য!

কুসুম আবার চিঠিখানা পড়ল। পড়ল দরদের সুরে একনিষ্ঠ অভিনেত্রীর ভংগিতে। কেন তার মর্মস্পর্শ করছে?

এ তার দুর্বলতা, এ তার অভিনেত্রী মনের কথা—এ তার নিগূঢ় আত্মকথা নয়। কুসুম উঠে দাঁড়াল। সে বারবার বাইরে এসে বেলার দিকে চাইতে লাগিল।

পাঠশালা ছুটি হয়েছে, কয়েকটি ছেলেমেয়ে কলরব করে চলে গেল। পল্লীর শ্যামাংগনে সূর্যের দীপ্ত শিখা স্তিমিত হয়ে এল। গরু বাছুর ফিরতে লাগল গোচারণ ভূমি থেকে। অধ্যবসায়, চেষ্টায় ও প্রতি-যোগিতায় যে জিতেছে, তার গতি মন্থর। আর যে হেরেছে, তার এখনও দৃষ্টি উগ্র—দেখতে দেখতে একটা লতা গাছের ডগা নিয়ে ছুটল পাশের বাড়ীর গরুটা। কুসুম কিছু বলল না। রসময়ী রসিয়ে রসিয়ে এক ঢিলে প্রতিবেশীকে ও মেয়েকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে মেয়ে পলাতক। আর প্রতিবেশী তো অনুপস্থিত। অতএব তিনি দন্ত দন্তে ঘর্ষণ করতে করতে শ্রীমতীর কাছে গিয়ে বিষ উদ্গীরণ করলেন।

'তা আমাকে শুনিয়ে কি লাভ, পেটে তো আমি ধরিনি।'

'তোমাকে বলছি বৌমা তুমি সব বোঝা বলে।'

শাশুড়ীর এ প্রশংসায়ও কেন জানি বধূমাতা তেমন সন্তুষ্ট হতে পারল না।

সন্ধ্যা উৎতীর্ণ হয়েছে, রাত্রি আগত। কবির দেখা নেই। কুসুমের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে। সে কান পেতে রইল কবির পথের দিকে চেয়ে। এত দেরী হচ্ছে কেন? হয়ত কবি বিশেষ কোনও কাজে জড়িয়ে পড়েছে, নয়ত ভুলে গেছে প্রভাতের প্রতিশ্রুতি। এ ভাবে আর কত কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? কুসুম একেবারে অধীর হয়ে উঠল।

কবি এল একটু পরেই।

'আঃ বাঁচলাম! ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ভুলে গেছ।'

'কিছুই ভুলি নি কুসুম। কেবল তাড়নায় তাড়নায় আমাকে অমনি মনে হয়। আজ আহার পর্যন্ত জোটেনি।'

চমৎকার সময়! এই তো অপূর্ব অবকাশ তার মনের কথা ব্যক্ত করার। একে যখন পেটের ক্ষুধায় অস্থির, অপরে এসেছে উপোসী মনের দাবী মেটাতে। দেহের চেয়ে মনটাকে তো কুসুম এখন কিছুতেই বড় বলে স্বীকৃতি দিতে পারে না—সে মন তার নিজের হলেও তো যুক্তি তর্কের বাইরে যাওয়া চলে না।

'তবে তুমি খেতে যাও। আজ না, কাল বলব।'

'আগামী কালও তো দির্দ্দিষ্ট নয় আমার কাছে, অতএব আজ শোনাই ভাল। রোজ রোজ তুমি ফিরে যাবে!'

'না গো তাতে কি হবে, তুমি খেতে যাও। আমার কোনও কথা অন্তত আজ নেই, আমি বাড়ী চললাম।'

'শোনো কুসুম ঠাট্টা নয়, আমার সময় বড় অল্প—যা বলার তা এখনই বলে যাও। আমারও তো একটা ঔৎসুক আছে।'

আঁচলে টান পড়ল, কুসুম থামল। একি সত্য? সত্য হলেও অসহ্য, মিথ্যা হলেও অসহ্য এ এমনি এক মর্মান্তিক অনুভূতি।

যে কথা বলবে কুসুম তা যেন সময় মত ভুলে গেল। যা বলার নয় তাই বলে ফেলল। 'পণ্ডিত চিঠি লিখেছে।'

'বেশ তো ভালই। শরীর ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ। সে জানতে চেয়েছে এখন আমি কি করব? এখানে থাকব, না দেবীপুর যাব? দেবীপুরের বাড়ী ঘর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—কেউ দেখার নেই।'

'সে কথা তো একান্তই সত্য। তার পৈত্রিক বাসস্থান, তোমার শ্বশুরের ভিটা। মাটির সংগে যেখানে স্মৃতি বিজড়িত থাকে, সে মাটির মায়াই আলাদা।' কুসুমের মুখের দিকে চাইল কবি। কি দেখল তা সে-ই জানে। 'তুমি বুঝি এখন সেখানে যেতে চাচ্ছ? এতদিন পরে, ভাল।'

কুসুম ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'না—তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি কি করা উচিত আমার তরফ থেকে?' জিজ্ঞাসা করেই সে উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। তার মুখ চোখ গেল বিবর্ণ হয়ে—কি জবাব আসে! এ যেন জজের এজলাসে অপেক্ষমান আসামী। এই মুহূর্তেই রায় শোনা যাবে—হয় মুক্তি নয় ফাঁসি।

'আমি তোমাকে কি বলব কুসুম? তুমি তো অবুঝ নও।'

'তবু তোমার কাছেই শুনব। তুমিই হুকুম দাও। তোমার কথা ছাড়া তো এ জীবনে একান্ত অন্তঃকরণে কারুর কথা ভেবে দেখি নি।'

'তোমার হৃদয় কি বলে?'

'বাজে কথার সময় নেই। এই নির্জনে দাঁড়িয়ে সুস্থ মনে, ধীর চিত্তে রায় দাও। তোমার কথা চরম দণ্ড হলেও পরম গৌরবে মাথা পেতে নেব।' উত্তেজনায় কুসুম অস্থির হয়ে ওঠে।

'তোমার দেবীপুরই যাওয়া উচিত।'

'কি, কি বললে, দেবীপুর? আচ্ছা কাল থেকে আর আমার মুখ কেউ দেখতে পাবে না কনকপুরে। নমস্কার ধর্মাধিকরণ। তুমিই সত্য, আমি মিথ্যা।'

কুসুম চলে গেল, কবি নিস্তব্ধ হয়ে রইল। ধীরে ধীরে যখন তার মনটা সুস্থ হয়ে এল, সে তার তীক্ষ্ণ ধীশক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখল—এ তাদের নিছক মানসিক দ্বন্দ্ব নয়। মন দেওয়া-নেওয়ার ছবিও নয় রাগ-অনুরাগ। শাস্ত্রানুশাসন ও সমাজ বৈষম্যের ফাঁদ রয়েছে অন্তরালে গুপ্ত। সেই ফাঁদেই বাধ্য হয়ে পা দিয়েছে কুসুম ও কবি। ওরা যখন হাঁপাচ্ছে—তখন হয়ত বিপরীত বাতায়নাশ্রয়ী শিল্পী তার সুসজ্জিত কক্ষে শিকারীর মত ওৎ পেতে বসে আছে।

সে লিখছে…

তার কৃষ্টির বাহক প্রকাশক ছাপছে…

পাঠক পাঠিকা পড়ছে গড্ডলিকা শ্রোতে দাঁড়িয়ে—

হাপুষ নয়নে কেঁদে ত্রিকালজ্ঞ ভূষণ্ডীর মত সমালোচক বলছেন—কী মরমী আলেখ্য! কালজয়ী আলিম্পণ!

অভুক্ত অজয় ভাবে: সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা বিশেষজ্ঞ বায়স প্রধানেরা জানেন না, বর্তমানের কী ভয়ংকর মর্মকথা!

মন দেওয়া-নেওয়ার ছিনিমিনিই একক ও প্রধান শিল্প নয়…আজ প্রাধান্য অর্জন করেছে, শোষণ, পীড়ন, ও জঠরের জ্বালা।

গতানুগতিক সাহিত্যের কবি ও কুসুম আজ শুধু মাত্র খেলনা—টিপ দিচ্ছে আর রবারের পুতুল কাঁদছে যেন। ও চোখের জল একান্তই মিথ্যা।

পুতুল সত্য নয়, সত্য হচ্ছে এ জগতে যত কনকপুরের বাসিন্দা। তাদের চোখে জল কই—ও যে স্ফুলিংগ ঝলক! অন্তরে শুধু ব্যথা কই ও যে প্রলয় তরংগ—এসেছে নব চেতনা।

কবি কি তা রূপায়িত করতে পারে না?

সতের

দিন তিনেক পরের কথা।

সকাল বেলা সবে রোদ পড়েছে সমস্ত উঠানের ওপর। মলিনা সের কয়েক চিঁড়ের ধান শুকাতে দিয়েছে। মেয়েকে বলেছে একটু বসে পাহারা দিতে। চঞ্চলা হেন তা পারবে কেন? সে গেছে তার কুসুম পিসীর খোঁজে। কতদিন যেন সে তাকে দেখেনি—অথচ বেশী দিন নয়, মাত্র দু তিন দিনই হবে। রোদে দেওয়া ধান গুলো দিব্যি এক ঝাঁকে হাঁস এসে ফলার করে যাচ্ছে। অন্য এক বাড়ীর হাঁস, নিমন্ত্রন ছিল না, তবু খেতে লাগল ঠোঁট গলা ফুলিয়ে।

হাঁসের কলরব শুনে মলিনা বেরিয়ে এল। মেয়ে কোথায়? গ্রামের পথের তেমাথা পর্যন্ত পরিস্কার—একটি কাক পক্ষী ও নেই। শুধু এখান ওখানে রোদে গাব গাছের ফিকে বেগুনী নতুন পাতা কাঁপছে।

হেনা তখন আবডাল থেকে পিসীকে ডাকছে আর পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ভান করছে লুকোচুরি খেলার।

কিন্তু কিছুতেই তো জবাব দিচ্ছে না পিসী। অন্তর দুটো মন্দ বললেও ভাল লাগত হেনার।

এই না হেনা দেখল তার পিসীকে! বড় ঘরে ছিল, গেল কোথায়? তন্ন তন্ন করে হেনা খুঁজল সব ঘর—গোঁসাই মণ্ডপ, পুকুর ঘাট অবধি।

তার পিসী তো নেই।

মানুষটা নেই, কিন্তু তার ছায়া তো ভাসছে যেন সর্বত্র। হেনা ব্যাকুল হয়ে খুঁজে মরে।

'কাকে চাস লো ?' শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করে। 'বলত তোর মতলব খানা কি ? সেদিন কিন্তু আমাদের একটা কাঁসার বাটি খোয়া গেছে।'

'খোয়া যাবে কেন, কুসুম পিসী ভেঙেছে তোমার কপালে মেরে। যাকে যা বলার নয় তাই বলা। আসুক একবার পিসী।'

'যে খুঁটির জোরে কুঁদছ, সে খুঁটি ভেঙেছে। তিনি দেবীপুর গেছেন, আর ফিরছেন না।'

নিমেষে হেনার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাড়ীর কাছে এসে সে রীতিমত ফুপিয়ে ফুপিয়ে উঠতে লাগল। রাগে দুঃখে তার সারা দেহ জ্বলছে।

হেনার অবস্থা দেখে তার মা আর কিছু বলতে পারল না। আবার এর মধ্যে এসে উঠল পাখীর মা। মাথায় এক গাঁট ধোপ-দোরস্ত কাপড়।

'কেমন আছ ধোপা বৌ, বস।'

'না মা ভাল নয়—মেয়েটাকে নিয়েই জ্বালায় মলাম। ওর বয়েস আর রূপই হল কাল। একবার বিয়ে দিলাম সে স্বোয়ামী মারা গেল দুমাস বাদে। তারপর আবার সব্বাইর কথায় বিয়ে দিলাম, সে হতচ্ছাড়া সন্ন্যাসী না বিবাগী হয়ে গেল। আবার সব্বাই পরামর্শ দিলে যে চক্কোবর্ত্তীর সুমুখ থেকে মেয়েকে সরাও। দিলাম আবার বিয়ে। এখন নাকি দ্বিতীয় পক্ষ সাধুর ভেল ছেড়ে বাড়ী এসে উঠেছে। শেষ পক্ষকে শাসাচ্ছেন, ও-বৌ আমার। বলি, ভণ্ড বেটা যে স্বোয়ামীগিরি ফলাতে এল সে তো ভাবল না, এতদিত মেয়েটা খেলে কি ? তার মান ইজ্জৎ বা সামলাল কে ;' মাথার বোঝাটা নামিয়ে রেখে ধোপা বৌ ফের বলতে লাগল, 'গরীবের রূপই হল কাল। যাক গে, কুসুমদি দেবীপুর যাওয়ার সময় এই কাপড়গুলো আর একখানা পত্তর দিয়ে গেছে তোমাকে দিতে।'

'অ্যাঁ বল কি, ঠাকুরঝি দেবীপুর গেল, অথচ বলে গেল না ! দেখি কি পত্র দিয়েছে ?'

হেনাও আগ্রহে তার মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

কি একটা কাজে অজয়কেও যেন তাড়াতাড়ি কোথায় যেতে হবে। তাই সেও এসেছে চারটি খেতে—এমন সময় ধোপাবৌর আবির্ভাব, এমন সময় এ বাড়ীর সব চেয়ে বড় আত্মীয়ের বিদায় সংবাদ।

কবি একটু বিচলিত হয়ে পড়ে। সত্যই দেবীপুর চলে গেছে কুসুম ? তার ইচ্ছা করে পত্রখানার আত্মোপান্ত একটিবার চোখ বুলিয়ে দেখতে। কিন্তু সে তার দুর্বলতা দমন করে। সংযম আসে ভিন্ন একটা কারণে। সে সকলের অলক্ষ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সকলের অলক্ষ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে।

কুসুম যত দূরেই সরে যাক, কবি তাকে ভুলতে পারে না। দেনা পাওনা ও হিসাব নিকাশ আজই শেষ হয়ে যাওয়ার নয়। এ একটা ছেদ বটে, বিয়োগ নয়।

আপাতত নতুন একটি মুখ এসে কবির বুকে হিসেবের খাতা খুলল—যার রূপ হয়েছে কাল। যত দুঃখ ও নির্যাতনের হিসাবই কি কবিকে রাখতে হবে ? ষোল বছরে পা দিয়ে তিন তিন বার বিয়ে হয়েছে পাখীর। হিন্দু মেয়ের এমন কাহিনী কি কেউ শুনেছে কখনো ? শুধু একটু নিরাপত্তা কেবল চারটি অন্ন, তার জন্য দেহ ও লাবণ্য বন্ধক দিতে হয়েছে বারবার।

বিষয়টা আরও একটু খুলে বলতে হয় এখানে—

পাখীর মা জোলা না জেলের মেয়ে কেউ আজ পর্যন্ত তার উৎপত্তির সংবাদটা জানে না। সে একদিন, অনেক বছর আগের কথা উদয় হয় কনকপুরে এসে শ্যামা রজক দাসের স্ত্রী হিসাবে। কেউ কিছু টের পায়নি, সেই ভাবেই সে এতদিন চলে গেছে। তার গুটি তিনেক

মেয়ে হয়েছে। আর দুটিরও বিয়ে হয়েছে, বলতে গেল তারা খেয়ে পরে এক রকম আছে। যত জ্বালা বড়টিকে নিয়ে। সৌন্দর্যই হয়েছে নাকি ওর কাল!

মানুষের যতই ক্ষমতা বেড়ে থাক, আজ পর্যন্ত রক্ত মাংসের দেহে রূপ ফোটাবার অধিকার তার জন্মায় নি। সে জনক হতে পারে, জঠরেও ধরতে পারে দশ মাস দশ দিন—কিন্তু রূপ-শিল্পী ভিন্ন চেতনা। যদি স্বভাবকে ধরে নেওয়া যায় অথবা ধরে নেওয়া হয় প্রকৃতিকে—কিম্বা কোনও তার্কিককে সন্তুষ্ট করতে বলতে হয় আল্‌ফা, বিটা. গামা—তবু রূপের মূল্য কখনও কমে না। হাজারে একটি হয় রূপসী, লক্ষে একটি অতুলনীয়া। পাখী হচ্ছে লক্ষ তারার ভিতর নীল জ্যোতিভরা একটি তারা।

শ্যামা ধোপার মেয়ে পেয়েছে অতুল রূপ, সে রূপ কাল বই কি, যখন চক্রবর্তীর বাড়ীর কাছে।

কবি যত ভাবে ততই সে বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে।

কুসুম লিখেছে:

বৌ,

দেবীপুর চললাম, আর হয়ত কনকপুর ফিরব না—উচিত ছিল তোমাদের সংগে দেখা করে যাওয়া, কিন্তু মন সায় দিল না। উচিত অনুচিত আর ভাল লাগে না। কি যে ঠিক, কি যে বেঠিক তাই আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না।

তোমার কাছে একটা নিবেদন। জানি তুমি প্রত্যাখ্যান করার মত মেয়ে নও, তাই সাহস করে পাঠালাম। আমার যেমন তোমার কাছে লজ্জা নেই, তোমারও তেমনি আমার কাছে কোনও কুণ্ঠা নেই।

আমার বাক্সে কতগুলো পুরান কাপড় ছিল তাই ধোপাবৌর মারফৎ

পাঠালাম। আমি একা। চিরদিনই হয়ত একা কাটাতে হবে। তোমার মেয়ে বড় হচ্ছে, কিছু দামী কাপড় আছে, ওর কাজে লাগবে। তোমাদের পণ্ডিত মাঝে মাঝে ওগুলো পাঠাত, আমি কোনও দিনই ব্যবহার করিনি—হেনা যেন সার্থক করে। ওর পিসী ওকে কোনও দিন কিছু দিতে পারেনি, কস্মিনকালে হয়ত তার তা সম্ভবও হবে না। ওর পিসে মশাইর বাসনাটা, ও যেন সহজ মনে পূর্ণ করে। বৌ, মেয়ে তোর, কিন্তু আজ ওর জন্যই যেন বেশী মন পুড়ছে আমার···

মলিনা বাকীটুকু আর পড়তে পারে না, কণ্ঠ ধরে আসে। হেনা এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে।

কবি অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে মা ও মেয়ের দিকে। সে পত্রের সংবাদ জানে না, কিন্তু বেশীক্ষণ চেয়েও থাকতে পারে না এ-দৃশ্যের দিকে। সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যেমন এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা আর স্মরণও হয় না তার।

সেদিন বাড়ী ফিরতে ফিরতে কবির অনেক রাত হল। অভুক্ত স্বামীর খোঁজে মেয়েকে বারবার চক্রবর্তী বাড়ী পাঠাল মলিনা। কবি কি যেন কাজে দূরে গেছে, কখন ফেরে সঠিক কেউ জানে না। তার খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিনা তাও কেউ কিছু বলতে পারে না। হেনা খুঁজে খুঁজেও বিশেষ কিছু জানতে পারে না। সে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এসে একেবারে পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ে।

অপেক্ষা করতে করতে দিন শেষ হয়ে আসে। মলিনার আহার হয় না। সারা পৃথিবীর ভিতর কবির ওপর যে ছোট্ট গৃহটিতে শুধু তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নেই, সেখানে আশা ভরা প্রতি মুহূর্তটি গুণে একটি নারী প্রদীপ জ্বালে, একটি নারী স্পন্দিত বুকে তুলসী তলায় মাথা নোয়ায়—নীরবে কামনা করে স্বামীর কল্যাণ।

মলিনার জ্ঞান বর্ণপরিচয় অবধি—কিন্তু বর্ণনাতীত এক মহিমময়ী রমণী তার ভিতর যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

প্রহরখানেক রাত্রে কবি বাড়ী ফেরে। হেনা তখন ঘুমিয়েছে।

'খাওয়া হয়নি বুঝি?'

মলিনা চুপ করে রইল।

'সে আমি আগেই জানতাম। কেন যে এমন করো?'

মলিনা তাড়াতাড়ি স্বামীর আহারের চেষ্টায় গেল। উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

'কুসুম তো চলে গেল মলিনা। কি বলো, ভালই করল। এখানে তো তার কোনও সুখ নেই।'

'সেখানে গিয়েও যে সুখী হবে, এরও তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

অজয় যেন সবলে একটা ঝাকুনি খেল। এ কথা তো সে ভেবে কুসুমকে যেতে বলেনি! এই বাক-সংযতা নারীটি এতখানি গভীরে গিয়েও সব তলিয়ে দেখে—আশ্চর্যই বটে!

কোন্ অখ্যাত গ্রামের অবজ্ঞাত বংশ থেকে ওকে চয়ন করে আনা হয়েছে, লেখাপড়া শিক্ষার ওর তেমন অবকাশ হয়নি—কিন্তু জ্ঞান জন্মেছে পরিপক্ক। কবি মলিনার সবকিছু জানত এবং চিনত—আজ বিস্মিত হয়ে ভেবে দেখল ওর অনেকখানিই তো ছিল কবির কাছে অনাবিষ্কৃত। তাই কবি আবার বলল, 'তা সত্যি মলিনা, তোমার কথাই ঠিক। দেবীপুর গিয়ে যে কুসুম সুখীই হবে এর কোনও অকাট্য যুক্তি নেই।'

'কিন্তু তোমার কথায়ই তো গেছে।'

'কি করে জানলে?'

'আমার কাছে একখানা আয়না আছে।' বলে মলিনা কাজে চলে যায়।

'তাইতে সমস্ত কিছু প্রতিফলিত হয়। অদ্ভুত তো আর্শীটা! মলিনা, মলিনা!'

'কি?' মলিনা ভাত নিয়ে এল। সুখ বস্তুটা স্থানে, কি পাত্রে নয়, সুখ মনে। ঠাকুর ঝি সেই মনটাই স্থির করতে পারছে না। বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তো মানুষকে বাঁচতে হবে।'

কবি আর কিছু বলে না। ভাত খেতে খেতে কেবল ভাবে, সেই মনটা নিয়েই কি মলিনা বেঁচে আছে—বৃহৎ উদার মন? তাই কি কোনও বিরুদ্ধ শক্তিই তাকে টলাতে পারছে না? ঝড় ঝাপটা তো এল কত রকম। কবি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে একটিবার স্ত্রীর দিকে তাকায়।

মলিনা প্রশ্ন করে, 'আর দুটি ভাত দেব?,

আঠার

সুলোচন বাবার সংগে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না অন্য কাজে যেন গ্রামান্তরে কোথায় গিয়েছিল। সে বাড়ী ফিরে শুনল যে কুসুম দেবীপুর চলে গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ফলের বাগানে ও জংগলা পুকুর পারে ঝিঁঝিরা উৎসব জুড়ে দিয়েছে সোৎসাহে। কুসুমদির এমন সংবাদটা সে ছোটদিকে না জানিয়ে থাকে কি করে? বালকের মন ব্যাকুলতায় আঁকুপাঁকু করতে লাগল। তথ্য পরিবেশনের চেয়েও বড় প্রলোভন একটা বিশেষ কিছু পুরস্কার প্রাপ্তি—সে কাপড়ও হতে পারে, টাকাও হতে পারে।

পথ অন্ধকার। শীতলা তলার ওপর দিয়ে যে যেতে হবে একা। যদি কাঁচাখেগো দেবতার সে নজরে পড়ে যায়? অনেকখানি ঘুরেও

যদি যাওয়া যায় তবু যেতে হবে ছাড়া মাঠটার ওপর দিয়ে। কিন্তু তালগাছ যে আছে পাঁচটা। ঐ তালগাছেই তো স্কন্ধ-কাটার বাস। সুলোচন শিউরে ওঠে।

কি যাদু দণ্ডই না ছুঁইয়ে দিয়েছেন ছোটদি—গরীবের ছেলেকে উপহার। সুলোচন স্থির থাকতে পারে না, সে একখানা লাঠি নিয়ে রাম নাম জপতে জপতে এগিয়ে চলে।

সে কেন জানি মনে মনে সাব্যস্ত করে নেয়, মা শীতলা স্কন্ধ-কাটার চাইতে কম ভীতিপ্রদ। তাই সে শীতলা তলার ওপর দিয়ে শ্বাসরোধ করে ছুটে চলে। এবং থামে এসে চক্রবর্তী বাড়ীর সীমানায়। দম সামলাতে তার অনেকক্ষণ লাগে। সে পা টিপে টিপে সকলের অলক্ষ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরের কাছে উপস্থিত হয়।

'ছোটদি একটা সংবাদ।'

'কে রে—সুলোচন? এমন অসময় যে লাঠি হাতে?' ছোটদি মণ্ডপের ভিতরে বসেছিলেন—বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। 'এমন চেহারা কেন সুলোচন, কারুর সংগে কি মারামারি করেছিস? হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'একটা সংবাদ…'

ব্রজদাসের ঘটনার পর থেকে জনার্দন খুব হুশিয়ার হয়ে গেছেন। সন্ধ্যার পর আর যখন তখন হট্ করে তিনি ঘর ছেড়ে একা বের হন না। তিনি সেরেস্তা থেকেই হাঁকলেন, 'কিরে ছোটদি. সংবাদ কি, লাঠি না কুড়ুল?'

'তুমি চুপ কর দাদা। নিশ্চিত মনে নিজের কাজ কর। কি যে বাই হয়েছে তোমার!'

কোনও কাজই জনার্দনের নেই—এতকাল নিশ্চিন্তেই তার কেটেছে। বর্তমানে হয়েছে বিপত্তি। ঘটিয়েছে ব্রজদাস।

'তারপর সুলোচন কি যেন বললে?'

'একটা সংবাদ···কুসুম দি···'

কবি এসে মণ্ডপের কাছে দাঁড়াল।

সুলোচন একেবারে থতমত খেয়ে থামল। ভাগ্যিস সে সবটা বলে ফেলেনি।

ছোটদি একটা ধমক দিয়ে উঠলেন, ডেঁপো ফাজিল ছেলে কোথাকার। যাও শিগ্‌গীর বাড়ী। যাও।'

সুলোচন মুখ কাঁচুমাচু করে অন্তর্ধান হল।

'ওকে রাগ করলেন কেন ছোটদি? একটু খানি একটা কচি ছেলে! ও যেমন করে অন্ধকারে ছুটল হয়ত ভয়-টয় পাবে। কোন্ না নালা খানায় পড়ে হাত পা ভাঙে।'

'মরুক গে—তুমি বস, কি জন্য এসেছ আমার কাছে?'

গরীব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র ছেলে। কবি ছোটদির কথায় জবাব না দিয়ে মহা দরদে বালককে অনুসরণ করে। 'ভয় পেও না সুলোচন দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তোমাকে শীতলতালা পার করে দিচ্ছি।' কবি দ্রুত পায় সুলোচনের কাছে এগিয়ে যায়।

'আমাকে কি আপনি ধরে নিয়ে যাবেন ছোটদির কাছে? আমি আর আপনার বিপক্ষে কিছু বলব না।' সুলোচন একেবারে বাঁশের পাতার মত কাঁপতে থাকে। কাঁচা-খেগো দেবতার চেয়েও যেন ছোটদিকে বেশী ভয়।

'না হে তোমাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাব? তুমি আর কথা বল না, এই দাঁড়ালাম বাড়ী যাও।'

সুলোচনা চোরের মত গিয়ে বাড়ী ওঠে। কবির মহত্বের কারণ বোঝার মত তখন তার মনের অবস্থা নয়।

কবি ছোটদির কাছে ফিরে আসে। অন্ধকারে কবি সুলোচনের

কচি বিবর্ণ মুখখানা দেখেনি, দেখেনি তার ভয়ার্ত চাহনি, কিন্তু অনুভব করেছে তার কোমল দেহের কম্পন। সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুলোচনের কথা ভুলতেই পারে না।

'ছোটদি আমাকে কি লক্ষ্মীপুর না গেলেই নয় ? বাবা অসুস্থ, সংসারে অভাব অভিযোগ, আমার পক্ষে দূরে যাওয়া কি যে কঠিন ব্যাপার তা না বুঝলে বলে বোঝান যায় না।'

'কেন, ভাইরা দুজনৈ তো রয়েছে ?'

জবাব দেওয়ার মত কোনও কথা নেই। এমনিতেই সকলে সব জানে আর হাটে হাঁড়ি ভেঙে কি হবে ? 'ওরা যত বড়ই হক, বাবা মনে করেন ওরা নাবালক। তাই এ সময় আমাকে দূরে যেতে দিতে চান না। এক আধ দিনের কথা হলেও হত, লক্ষ্মীপুর গেলে কি দুচার দিনে ফেরা যাবে ! জোটের মহল কত অন্তরায় হতে পারে।'

'যত অন্তরায় হক না কেন, তা সমাধান করে, আমাকে তাড়াতাড়িই ফিরতে হবে। তুমি কি মনে কর আমি লক্ষ্মীনারায়ণ জিউকে ছেড়ে অনেকদিন কোথায়ও থাকতে পারি ? যেদিন থেকে এই মণ্ডপের ভার নিয়েছে, সেদিন থেকে শীতাতপে সেবা ছেড়ে একটি দিনের জন্যও কোথায়ও কি দূরে গিয়ে রয়েছি ? আজ যাচ্ছি একান্তই তাঁর প্রয়োজনে, —সম্পত্তি তো আমার বা দাদার নয়। আমরা মাত্র তাঁর সেবক।'

'এ কথা অতি সত্য, এ কথা প্রমাণ নিরপেক্ষ। চোখের উপরই তো সব দেখছি। কিন্তু বাবা মৃত্যু শয্যায়…'

'কবি রূঢ় হলেও একটা কথা বলতে হচ্ছে। আমার মুখের ওপর এত বাক্‌বিতণ্ডা স্বয়ং চক্রবর্তীও করেন না। তুমি যা বলছ ওর জন্য আমি রুষ্ট নই, কিন্তু জেনে রেখো পিতার চেয়েও পরম পিতার ওপর কর্তব্য বেশী, নীতি ও ধর্মের অনুশাসন যদি না মান, জড় জগতে নেমে এসো। তোমার পেটের চাইতে বড় কে ? সেই উদরের অন্ন জোগাচ্ছেন'

কে ? তার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করতে চাও ? তুমি নিতান্তই অকবি। ছোটদি হাসলেন, মনে মনে বললেন—মূর্খ !

কিছুক্ষণ চিন্তা করে কবি জবাব দিল, 'আমি আপনাকে আবার সবিনয়ে জানাচ্ছি, পেটটা মানুষের প্রধান বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বড় নয় —অন্তত আজ আমার কাছে তা তো নয়ই। আজ যে আপনি একান্ত করে ঐ বস্তুটার ওপর জোর দিচ্ছেন, তাতে অন্ন সংস্থানের কোনও মহিমা নেই, আছে কেবল ছলনা। যদি তা না থাকত তবে আমি আজ আর আপনার পায় ধরতাম না। ছোটদি হাসি পায়, চির ক্ষুধার্তের কাছে ব্যাখ্যা করছেন কিনা অন্নের চাইতে বড় কিছু নয় !'

'তোমার মাথা গরম হয়েছে কবি। সত্যই কি তোমার বাবা বেশী অসুস্থ ? তা হলে বাড়ী যাও—ভেবে চিন্তে পরে যা হক উত্তর দিও। যাত্রা বদলই না হয় করা যাবে এবার। তুমি এতও দুর্বিনীত হলে আজ।'

'তার জন্য আমি ক্ষমা চাই ছোটদি, এখন বাড়ী চললাম।' কবি দ্রুতপদে প্রস্থান করে।

ছোটদি সবিস্ময়ে ভাবেন এ হল কি ? একটা মুখচোরা মানুষ এমন মুখ খুলতে শিখল কি করে ? ভিতরে ভিতরে তাঁর দারুণ অপমান বোধ হচ্ছিল। কিন্তু মন্দও লাগল না একটা নির্জীব মানুষের সজীবতা। সুন্দর মানুষ ক্রুদ্ধ হলে, সে যে আরও সুন্দর হয় তা এতদিন লক্ষ্য করেননি ছোটদি। তাঁর লক্ষ্য করার মত অবকাশও হয়েনি। ছিলেন ঈশ্বর মহিমায় মগ্ন—দেখলেন মানুষের মুখে চোখে রক্ত স্ফুরণ আজ প্রথম। এই হল আসল মানুষ—শক্তিতে শুধু গণ্ডার নয়, বুদ্ধিতে অপরাজেয়। এর সংগে তার দ্বন্দ্ব সাজে। সে দ্বন্দ্ব বিয়োগান্ত কিংবা মিলনান্তক যা-ই হক না কেন। যত আপত্তিই করুক, কবিকে 'জোটের মহলে' নিয়ে যেতে হবে। মুহুরীকে দিতে হবে নায়েবী—প্রয়োজন হলে তিনি সৃষ্টি করবেন নতুন একটা উচ্চতর পদ, দেবতা বাঞ্ছিত। ছোটদি

গুণীর কদর বোঝেন—আজ দেখছেন এক অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক। কে কবিকে বোকা বলে, সে বুদ্ধির সুমেরু শৃংগ।

'কবির সংগে তুই কি নিয়ে তর্ক করলি এতক্ষণ? সেরেস্তার পাশ দিয়ে ছোটদি বড় ঘরে যাচ্ছিলেন, জনার্দন জিজ্ঞাসা করলেন।

'সে লক্ষ্মীপুর যেতে চাইছে না। বলছে বাপের অসুখ, সংসারে অভাব, নানা বায়না তুলছে। ঘর-কুনো মানুষের যা হয়।'

'লক্ষ্মীপুর কি তোকে যেতেই হবে, আমি গেলে হয় না? তা হলে তো এই সব ঝামেলা হত না—একে তাকে নিয়ে টানাটানি।'

'তুমি কি ভেবেছ যে বাড়ী বসে থাকতে পারবে, আমার সংগে সংগেই যেতে হবে। কাজ যা কিছু তোমাকে দিয়েই করাতে হবে—আমি থাকব কেবলমাত্র দর্শক। তুমিই গান গাইবে, দূরে বসে আমি শুধু তাল রাখব—পাছে সম না কেটে যায়।'

'একি গান নাকি ছোটদি, আমরা কি লক্ষ্মীপুর যাচ্ছি যাত্রার দলের মত অভিনয় করতে? হাসি পায় তোর কথা শুনলে।'

'আবার কান্না পাবে আসরে উঠে আমাকে না দেখলে। তাই তো আমার এত কষ্ট স্বীকার। নইলে আমার এমন কি মাথা ব্যথা কবিকে নিয়ে টানাটানি করার।'

জনার্দন আর আপত্তি তুলতে পারলেন না। বরঞ্চ বুঝলেন ছোটদিকে ঘাঁটালে কেঁচো খুঁড়তে সাপই ওঠার সম্ভাবনা। কবি যাবে যাক, তাঁর অত মাথা ব্যথার কি প্রয়োজন! ছোটদি যখন সংগে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তখন নিশ্চয় লক্ষ্মীনারায়ণজিউর একটা কিছু গূঢ় নির্দেশ আছেই! তিনি নতমস্তকে মণ্ডপের দিকে তাকালেন।

ছোটদি চলে গেলেন সেরেস্তা ছেড়ে।

জনার্দন গদগদ চিত্তে মনে মনে বললেন: হে দেবতা নিষ্কাম চিত্তে ছোটদির মত আমি ভাবতে পারি নে কেন? এ বিষয়-আশায় ধন-

দৌলত যে তোমার তা আমার মনে হয় না কি জন্য ? জয়ন্তী ও আমি তো একই বংশের সন্তান, কিন্তু তার তুলনায় আমি কত হীন ও নগণ্য। আমার যেখানে ভোগ অদম্য, জয়ন্তী সেখানে বৈরাগিণী। আমার যেখানে লালনা বাসনা উদ্দাম, জয়ন্তী সেখানে স্থির অচঞ্চল। প্রভু আমাকে ভক্তি দাও, জয়ন্তীর মত হতে শেখাও।

জনার্দন রাত্রে অনেক কিছুই ভাবলেন, কিন্তু সকাল বেলা যখনই ছোটদির সংগে দেখা হল, তখনই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁরে কবিকে কি সংগে না নিলেই নয় ?'

জয়ন্তী দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ দাদা, না নিলেই নয়।'

জনার্দন মাথা নোয়ালেন, ছোটদি একবার তার দিকে বক্রদৃষ্টি হেনে চলে গেলেন বহু পুরুষের স্থাপিত বিগ্রহ জিউর সন্নিকটে।

গতকাল রাত্রে বাড়ী ফিরে আসার পথে কবি এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। চারদিক পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় আবছা আলো। পাতলা কুয়াশার মেঘ দেখা যাচ্ছে গ্রামে ও বনস্থলীর ওপরে। শীত নেই বললেই চলে, বসন্তের আমেজ অনুভূত হচ্ছে চতুর্দিকে। উত্তেজনায় তাড়াতাড়ি হেঁটে চলছে কবি, শুনতে পেল মধুক্ষরা কণ্ঠ। এ স্বর সে কতদিন শোনে নি। সে থামল ঔৎসুক্যে। সুপ্ত পল্লীর অন্তরাল থেকে, অতি স্পষ্ট শব্দ আসছে ভেসে। মধুমালতী কবিতা আবৃত্তি করছে :—

ওগো পসারিণী দেখি আয়,
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছে ধরি
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।

একি বিশ্বাস করা যায়? সেদিন যার সন্তান মারা গেছে বুকের দুধের অভাবে সে কিনা আজ আবৃত্তি করছে এই কবিতা!

কবি আবার কান পেতে রইল। গাঢ় নিদ্রা মগ্ন জগৎ। কবি যা শুনছে তা ঠিক—মধুমালতীরই কণ্ঠ।

মধুমালতীর কি চিত্ত বিকৃতি ঘটেছে, সে কি উন্মাদ হয়ে গেছে? তাই কি সে সেদিন একটু একটু হাসছিল কবিকে বিস্মিত করে দিয়ে?

আবার কয়েক পংক্তি কবিতা শোনা গেল। এবার ভিন্ন একটি কবিতা।

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো এসো এসো এসো মোর হৃদয় নীরে।

নিশ্চয় মধুমালতীর মাথা খারাপ হয়েছ। কবি আহত হল। সে ভিন্ন পথ ধরল—যাবে গাংগুলী বাড়ীর দিকে। ম্লান আলোকে সে একটা মাঠ ছাড়াল ছোট তরফের, তারপর বাগান। কণ্ঠ ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে—একি মর্মন্তুদ আবৃত্তি? জীবন ভেসে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে বিষ দুষ্ট চাপে—এমন সময় কে ভরাবে কুম্ভ, কারই বা হৃদি সরোবরে তলতল ছলছল করছে স্বচ্ছ নীর? আছে চোখের জল, তাতেই ঘট ভরা সম্ভব। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তের অশ্রুবারি,—দিনগত পাপক্ষয়ই এক মাত্র যাদের সম্বল। সেই জলেই এত কাল পূজা হয়েছে, মংগল কলস ভরা হয়েছে অতি সাড়ম্বরে। কিন্তু সে জল যে এখন অনলে রূপান্তরিত হতে চলেছে, উন্মাদিনী তোমার কি খেয়াল নেই?

নির্যাতনের শোকে দুঃখে মাথাটা বিগড়ালে চলবে কেন মধুমালতী? চিত্ত সমাধিস্থ করে পুঙ্খানুপুংখ রূপে ভেবে দেখ, শোকে সান্ত্বনা পাবে, দুঃখে শক্তি পাবে—নিজেকে মনে হবে দুর্বার, অনমনীয়। আজ ও-কবিতা তোমার জন্য নয়, ও-কবিতা নিছক কথা দিয়ে সাজান। বরঞ্চ প্রথম দিন তুমি যে ভংগিতে দাবী করেছিলে খেসারৎ সেই ভংগিমা ও দৃপ্ততাই আজ সত্য।

'ভাই গাংগুলী মধুমালতীর কি হয়েছে?' চুপে চুপে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে কবি।

'এত রাত্রে তুমি কোত্থেকে এলে? কেমন আছ—বসো, বসো। মালতী বোধ হয় আগের চেয়ে ভালই আছে—মনটা একটু ফিরেছে। শুনছ না একমনে আবৃত্তি করছে।'

'নিজের ঘরের রোগ অনেক সময় বিজ্ঞ চিকিৎসকের নজরে পড়ে না।'

'তুমিও পাগল!' তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে কবি।

জগৎটা কি এমনি পাগলাখানা?

না, না, তা হতে পারে না। অজয় বলে, কবি অস্থির হয়ো না। অন্ধকারে বসে সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না।

উনিশ

সুখে পিতা, দুঃখে পিতা মৃত্যু শয্যাতেও পিতা পিতাই। আজ অজয়ের ঘন ঘন নানা স্মৃতি উদয় হচ্ছে মনে। এই বিরাট বিশ্বের কাছে, সে স্মৃতির হয়ত কোনও মূল্যই নেই, কিন্তু অজয়ের কাছে আজ তা অতি মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরে দুয়ারে প্রতিটি ক্ষেত্রে যতীন রায়ের জীবন যুদ্ধের ছাপ, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছড়ান। একখানি ছবি, একখানি গীতা, একখানি বংশ পত্রিকা—যে দিকে তাকাও না কেন, তার ভিতরই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন বিদায়ী পিতা। কোন্‌খানায় তাঁর যৌবনের ছাপ, কোন্‌খানায় বা প্রৌঢ়ত্বের মহিমা জড়ান। ভাবতে গেলে মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। এসব ছেড়েও মানুষকে চলে যেতে হয়। মানুষ আর যাই হক অমর নয়।

বহু ক্ষেত্রেই যতীন রায়কে পরাজিত হতে হয়েছে, জয়টিকা তাঁর ললাটে স্বাক্ষরিত হয়নি কিন্তু তিনি একজন সৈনিক ছিলেন তা তো অস্বীকার করা যায় না। হয়ত তাঁর জন্যই আজ অজয় চক্রবর্তীর দাসানুদাস, তবু

অজয় ভুলতে পারে না, পিতা চিরদিনই পিতা। বিরুদ্ধ অবস্থাকে তিনি যে জয় করতে পারেননি, এ পরাজয়কে পরাজয় বলে বিচার করলে চলবে না। শত পরাজয়ের ভিতর দিয়েই একদিন মুক্তি আসে।

মুক্তি? মুক্তি?

অজয় তো কোন দিন এমন করে শিকল ভাঙার কথা ভেবে দেখেনি। কি মুক্তি সে চায়? দাসত্বের না জড়ত্বের? সে কি একা বিমুক্ত হতে চায়, না সকলের বন্ধন মোচন কামনা করে?

কিসের বাঁধন?

অর্থের ও বৈষম্যের এই যে নিগড় সে ছিন্ন করতে চায়। শুধু একার মুক্তিই সে কামনা করে না, সে মহাজাগতিক জনতার জন্য ভাবে। কাঁদে তাঁর অবচেতন মনে শৃংখলিত পংগপাল।

রসুল ও ডালিমজানকে মনে পড়ে, মধুমালতী, গাংগুলী এবং ব্রজদাস এসে উপস্থিত হয়—সকলের অলক্ষ্যে ও কে এসে রয়েছে মাথা নত করে?

ছোটদি!

তাঁকে সইতে পারে না কবি। সে দ্রুত পিতার কাছে চলে যায়। 'কেমন আছ বাবা?'

একটু বিষণ্ণ হাসি দেখা দেয় যতীন রায়ের মুখে। এক বিন্দু জলও বেরিয়ে আসে চোখের কোটর বেয়ে।

অজয় মুখে কিছু বলে না, তার অন্তরটা দগ্ধে যায়। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, 'আমি একদিন ধুয়ে মুছে দেব তোমার এ পরাজয়ের গ্লানি।'

কয়েকদিন বাদে যতীন রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়ে যায়। অজয় ক্লান্ত পদে বাড়ী ফেরে।

কাজ কর্ম চলে যথা নিয়মে।

ছোটদি বলেন, 'চিন্তা কর না কবি, দেহীর এই তো শেষ গতি। ভগ্নীটিকে পাত্রস্থ কর, তা হলে আরও হাল্কা হবে।'

'এমন ধারা তো হঠাৎ আমি হালকা হতে চাইনি।'

'তুমি বড় ভাবপ্রবণ। বার্ধক্যের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়—বিশেষ করে অর্থহীনের সংসারে। রাগ কর না, ভেবে দেখ, সময় মত সব কিছু তো তোমার করে ওঠা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় শান্তিই কি কাম্য নয় ?'

'এই যদি শান্তি হয় ছোটদি, তবে সে ব্যাখ্যা আমার না শোনাই ভাল। ধীরে ধীরে আমি সবই বুঝতে পারছি।'

আর বেশী কিছু কবি বলতে পারে না। বলার মত ভাষা ভাব ও যুক্তির সে সমন্বয় সাধন করতে পারেনি। তবু ছোটদির মনে এসে ঢেউ লাগল প্রতিঘাতের—আঘাতেরই জবাব। মানুষটা ক্রমান্বয়ে যুক্তিবাদী হচ্ছে। দু একটা যে উত্তর দিচ্ছে তা বেশ কিছুটা অর্থবহ। ওর পিতাকে মন্ত্র শিষ্য করা হয়েছিল অনেক চিন্তা ভাবনা করে, জমি জায়গা ওদের কারসাজি করে রাখা হয়েছিল বহু গবেষণার পর—কিন্তু একি ? যতই যাকে বীতংসে আবদ্ধ করা যাক না কেন, ততই কি তার মস্তিষ্ক ক্ষুরধার হয়ে ওঠে ? এই নির্যাতিতের বুদ্ধির সংগে যদি কোনও বাহুবল সংযুক্ত হয় তবে সর্বনাশ অনিবার্য। সে তো হবে দাবাগ্নির সংগে ঘূর্ণি বাত্যার সংযোগ। কবির সেদিনের প্রতিবাদের কথা মনে পড়ে ছোটদির—মনে পড়ে শেষের কটি চূড়ান্ত ভাষা—চিরক্ষুধার্তের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন কিনা অন্নের চাইতে বড় কিছু নয়।

তবে আপাতত স্বস্তির বিষয় এই যে কবির ভিতর যে বুদ্ধির স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে, তেমনি শক্তির বিকাশ দেখা যাচ্ছে না কামলা কৃষাণদের ভিতর। শক্তির উৎসই তো ওরা।

ছোটদির হঠাৎ মনে পড়ে জোটের মহলের কথা। সংঘ শক্তির এত বড় একটা উদাহরণ সুমুখে থাকতে তিনি কিনা দেখতে পাচ্ছেন না।

মুখ শুকিয়ে যায় ছোটদির। তিনি কত বড় অবিবেচক, সেই একতার মহলেই কবিকে দিতে চাচ্ছেন কিনা নায়েবী।

চুম্বকের কাছে লৌহ! ঘৃতের কাছে অগ্নি!

ছোটদি অত্যন্ত ভাবনায় পড়লেন।

কখন যে কবি চলে গেল, তা তিনি টের পেলেন না। কখন যে দিনের আলো নিভে এল তা তিনি লক্ষ্য করলেন না। যারা যারা মণ্ডপের কাছে এল, তারাই নীরবে ঈশ্বরের কাছে ভক্তি নিবেদন করে ভয়ে ভয়ে সরে গেল। ছোটদি ধ্যানস্থা!

মণ্ডপে দীপ জ্বলে উঠল, গম্ভীর মন্দ্রে শংখ বেজে উঠল। ছোটদি উঠে দাঁড়ালেন। প্রাত্যহিক বৈকালীর ব্যবস্থা তিনিই করে দেন, কিন্তু আজ আর কিছু বললেন না। তিনি মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে কোন দিকে যেন চলে গেলেন।

তিনি ঘাটে গিয়ে তপ্ত তনু জলে ভিজিয়ে বসে রইলেন। প্রকাণ্ড শান বাঁধান ঘাট। নিকটে জন প্রাণী নেই। পুকুর পারে বড় বড় গাছ। বসন্তের বাতাসে ফুল ফুটেছে নানা রকম। কখনও পাওয়া যাচ্ছে উগ্র গন্ধ, কখনও বা মৃদু সুবাস।

পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে যেন চুয়িয়ে চুয়িয়ে পড়তে লাগল পুকুরের স্বচ্ছ জলে, পদ্ম পাতার ওপর, ছোটদির মুখে ও চোখে। তাঁর আর উঠতে ইচ্ছা করছে না জল ছেড়ে। মনের জ্বালার সংগে দেহের জ্বালার কি যেন একটা বিস্ময়কর সংগতি আছে। সেই জ্বালার জ্বলুনিই ঠাণ্ডা করতে চাইছেন আজ ছোটদি। নিষ্কাম জীবনের কামনা শুধু দাহ নির্ব্বাণ।

ওদিকে মণ্ডপের কাছে এসে বাড়ীর আশ-পাশের যত গরীব দুঃখী ভিড় করতে লাগল। চক্রবর্তীর বাপের আমল থেকেই এরা প্রসাদলোভী। চক্রবর্তীর আমলেও এদের মতি গতির তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি—

অন্তত জমিদার বাড়ীর লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর তা হয়ত অভিলাষ নয়। তবে সামান্য কিছু যে পরিবর্তন হয়নি তা বললে মিথ্যা বলা হবে। যারা জরা ও বার্দ্ধক্যে অচল, তারা বংশধরদের মারফৎ ভাণ্ড পাঠিয়ে দেয়। সে ভাণ্ড কিছুটা প্রসাদে, বাকিটা ছোটদির উক্তিতে পূর্ণ হয়। তবু ভাণ্ডের সংখ্যা নিত্য বাড়ে মণ্ডপের দুয়ার ধারে—লক্ষ্মীনারা জিউর এমনই মহিমা।

চারদিকে গুঞ্জন শোনা যায়—মাতৃস্বরূপিনী ছোটদি কই। আজ কি বৈকালী হবে না।

অনেক লোকজন ও আলোর প্রাচুর্য দেখে জনার্দন সাহস করে বেরিয়ে এলেন বর্হিবাটিতে।

'এখনও বৈকালী হচ্ছে না কেন?'

'ছোটদি নেই।' পূজারী জবাব দিল।

'কোথায় গেছে।'

'বলতে পারছিনে।'

একটা বিশ্রী অবস্থা। বৈকালীর নির্দিষ্ট সময় এমন ভাবে নষ্ট করার কোনই মানে হয় না।

অনেক কিছুরই সংসারে তখন তখনই অর্থ করা যায় না, কিন্তু তা ঘটে।

এমন সময় ভিড়ের মধ্যে পাখীকে দেখা যায়—একটা যেন আগুনের হল্কা। নিজে যেন পুড়ছে না, ও একটা কিছু আহুতি চায়।

জনার্দন এগিয়ে গেলেন।

'ও কবে এল পাখীর মা।'

'বড় সমস্যায় পড়েছি মেয়েকে নিয়ে ঠাকুদ্দা, একটু শুনবেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেরেস্তায় চলো এখন সেখানে কেউ নেই। এসো ওকে নিয়ে।'

জনার্দন ওদের নিয়ে চলে গেলেন।

পূজারী ভাবল কি বিশ্রী অবস্থা আজ। সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই বৈকালিক ব্যবস্থা করে নিল। মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলল: এদের সমস্তই ভড়ং—ভক্তি না অশ্বডিম্ব।

সে সংক্ষেপে বৈকালি সমাপ্ত করল, যদৃচ্ছা বিতরণ করল প্রসাদ। তারপর দরজা বন্ধ করে বাড়ী চলে গেল।

জনার্দন বললেন 'তা হলে পাখীর মা, ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে—দুজনে নিয়ে টানাটানি। আমি হলে হয় বুঝি তৃতীয় না চতুর্থ যেন। আমাকে কি ওর পছন্দ হবে? তা এমন কি আমার বয়েস হয়েছে?'

'আপনি আমাদের ঠাকুদ্দা সবই বলতে পারেন। কিন্তু মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমার কলজে শুকিয়ে গেছে।' পাখীর মা উত্তেজনায় বিষাদে অধীর হয়ে, দুদিকের বিশীর্ণপ্রায় স্তন দুটি কোনও রকমে ঢেকে রেখে বিশুষ্ক বক্ষাস্থি চক্রবর্তীকে দেখাল। 'বিশ্বেস না করেন এই দেখেন দেবতা, কি হয়েছে চিন্তায় চিন্তায়।'

চক্রবর্তী একটিবার মাত্র সেদিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন পাখীর মুখের দিকে। তিনি জেঁকে বসেছেন সেরেস্তায়। এটা এক রকম তাঁর বিশ্রম্ভালাপ—এখন কি ভাল লাগে। পাখীর মার মামুলী কথা শুনতে, না ভাল লাগে তার জীর্ণ বক্ষাস্থি দেখতে?

'তারপর পাখী কেমন আছিস। একেবারে তো ডালিম ফলটির মত পেকে ফেটে পড়তে চাইছিস? তোর আবার দুঃখ নাকি, বলে কি তোর মা। ঠাকুদ্দা থাকতে ভাবনা কি—আর না-ই বা গেলি শ্বশুর বাড়ী।'

পাখী জড়োসড়ো হয়ে বসে।

তার মা ভাবে, কি কদর্য উক্তি! এসেছে দায় ঠেকে পরামর্শ চাইতে—ইংগিত করেছে কিনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিধাতা ওরা মান

ইজ্জৎ নিয়ে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে ? মায়ের বুকে মুখ লুকিয়েও মেয়ে সুস্থ থাকতে পারবে না। হায়রে জগৎ !

'আজ উঠি ঠাকুদ্দা, রাত হ'ল অনেকটা।'

'কথাটাই তো ভাল করে শোনা হোল না।' জনার্দনের যেন চমক ভাঙল। 'রাত কি খুব বেশী হয়েছে ? আচ্ছা তবে এসো। কিরে পাখী যাবি, না থাকবি এখানে ? ধোপাবৌ একটা কথা, মেয়ে এসেছে, যদি ঠেকাঝোকা হয় আমার কাছে আগে ভাগে বলো—একটা মানুষের তো খরচা কম নয়, আর কিছু না হলেও রোজ এক সের চাল লাগে। তোমরা আমাদের বাড়ীর কাছের বেড়া, মুখে যা-ই বলি না কেন, অসময়ে তোমাদের দিকে কি না চেয়ে পারি ?'

পাখীর মা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। দৈনিক মাত্র একটি সের তণ্ডুল, তা-ও দেওয়ার বেলা দেবে হয়ত অর্ধসের, সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই যেন কিনে নিতে চাচ্ছে গরীবের মাথা। তবু আসতে হবে, তবু নিতে হবে পরামর্শ—উঃ কি অসহ্য।

ছোটদি যখন ঘাট থেকে ফিরে এলেন, তখন চক্রবর্তী বাড়ী জনশূন্য। তাঁর ভালই লাগছে চারদিকের নিস্তব্ধতা। তিনি সন্ধ্যাহ্নিক সারলেন একা নিরালায়। তারপর ভাবতে বসলেন কবির কথা। কবিকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। কি যে তার অপরাধ, তা-ও তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট নয়, তবু কবির দাঁত ভেঙে দিতে হবে—বুদ্ধির দাঁত। সামান্য প্রতিবাদের জন্যই সে এত দূর অপরাধী হতে পারে না—তাকে অপরাধী করেছে তার প্রতিভার দীপ্তি। ছোটদির চোখ ঝলসে গেছে, হয়ত ঝলসানি পৌছেছে তাঁর অন্তরে পর্যন্ত। তিনি দরিদ্রের বুদ্ধিকে, অর্থ ও সম্মানের প্রাচুর্যে ফেলে করে দেবেন বিকৃত। তবেই না প্রমাণ হবে ছোটদির শ্রেষ্ঠত্ব। সব স্থির করে ছোটদি মনে মনে একটা অমানুষিক আনন্দ উপভোগ করেন।

বাঁশবাগানের শৃগালগুলি রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করে। দূরে একটা পাখী ক্লান্ত স্বরে ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়। প্রবাদ আছে, শাবক জন্মেছে—তার চোখ ফোটাবার জন্য এ সকরুণ চেষ্টা। গলা চিরে রক্ত বের হবে, তবেই কিনা মার চীৎকার থামবে। ছোটদির অন্তর তো কারুর জন্য অমন করুণ ধ্বনিতে ভরে ওঠে না। ব্যাকুলতায় হাহাকার করে ওঠে না মর্মকেন্দ্র। সন্তান নেই, স্বামী নেই, সংসার নেই—অতএব কোথায় তাঁর চোখ ফোটাবার ভাবনা। বরঞ্চ তাঁর কেন জানি চোখ ওপড়াতেই ভাল লাগে—ভাল লাগে সংঘ শক্তিকে বুদ্ধির হাতুড়ি মেরে ভগ্নাংশে পরিণত করতে। তাঁর কি যে লাভালাভ সে বিষয় তিনি অন্ধ, কিন্তু উল্লাস অনুভব করেন ডাকিনীর মত। মনে মনে বলেন, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলব।

কুড়ি

শ্রাদ্ধান্তে কবি দেখে যে মৃত পিতার ভোগের শান্তি হয়েছে বটে, কিন্তু অভাবের অশান্তিটা তার ঘাড়ে চেপে বসেছে ঠিক নাবিক সিন্দাবাদের কাঁধের ভূতটার মত। মালী, পুরোহিত, ধোপা, নাপিত তাদের পাওনার-জন্য অস্থির। দরিদ্র মধ্যবিত্তের পিতা চলে গেছেন, কিন্তু তিনি অনিচ্ছায় রেখে গেছেন বংশধরের জন্য পারলৌকিক কতগুলো ট্যাক্স। জমি নেই, গয়না-গাটি নেই, ব্যাংক ব্যালেঞ্চ নেই—মোটা রকম তবু তিনি বাধ্য হয়ে রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় কীর্তি। অজয় শয়নে জাগরণে ভুলতে পারছেনা বৈতরণী পারাপারের বকেয়া খাজনার কথা। পিতার চাইতেও পীড়াদায়ক হয়েছে দেনা।

ঠিক এমনি সময় আরও দুটি সংবাদ এসে যেন কাটা ঘাতে নুণের ছিটে পড়ে। সংবাদটা শোনায় প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ।

'আশ্চর্য এদের চরিত্র, বাবার কাজটা শেষ হওয়ারও যেন তর সইল না। একজন গেলেন জেলের মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হয়ে, আর একজন কিনা ভাসালেন ময়ূর পংখী! আচ্ছা দেখা যাবে, দায়িত্ব সব আমার একারই নয়, বিষয় সম্পত্তি আমি একাই খাইনে।'

'তুমি একা খাও না বটে, তোমার স্ত্রী কন্যারা খায়—আর বললে বলতে পারবে আইবুড়ো বোনটাকে।'

'কেন তাঁরা বুঝি খান না? এমনি এমনি রোজ জ্বাল হয় পিণ্ডি।'

'ছিঃ ওকথা বলা তোমার সাজে না। আর বিষয় সম্পত্তির যে ভয় দেখাচ্ছ তার ভিতরই বা এমন কি লোভনীয় আছে? তারা আর ফিরে না এলেও তাদের কিছু এসে যায় না।'

'যত দায় হয়েছে কি আমার? যত জ্বালা, যত গ্লানি, যত অপমান...'

'নিশ্চয়।'

মলিনা এসে হাজির হয়। এই নিষ্কর্মা বৃদ্ধের স্বভাব সে জানে। পারেন কেবল আগুন দেখলে আহুতি দিয়ে যোগাযোগটা চরম করে তুলতে। তার বদলে সামান্য কিছু পান তামাকের আপ্যায়ন পেলেই সন্তুষ্ট।

মলিনা অন্তরাল থেকে হাত ইসারায় মেয়েকে ডাকে। সে ছিল পুকুর পারে দুটো ঝুমকোজবা তুলতে ব্যস্ত—ছুটে আসে। বুদ্ধিমতী মেয়ে চট করে অবস্থাটা না জিজ্ঞাসা করেই বুঝে ফেলে। বৃদ্ধের হাতে একটা সাজা পান এনে গুঁজে দিয়ে বলে, 'ওঠেন তো রায়দাদু, ঠানদি নাকি হাঁপাচ্ছে।'

'তাই নাকি, তাই নাকি?' বৃদ্ধের বড় মমতা তাঁর স্ত্রী আবার মারা

না যান তাঁর আগে—তা হলে বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করবে কে মৃত্যুকালে ?

বৃদ্ধ উঠল। হেনা হাসল।

'বাবা একটা ফুল—ঝুমকাজবা এক জোড়া পেড়ে দাও, দুল বানাব। আমাদের পুকুর পারের গাছটা ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে।'

হালকা কথা ! যেন এক ঝল্‌কা বসন্তের বাতাস।

কবির মেঘলা মনটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল তখনই। মেয়ের হাত ধরে সে ফুলের সন্ধানে চলল। এ দায়িত্ব কবির একেবারে নিজস্ব দায়িত্ব। একে কেউ কোনও কালে অস্বীকার করতে পারেনি—কবিও পারল না।

'গাছটা যখন ফুলের ভারে নুয়েই পড়েছে তখন তুমিই ফুল তুললে পারতে—আমাকে আবার টানাটানি কেন মা ?'

'নুয়েছে বলে কি আমি হাতে পাই, কি যে বল তুমি—কত বড় গাছ। দাদুর হাতের নাকি লাগানো ? ঐ যে রাধা ঝুমকোর প্রকাণ্ড লতাটা ওটাও নাকি ?'

'হ্যাঁ মা দাদুর হাতের রোয়া বটে। যতীন রায়ের এমন সার্থক স্মৃতি বোধ হয় আর নেই। এই দুটি গাছ সারা বসন্ত কাল ফুলে ফুলে ভরে থাকে। কিন্তু জীবন যুদ্ধের চাপে এ সবের দিকে ফিরে তাকাবার কবির অবকাশ নেই। অভাবের সময় ফুলের পাপড়ি খেয়ে আর পেট ভরে না, কিংবা ও-দিয়ে ট্যাকসো আদায় হয় না পরলোকের ! তাই আজ আর কবি ততটা আনন্দ পায় না, যতটা তার পাওয়া উচিত।

কুসুমেও কীট ঢুকেছে। এ কীট সত্যিকার কীট নয়, গণতন্ত্রের খোলসে ধনতন্ত্রের দংষ্ট্রা শানান জীব। নির্জীব করছে পাপড়ি-মূলে বসে, হরণ করছে জীবন-সুবাস। তোমার আমার আনন্দের ন্যায্য অধিকার।

কবি অভিভূত হয়ে পড়ে।

'তুমি কি ভাবছ বাবা, ফুল পেড়ে দেবে না ?'

'দেব বই কি, এই নাও—একটা, দুটো, তিনটা, চারটা, কটা চাও।'

হেনা ফুল নিয়ে চলে যায়। কবি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে—আজ বিকাল বেলা তাকে কাজে যোগ দিতে হবেই।

ভাইরা দুজনে যে স্বেচ্ছায় দূরে সরে গেল, এ এক প্রকার মন্দ হল না। কবির খানিকটা বোঝা হাল্কা হল। বাকী রয়েছে ভগ্নীর বিয়ে। তা হলে কবি একেবারে নিশ্চিন্ত। সে কাজটা সারতে হবে তাড়াতাড়ি। তারপর তাকে জীবনের একটা মোড় ঘোরাতে হবে। বদ্ধ জলায় কীটের মত আর বাস করা যায় না। আর টানা যায় না পরের ইচ্ছায় জোয়াল। জীবনের অর্ধেক বৃত্ত তো সে পরিক্রম করে এল। কিন্তু দীপ্তি তো তার ফুটে বের হল না। তবে কি তার তেজ নেই, জ্যোতি নেই, পুরুষকার নেই? আছে—কিন্তু রয়েছে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে। শীতের গাঢ় কুহেলিকায় ঢাকা। এ আবরণ তাকে ভেদ করতেই হবে। মনে মনে কবি বলে, সে বিপ্লবী হবে। কথায় নয়, কাজে। এর পরই শীতের সন্ধ্যা —জীবনসায়াহ্ন। কবিকে স্মরণ রাখতে হবে দিনের শেষে কিছু হয় না। একান্তই মিথ্যা শেষ খেয়ার মদালস তন্দ্রাতুর স্বপ্ন।

বিপ্লবের কোনও পরিপূর্ণ পরিকল্পনা সে তো আজ পর্যন্ত চিন্তা করতে পারেনি—এমন যে ব্রজদাসের জীবনী তাও তো সে লেখা সুরু করতে পারল না, মনে মনে কণ্ডুয়ন করলেই আর বিপ্লব করা যায় না।

কবি কিছুক্ষণ পদচারণ করে।

পারবে, সে বিপ্লব করতে পারবে—তবে তাকে ফসল বুনে তৈরী হয়ে মরসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শস্য না পাকলে কর্তন করা অসম্ভব। তার জীবনে সোনালী ফসলের ফলন অনিবার্য।

মায়া নইলে মানুষ এত সংগ্রাম করতে পারে না, আশা নইলে সে একটি দিনও বাঁচে না, যশ নইলে সে তৃপ্তি পায় না, কবিকে এক সংগে সবগুলো জীবন-সত্য মোহগ্রস্ত করে টানতে থাকে। তার সমুদয় বিরক্তি ও নৈরাশ্য কোথায় যেন উড়ে যায়। সে দস্যু রত্নাকরের মত অনেক

লাঞ্ছনা পেয়ে বুঝেছে, শুধু সংসারের জন্য ভূতের বেগার খেটে লাভ নেই। এখন তাকে রচনা করতে হবে মহাকাব্য—একটি একটি করে দিন তো যায়। যে দিনটি চলে গেল, তা তো হাজার কেঁদেও আর ফিরবে না। অনেক মিথ্যার বেসাতি সে করেছে—কিন্তু উপলব্ধি হয়েছে, একটি মাত্র মহৎ সত্য : ওরে তোর দিন তো চলে যায়!

কবি ভাবতে ভাবতে এতদূর অভিভূত হয়ে পড়ে যে তার আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে ইচ্ছা করে না—ওখানে বসেই সে রূপ দিতে চায় এক টুকরা কচি কলা পাতায় তার মনের অসামান্য আলোড়ন। কোথায় কলম, কোথায়ইবা কালি—অন্তত একটা কাঁটাও তো চাই। লেবু করমজা, খেজুর কাঁটা হলেও তো হত। সে ক্ষ্যাপার মত চাইতে থাকে।

একটি পাইক এসে সংবাদ জানায়, 'এক্ষুণি জেলায় যেতে হবে। চক্রবর্তী বাড়ীর হাঁক এসেছে। চটপট তৈরী হয়ে নাও। ঘাটে নৌকা বাঁধা।'

পাইকটি জানে যে কবি গোলাম, তার আর অস্বীকার করার শক্তি নেই—তাই সে উত্তরের জন্য পর্যন্ত অপেক্ষা না করে চলে যায়।

কবির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত, যদি সে তার সুমুখে না দেখত বিষাদ মাখা মলিনার মুখখানা। মলিনা এসে দাঁড়িয়েছিল, পুকুর থেকে জল নিয়ে তাড়াতাড়ি স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

কবি ভাবে, আর তাকে কেউ যদি না-ও বোঝে, একজন তো বুঝল।

কিন্তু আর একটি মমতাময়ী নারী ঠিক এমনি করে তাকে চিনত—মুখ দেখলে বুঝতে পারত অন্তরের কথা। ঠিক এমনি একটি নারী।

কবি একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে এল। ধীর পাদবিক্ষেপে তার মর্মবেদনা আরো যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠল। আর দেখা সাক্ষাৎ হবে কিনা তা সে জানে না, কিন্তু স্মৃতি রইবে চিরকাল। তার জীবনাকাশে বহুদূরে অপসৃয়মানা একটি তারার স্মৃতি।

দিনের বেলা হলেও এক সময়ে পাত্‌লা মেঘে সূর্যকে ঢেকে ফেলল, একটা ছায়া পড়ল কনকপুরে। ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা গেল জংলি লতার ঝোপে।

তাকে আরও দুটি মানুষ চিনেছিল—ব্রজদাস ও রসুল। নইলে দাস কখনও জীবনী লেখার জন্য অমন অনুরোধ করত না। আর রসুল তো কিছুতেই বিশ্বাস করল না তার স্বীকারোক্তি। রসুল যা বুঝেছিল, তা ভুল নয়—কবি আর যা-ই হক চোর নয়।

এমনি হয়ত কবিকে অখ্যাত অনামা কত লোকে বুঝেছে, চিনেছে—না-ই বা চিনল চক্রবর্তী, না-ইবা বুঝল ছোটদি। কবির দুঃখ করার মত কোনও হেতু নেই—ঘরে রয়েছে দরদী মরমী এক নিত্য সংগিনী। বাইরে রয়েছে ওরই মর্মব্যথী জনতা—স্ত্রী, পুরুষ, জাতিবর্ণের সে আজ হিসেব করে না—দেখে অনেকগুলি ব্যথাতুর মুখ, অনেকগুলো বাহু।

ঐ মুখে বহ্নিমান ভাষা জোগাতে হবে, বাহুতে জোগাতে হবে শক্তি—আর ঐ মূর্খের মত চাহনিগুলো ক্রূর নির্মম করে তুলতে হবে, তবেই না হবে গণশক্তির অভ্যুত্থান। কবি ওদের আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে বল। সেই জ্ঞান ও সেই বিবেক ওদের ভিতর জাগিয়ে তোল। অতিরিক্ত দাহ্য বস্তুর চাপে যাকে ভুল করে ভাবছ দাবাগ্নি তা নিভে যাবে। ভাড়াটে বোমা বন্দুক নিমেষে হবে স্তব্ধ।

বৃদ্ধ ব্রজদাস একখানা কুড়ুল দিয়ে কী পরিচয় রেখে গেছে কনকপুরে তা কি লক্ষ্য কর না? হয়ত ব্রজদাস আর জেলখানা থেকে ফিরবে না, কিন্তু তার পরম কীর্তি ভুললে তো চলবে না। যদি ভুলে যাও পূর্ববর্তীর নিষ্ঠা, যদি ভুলে যাও কীর্তিমানের ইতিকথা, তবে তোমরা মানুষ নয়, পদ লেহনেরই যোগ্য। যোগ্য কেবল পাদুকা প্রহারের।

একখানা হাতিয়ারে যে ঝলক দেখিয়েছে, সহস্রখানা হাতিয়ারে তার

সহস্রগুণ ঝলক দেখান চাই—এছাড়া বাঁচার আর কোনও গত্যন্তর নেই।

রায়দাদু আবার দেখা দেয়।

'হেনা আমায় ফাঁকি দিয়ে তুলে দিল, ঠানদি তার ভালই আছে—আসল খবরটা তো তোমাকে দেওয়া হল না। তোমার ভগ্নীর একটি সম্বন্ধ আছে। ছেলেটির অবস্থা ভাল শুনেছি নাকি বি, এ, পাশ, তোমার কি মত আছে ?'

'কিছু না জেনে শুনে কথা দিই কি করে ? একটু খোঁজ খবর—'

'এই তো নিলে। দিব্যি লম্বা চওড়া, দেখতে সুপুরুষ, আর কি কি জানতে চাও ? বাড়ীর অবস্থা ? খুব ভাল, গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে।'

'কিন্তু রাঙা মূলোও তো হতে পারে।'

'না হে না, ভয় কর না, বি, এ, পাশ সার্টিফিকেট দেখাবে। আমি দেখেছি, যামিনী শীলও দেখেছে।'

'তা হলে তো বুঝব পোড়ো পাঁঠা, মিছামিছিই পাশ করেছে। যে বি, এ, পাশ, সেকি সার্টিফিকেট দেখায় ?'

'কে বললে, সে দেখিয়েছে ? তার বাবা বলেছে। শোন অজয়, সে রেলওয়েতে চাকুরী করে—মাইনে দেড়শ, বেশীও হতে পারে।'

'আমি এখন ব্যস্ত, জেলায় যাব, অন্য সময় এসে হেনার মাকে বলবেন। তার মত হলেই আমার মত, এমন সম্বন্ধটা হাতছাড়া করবেন না।'

বৃদ্ধ চলে গেল, অজয় মনে মনে বলল, যত পাগলের পাগলামী। বৃদ্ধ যে সম্বন্ধের কথা তুলেছে সে ছেলে ভূভারতে নেই। যদিও বা থাকে, সে ছেলের ঘুম হচ্ছে না অজয়ের মত গরীবের বোনকে ঘরে নেওয়ার জন্য। একি ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা ?

একুশ

একটা জরুরী মামলা। কবিকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে। মোকদ্দমাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু সাক্ষীটা একেবারেই মিথ্যা। মামলা সম্বন্ধে কবি কিছুই জানে না। এ রকম সাক্ষীকে সচরাচর বলতে হয় বটতলার সাক্ষী—অর্থাৎ ভাড়াটে। কবি কিন্তু মাইনের চাকর, তাঁর বাধ্যবাধকতা আরও বেশী, আবার সে মাস মাইনের মানুষ নয়—বেতন সে পায় বৎসরান্তর, একুনে বার টাকা বার আনা দুপয়সা। আর যা কিছু ভরসা বে-আইনি আয়।

চক্রবর্তী ও তাঁর ভগ্নী ভেবেই অবাক হন, এতেও কেন কুলায় না অজয়ের। সতীশের মাইনে তো মাত্র আট টাকা। কবির খাঁই খাঁই-ই অধিক!

লিষ্টি অনুসারে কাগজ পত্র গুছিয়ে নিচ্ছে কবি। সে কি একটা দুটো দলিল। প্রয়োজনের অতিরিক্তও আছে দশ বারখানা। সে সব ছাড়া হিসেব আছে নানা রকম। উকিল মুহুরীর বকেয়া পাওনা, নথি-পত্রের নকলের হিসেব, একখানা তোষক, দুটো বালিশও এবার তৈরী করে আনতে পারলে ভাল হয়।

জনার্দনের বৌ কবিকে অন্তরালে ডেকে হাতে গুঁজে দিলেন দুখানা গায় মাখা সাবানের পয়সা, 'একটু ভাল দেখে এনো। আবার কেউ টের না পায়।'

'আচ্ছা।'

ছোটদির শাসনে জনার্দনের স্ত্রীর বাধ্য হয়ে ভুলতে হয়েছে সুগন্ধি সাবান কি বস্তু। মেয়ে বড় হচ্ছে, তাই তাঁর মাঝে মাঝে স্মরণ হয় পিত্রালয়ের কথা—নাকে এসে লাগে স্নিগ্ধ সুরভি। সময় অসময়ে মেয়ে-

টার তো একটু গা হাত পা ধোয়াতেও প্রয়োজন। কবার কথানা তিনি কজনকে দিয়ে আনিয়েছেন, কিন্তু পছন্দ সই হয়নি একখানাও। কনক-পুর এমনি অপদার্থ গ্রাম যে এখানে মেলে না কোনও ছাই। জনার্দনের স্ত্রীর কি-ইবা বয়স তবু তাঁর নিজের কথা থিতিয়ে গেছে। যা কিছু একটু সখ মাত্র মেয়েটার জন্য মাঝে মাঝে উছলে ওঠে।

জনার্দনও সংগে যাবেন। 'কবি সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নায়ে ওঠো। আমি এলাম আর কি।'

বিছানা পত্র নানা সামগ্রীতে নৌকাখানার প্রায় একটা খোপ বোঝাই হওয়ার জোগাড়। বোঝা বলতে কবির কিন্তু কিছুই নেই। শুধু মাত্র ধুতিখানা সম্বল।

নৌকা ছেড়ে দিয়েছে—অনেকখানি পথ এগিয়ে আসার পর তার মনে হয়েছে যে সে তো জামাটা পর্যন্ত আনেনি।

'মাঝি থামাও থামাও নাও।'

জনার্দন জিজ্ঞেসা করেন, 'ব্যাপার কি, ব্রজদাস নাকি?'

'না, আমি জামা ফেলে এসেছি, কাল এজলাসে উঠব কি গায় দিয়ে?'

'ইস্ এজলাসে উঠবেন, নবাবী! আদৌ তোমার কি জামা আছে? না ভেবে চিন্তে নাও থামিয়ে কি হবে?'

কথাটা ঠিক। কবির বোধ হয় সার্ট পাঞ্জাবী কিছু নেই। কত কাল সে গ্রাম ছেড়ে বাইরে কোথায়ও যায় না। ধুতির খোট গায় দিয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। কবি চুপ করে থাকে।

'আমি পূর্বেই বুঝেছি যে বুনো কবির সে সবের বালাই নেই। কেবল সাক্ষী দেওয়ার সময় একটা পেলেই তো হল। আমি দেব 'খন। আর দেব কি, এই এক্ষুণি নিয়ে রাখ—সাক্ষী দিতে যাবে মন খারাপ কর না।' বাক্স খুলে জনার্দন একটা পুরান জামা বের করে দিলেন, পাখীর মার হাতের ধোপ খাওয়ান—মচমচে।

কবি জামাটা হৃষ্টচিত্তে খুলল। ‘এটার যে পিঠটা উড়ে গেছে।’

কবির মন্তব্য শুনে একজন কর্মচারী হাসল। সেও সাক্ষী। নাম উমেশ।

জনার্দন জবাব দিলেন, ‘তাতে কি হয়েছে—গ্রীষ্মকাল কাঁধে ফেলে রেখো।’

কবি জামাটাকে দূরে সরিয়ে রেখে, নৌকার গবাক্ষ পথে সুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল। বড় গাঙে নাও এসে পড়েছে। ভেসে চলেছে একটা কাঠের সিন্দুকের মত। এই সিন্দুকেরই একটা খোপে যেন আবদ্ধ কবি। হাত পা খোলা তবু যাপন করতে হচ্ছে বন্দীজীবন। ইচ্ছামত কোথাও গিয়ে নিশ্বাস ছাড়ার অধিকার নেই। ঐ যে পাখীরা ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে, ঐ যে কাঠ বিড়ালী খেলছে কূলে—ওরা মানুষের তুলনায় কত সুখে এবং শান্তিতে যে আছে! ওদের জামা কাপড়ের সমস্যা নেই, অন্নের জন্যও দৈনন্দিন হাহাকার নেই। আহার্য, চেষ্টা করলেই পাচ্ছে। লজ্জা ঢাকার জন্য ওরা মাথা ঘামায় না। কিন্তু সুসভ্য মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্য যে কত বুদ্ধি বিদ্যায় শান দিয়ে, পুঁথি পুস্তকের পাহাড় রচনা করেছে। ফলে তার লজ্জা তো ঢাকা পড়েইনি, বরঞ্চ নির্লজ্জ হয়েছে অতিরিক্ত। কিন্তু তবু কত অহমিকা, কত চীৎকার!

জামাটার দিকে চেয়ে কবি মনে মনে হাসে। চক্রবর্তী বাড়ার হাতে গলে কনকপুরের বাসিন্দাদের ভাগ্যে যা কিছু পড়েছে, তার কোনটা না ধোপ দোরস্ত চমৎকার! কবির জামা রসুলের জমি এমন কি লক্ষ্মীনারায়ণ-জিউর প্রসাদ।

পরদিন সকাল বেলা জনার্দনের সংগেই সাংগোপাংগোরা উঠল নৌকা ছেড়ে। উকিলের বাসায়ই আগে যেতে হবে।

'কবি তোমাকে কিন্তু একজন শিক্ষক বলে চালাব—পেশা তোমার ছাত্র পড়ান। একটু শিক্ষিতের মত চালচলন দেখিও, মধ্যে মধ্যে দুটো একটা ইংরেজী ফোড়ন কেটো কিন্তু। জেলার একজন জ্ঞানী, ধনী, বিদ্বান ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাচ্ছি আমার যেন মুখ থাকে। তোমার নাম কি জানো ?'

একটু আশ্চর্য হয়ে কবি জনার্দনের মুখের দিকে তাকায়। এককালে তার জীবন কেটেছে সহস্র সৌধমালা শোভিত কলকাতার মত বিশিষ্ট সহরে—আজ সে অনেক কিছু ভুলে যেতে পারে, কিন্তু পৈত্রিক নামটা তো বিস্মৃত হওয়ার নয়। চক্রবর্তীর প্রশ্নের তাৎপর্য কি ?

'এখনও তো কিছু দেখনি, এর মধ্যে হকচকিয়ে গেলে—একেই বলে পাড়াগেঁয়ে ভূত! তোমার আসল নাম যা-ই হক না কেন, হলফ করে বলবে রজত সেন, পিতার নাম ঈশ্বর নকুল সেন, বাড়ী পলতা, পেশা শিক্ষকতা। এই সরল কথা ক-টা আর মনে রাখতে পারবে না ?'

কবির মুখের দিকে চেয়ে জনার্দন একটু চিন্তিত হন।

অপর কর্মচারীটি বলে, 'পারবে হুজুর, উনি অত বোকা নন। এখন চলুন দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

উকিলের বৈঠকখানাটি বেশ পরিপাটি করে সাজান। হ্যাঁ জ্ঞানী এবং ধনীরই বহির্বাটি বটে! কত সব ঝকমকে বই, কত সব মূল্যবান আসবাব—টেবিল, চেয়ার আলমারী, গালিচা, শান্তি নিকেতনী পা-পোষ।

উকিলবাবু বসে আছেন বাতে প্রায় পংগু। পাশে তাঁর বয়স্ক ছেলে উপবিষ্ট। সবে সাব ডেপুটি হয়েছেন। টুরে যাননি, মিথ্যা ডাইরী লিখছিলেন টি, এ বিলের জন্য। গৌরীসেনের টাকা—নিলেই হল একটা কিছু অজুহাত দেখিয়ে। ধুরন্দর পিতা বলে দিচ্ছিলেন, আপাতত

অপরিপক্ক পুত্র তা টুকে নিচ্ছিলেন গভীর শ্রদ্ধার সংগে। কয়েকটা বছর গেলেই ছেলেও ঝানু হবে, পিতার অন্তত এ বিশ্বাস জন্মেছে। পুরাকালে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করত, আর এ-কালে ইউনিভার্সিটি যজ্ঞ করে অসাধারণ ফল পেয়েছেন উকিল বাবু। তাঁর দুঃখের পয়সা সার্থক হয়েছে।

'কবি উনি আমাদের উকিল বাবু, আর তাঁর পাশে যে দেখছ বেশ মহাদেবের মত দেখতে গোলগাল উনি ওঁর ছেলে—একজন হাকিম, এজলাসে বসলেই হুজুর। প্রণাম কর।' জনার্দন কবির জন্য অপেক্ষা না করেই করজোড়ে এগিয়ে আসেন। এবং পিতার চাইতেও যেন একটু পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে পুত্রকে প্রণাম করেন।

ধুরন্ধর উকিল বাবুর জীবন কেটেছে মানুষ চরিয়ে, তিনি বুঝে সুঝেও একটু যেন তৃপ্তির হাসি হাসেন।

'বসুন চক্রবর্তী মশাই, কেমন আছেন, লক্ষ্মীপুরের সংবাদ কি?'

'ওদিকে আর শীগগিরও তো যাইনি, বলতে পারিনে, নতুন কিছু নয়।'

'না গিয়ে ভালই করেছেন—জোটের মহল তার চেয়ে কয়েক নম্বর মামলা ঠুকে দিন, সমস্ত সায়েস্তা হয়ে যাবে দুদিনে। গোমুর্খের আবার একতা! একটু বসুন, আমার হাতের কাজটা শেষ করে নি।'

'এখন বরঞ্চ না বসে, আদালতে দেখা করব—দু'জন সাক্ষী নিয়ে এসেছি, সামান্য কটি কথা ওখানে বসেই শিখিয়ে নিতে পারবেন।'

'না, না অত তুচ্ছ করবেন না, ওদের প্রহ্লাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, সে একটু ট্রেনিং দিয়ে দেবে।' প্রহ্লাদ হেড মুহুরী। মিথ্যা সাক্ষী গড়ে তুলতে ওস্তাদ।

জনার্দন ওদের দুজনকে প্রহ্লাদের জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে এসে হাকিমের গা ঘেঁষে বসে একটু একটু পা নাড়াতে লাগলেন। পিতা পুত্রের মুখে বিলেতি বুলি শুনছেন, আর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন মধ্যে মধ্যে।

কিছুক্ষণ বাদে কবি ও অপর কর্মচারীটি গলদঘর্ম হয়ে ফিয়ে এল। জনার্দন ভাবলেন যে খুব শিক্ষা হল!

'চল চল এখন তবে হোটেলের দিকে চলো।' উমেশ কবিকে ঠেলা দেয়, সে একটু ভোজন বিলাসী!

'গতবারের ফি-টা আমার চক্রবর্তী মশাই?'

'দেব কাছারীতে বসে।'

'এবারেরটা?'

'ঐ এক সংগেই নেবেন'খন। এখন কাছে নেই। প্রণাম হুজুর—আসি উকিল বাবু, দেখা হবে পঞ্চম কোর্টে। আবার যেন মামলার ডাক পড়লে খুঁজে হয়রান না হই।'

পথে নেমে জনার্দন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন দেখলে, সত্যি ভক্তি হয় কিনা? বিধাতা লোক চিনে চিনে রূপ দেন, বিদ্যা দেন যেন শিব সুন্দর পুরুষ। এদের বিচার নির্ভুল না হয়ে যায়।' তদ্‌গত চিত্তে আরও অনেক কথা তিনি বলে গেলেন, কবি কি বুঝল এবং শুনল সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। তাঁর মনে হল লোকটা দেখে শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। আচ্ছা কূপমণ্ডুক! 'তুমি কিছু মনে দুঃখ করো না কবি, তোমাকে এবার থেকে প্রত্যেক বার সংগে করে জেলায় নিয়ে আসব, ভাল জামা কাপড় কিনে দেব—শিক্ষিত লোক, রইলে নিতান্ত ঘরকুনো হয়ে! এ তোমার দোষ নয়, তোমার বুদ্ধির দোষ, গত জন্মের কর্মফলও বলা চলে। দুঃখ করো না কবি, ধীরে ধীরে তুমিও আমার মত হাকিম এবং উকিল বাবুদের নজরে পড়ে যাবে!'

অধীরতায় উদ্বেল হয়ে জনার্দন নিজের অজ্ঞাতে কবিকে শিক্ষিত বলে স্বীকৃতি দিলেন, জানালেন বহুবিধ সমবেদনা।

কবির চোখ ছলছল করে ওঠে! এ যে মর্মান্তিক স্বীকৃতি, মর্মান্তিক

সহানুভূতি! পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম ব্যক্তিও কি এ কথায় না কেঁদে পারে?

কবি কতকটা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওদের সংগে চলে।

বাইশ

একটা সাইকেল রিক্সা সশব্দে ঘণ্টি দিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে।

'এই, এই কবি চাপা পড়লে—এমন গরুর মতও তুমি পথ চলছ! লোকে কি বলবে।' মহা বিরক্তিতে জনার্দন কবিকে টেনে না নিয়ে এসে বরঞ্চ একটু ঠেলে দেন। 'তোমার মত লোকের একটু ঘা খাওয়াই ভাল।'

কবি চকিতে সরে যায়। চকিতে তার মনে পড়ে যানবহুল ধর্মতলা এবং বড় বাজারের কয়েকটা মোড়ের কথা। যত অন্যমনস্ক হয়েই সে এখন পথ চলুক না কেন, সে কিছুতেই চাপা পড়ত না। এ চক্রবর্তীও সাইকেল রিক্‌সা চালকের মিথ্যা দুর্বলতা।

অপমানিত কবি অপ্রতিভ হয়ে এক পাশে এসে দাঁড়ায়। সে এ পরিস্থিতে নিজের স্বপক্ষে কোনও যুক্তি খাড়া করা নিষ্ফল মনে করেই নীরব হয়ে থাকে। চায় বোবা প্রাণীর মত ভাষাহীন চোখে।

'আর ওকে কিছু বলবেন না মশাই যথেষ্ট হয়েছে। যে ধাক্কাটা দিয়েছিলেন আপনি।' একজন পথিক চলে যায়।

অপর একজন বলে, 'আপনার কি হয় ও?'

চক্রবর্তী জবাব দেন, 'হবে আবার কি, কচু।'

'দেখবেন গলা না ধরে আবার—এ কিন্তু জব্বর কচু একেবারে বুনো।'

দ্বিতীয় পথিকও চলে যায় মুচকি হেসে।

কবি কিন্তু হাসেও না, কাঁদেও না, মনে মনে ক্ষমা করে সবাইকে—কত অজ্ঞ আজও জনতা। ধাক্কা যে দিল, তাকে ঠিক ধরেও ধরতে পারল না!

এই সব নানা কারণে ওদের দেরী হয়ে যায় হোটেলে এসে খেতে বসতে।

জনার্দন বলেন 'তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও, এগারটা বাজে।'

কবি দ্রুত হাত চালায়। সংগের লোকটি চোখ টিপ দেয়। বাড়ী পৌঁছা পর্যন্ত অনেক ভাল মন্দ আছে কপালে, এ অবস্থায় যদি পেটটাও না ভরে! টাটকা ইলিশের ঝোলটা এখনও নাকি নামেনি উনান থেকে।

হোটেলওয়ালা একটু অপেক্ষা করতে বলছে। 'হল আর কি! বাবু এমন দেরী কক্ষণো হয় না, নতুন একটা অপদার্থ ঠাকুর এসেছে। একটা ভাল ঠাকুর চাকর উঠে গেলে আর একটা মিলান ভার। পেলেও পাবেন এমনি অকাল কুষ্মাণ্ড।'

জনার্দন বিরক্ত হন।

অপর কর্মচারীটি বলে, 'চুপ কর, রাখ তোমার বক্তৃতে। আগে ইলিশের ঝোল আনতে বলো।'

'সে তো হয়নি এখনও।'

জনার্দন বলেন, 'ওঠো—উঠলে না এখনও উমেশ। তোমাদের কি খাওয়াটাই বড় হল। বেল শুনছ না সাড়ে দশটার!'

কবি আগেই উঠেছিল—অগত্যা উমেশও উঠে আঁচাতে গেল।

হোটেলওয়ালা দেখল যে এখন মাত্র একখানা মাছ খরচ করলেই তিনখানার ফল পাওয়া যায়। সে তীব্র কটাক্ষ করল পরিবেশনকারী

ঠাকুরকে। অমনি জনার্দনের পাতে এসে পড়ল তৈলাক্ত ইলিশের একখানা টুকরো।

জনার্দন প্রশ্ন করলেন, 'আর দুখানা? নইলে ষোল আনা পয়সা দেব না কিন্তু। কাকে ঠকাতে চাও বাপু?'

'আপনি দেখছি নাছোড়বান্দা, দাও দাও হে আর দুখানা।' আবার কটাক্ষ—উর্বশীকে বোধ হয় হার মানিয়ে দিতে পারে। এবার এল গণ্তি মুখে দুখানা, তুলাদণ্ডের মাপে একখানা।

উমেশ এসে কবির পাশে হাঁ করে প্রভুর কীর্ত্তি দেখছিল—জনার্দন হুকুম করলেন, 'তোমরা এগোও, আমি আসছি—যাও, গিয়ে হাজিরা লেখাও।'

উমেশ মনে মনে অভিসম্পাত দিতে দিতে চলে। তার কাছে দিনের চকচকে রোদও যেন মলিন হয়ে আসে। বৃথাই পরিশ্রম, বৃথাই জেলায় এসে গাল মন্দ শোনা। সে কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারে না সুস্বাদু মাছের কথা।

হস্ত দস্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে চক্রবর্ত্তী আদালতে প্রবেশ করলেন। হাকিম এখনও আসেন নি। কবি দ্বিতলের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। উমেশ ঝিমাচ্ছে রেলিংয়ের এক কোণায় ঠেস দিয়ে। লোকজনের তেমন আনাগোনা নেই, পঞ্চম কোর্ট নীরব। পেশ্কার পান চিবুতে চিবুতে কি যেন পড়ছে। আরদালী হাসছে।

জনার্দন নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'আজও কি তারিখ পড়বে নাকি? হয়ত বিপক্ষ কিছু দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া করেছে।'

কবি ভাবে শ্বেত চাকতির কি চক্কোর, চক্রবর্তীকেও ঘোল খাওয়াতে পারে!

এই যে নীরব আসর, হাকিম আসা মাত্র একেবারে সরগরম হয়ে উঠল। উকিল, মক্কেল, মুহুরী, সাক্ষী চারদিক থেকে এসে হাজির।

হুড়োহুড়ি কানাকানি পড়ে গেল সর্বত্র। পেশ্‌কার কেবলই হাত পাতছে টেবিলের তল দিয়ে, আর তার হাত বোঝাই হয়ে উঠছে সিকি, আধুলী, নোটে। হাকিম যেন দেখেও দেখছেন না। তাঁর নটি মেয়ে, পাঁচটি ছেলে—বেতনে সংসার চলে না। কিন্তু সম্মানের চাপে তিনি বাধ্য হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন। অবসর সময়ে কথামৃত পড়েন। প্রথম বয়সে ইচ্ছা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করার, তা যখন সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তিনি মন দিলেন নিত্য গংগা স্নানে। অধুনা আবিষ্কার করলেন যে এও অনিত্য। সংসারের চরম সত্যই হ'ল টেবিলের নীচ দিয়ে হাত পাতা। কিছুক্ষণের জন্য যদি কোনও অলৌকিক মহাপুরুষ তাঁকে পেশ্‌কার করে দিত!

সময় মত সাক্ষীর ডাক সুরু হ'ল। উমেশ কেমন যেন মনমরা হয়ে মামুলী গৎ চালিয়ে গেল। সে একজন নামকরা সাক্ষী—আসলে তার মনটাই আজ ভাল না!

একটু পরেই কবির ডাক পড়ল। 'রজত সেন হাজির?'

জোর করে ঠেলে কবিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এজলাসে।

কবি কাঠ গোড়ায় উঠে হলফ করল, 'আমি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না···।' হলফ করতে করতেই কবি যেন বিগড়ে গেল।

বিপক্ষের উকিল প্রশ্ন করল, 'আপনার নাম?'

'অজয় বসু···'

জনার্দন প্রমাদ গণলেন।

'পেশা?'

'মুহুরীগিরি।'

সর্বনাশ! জনার্দন ছুটে গিয়ে কবিকে টেনে নামালেন কাঠগোড়া থেকে। 'হুজুর পাগল একটা, ও আমার সাক্ষী নয়, আসল সাক্ষী ভেগেছে—ও জোর করে কাঠগোড়ায় উঠেছে, দেখছেন না বল্লে কি?

দূর হও এজলাস থেকে—ভাগো, ভাগো বাইরে চলো, দেখাচ্ছি তোমাকে।' সাক্ষীকে দেখাতে গিয়ে ফরিয়াদীই অদৃশ্য হতে চাইল সকলের আগে। কোর্টের অবমাননা!

'আমার ফি-টা?' উকিলবাবু ছুটে এলেন পিছে পিছে। জনার্দনকে সিঁড়ি পথেই কাবু করলেন। 'আজ আর ছাড়ব না চক্রবর্তী মশাই। দুদিনের পাওনা।'

'সংগে নেই, আর মামলাটাও তো চল না! আগামী বার নেবেন।'

'তা হচ্ছে না।' একজন নবীন হুজুরের প্রবীণ পিতা চক্রবর্তীর কাছা ধরে টান মারলেন—যেন দুঃশাসন ও দ্রৌপদী। সিঁড়ি পথ ঝন ঝন করে উঠল রজত মুদ্রার আর্তরোলে। উকিল, মোক্তার, চাপরাশী, ডাক্তার সকলে অবাক!

জনার্দন চীৎকার করে উঠলেন, 'আহা কি যে বেইজ্জতি করছেন।'

উকিলবাবু সে চীৎকারে কর্ণপাত না করে, যতদূর সম্ভব টাকা পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ঘণ্টাখানেক বাদেই আবার দুজনকে দেখা যায় এক চায়ের দোকানে —নতুন কি কি মামলা ফাঁদা উচিত অবাধ্য প্রজাদের বিরুদ্ধে। লক্ষ্মীপুরের কথাই হয় বেশী। চায়ের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে নিতান্ত স্নেহশীল অভিভাবকের মত উকিলবাবু সাবধান করে দেন, 'আপনি কিন্তু কস্মিন কালেও লক্ষ্মীপুর যাবেন না। খুব হুঁশিয়ার—ওদের কিন্তু আপনার ওপরই আক্রোশ—ব্রজদাসই বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।'

কবি এজলাস থেকে বেরিয়ে একেবারে হনহন করে হেঁটে চলল। মহাফেজখানার একপ্রান্তে এসে সে থামল। স্থানটা বেশ নির্জন। সে বসল একটা গাছ তলায়। ডালে ডালে নবীন কিশলয় বেরিয়েছে। কবিরও মনের শাখায় কি যেন উদ্গত হয়েছে। অমনি সবুজ, অমনি অবুঝ। কবির ভয় করছে জনার্দনের কথা ভাবতে—আবার ভালও লাগছে সে যে

অবাধ্য হয়েছে। আর কত কাল এক ঘেঁয়ে মিথ্যাচারে গা ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

কবি মহা গৌরবে ভাবে : সে বিপ্লব করেছে। যত ক্ষুদ্রই হক, যত তুচ্ছই হক, তার জীবনের এই প্রথমতম সুপ্রভাত। নবারুণের রশ্মিজাল দিগন্ত মেখলায় ছড়িয়ে পড়েছে। তার হৃদয় নেচে নেচে উঠছে। শংকায় ভয়ে তার যে হৃদপিণ্ডের দুরু দুরু উত্থান পতন, ও আর কিছু নয় —ক্রম বিবর্তন—বিপ্লবের জোয়ার আসছে। ক্ষুরধার ভাঁটার অন্তরালে, ক্রান্তি যাত্রার গতি-বার্তা শোনা যাচ্ছে।

এই যে তার পরিবর্তন, এ মহৎ আনন্দেরই সূচনা। সে সাক্ষী করে নিষ্কলংক আকাশকে। মহাফেজখানার দিকে সে তাকায় না। তার মনে হয় সত্যের আবরণে মিথ্যার বহু শতকের দলিল রয়েছে ঐ হাড়গিলে ঘরটার মধ্যে। স্তূপীকৃত জঞ্জাল। একেবারে জোর করে আদায় করা জবানবন্দী—আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে লিখে দিচ্ছি···

কেউ কি কখনও কারুর বিষয় সম্পত্তি সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় লিখে দেয়? দিতে পারে বিনা দ্বিধায় ভদ্রাসন কিংবা অতি মূল্যবান খোরাকীর জমি কবলা? যে দেশে, যে রাষ্ট্রে ব্যক্তি নিরাপত্তার আভাস পর্যন্ত নেই, সেখানেই এ দলিল সম্ভব। এরই রকমফেরা নকল আসল নথিপত্র সংরক্ষিত থাকে ঐখানে।

মহাফেজখানাকে কেন্দ্র করে চার দিকে যে রকমারী হাকিম ও হুকুমের এজলাস, অহেতুক আইনের পুঁথি পুস্তকের নাগপাশ, সে সব দিকেও তাকায় না কবি। কেমন যেন ঘৃণা হয় তার—ও সকলই অধমকে উত্তমের যেন ফাঁকি দেওয়ার ফিকির। বিচার নয়, সর্বত্র চলছে যেন তারই একটা জমকাল প্রহসন। হাকিম যদি হন সার্কাসের ক্লাউন, উকিল মোক্তার তাঁর নৃত্য সহচর—নাচে আইন মাফিক।

খাবি খায় নিঃস্ব আসামী—কারণ সে তো তেমন পয়সা ব্যয়ের যোগ্য নয়।

কবির চোখ মেলে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে একখানা মুখ—আকাশের মত উদার, মায়ের মত স্নেহ সজল। আনন্দ তো একা ভোগ করা যায় না, চাই দরদী বন্ধুজন। কিন্তু সে তো বহু দূরে। যদি পাখীর মত ডানায় ভর করে নীল নভে পাড়ি দেওয়া যেত !

কবির চিত্তে জাগে একখানা শত দলের মত মুখ। আঁধার এসেছে, এসেছে বিচ্ছেদ তবুও তো হারিয়ে যায়নি। তার চিত্ত সরোবরে জ্বল জ্বল করে একটি স্মৃতির পদ্ম ফুল।

সে যখন আদালতের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে চলে এল, তখন সন্ধ্যা হতে আর বড় দেরী নেই। ষ্টীমার ছাড়ারও সময় হয়ে এসেছে। বাড়ী তো ফিরে যেতে হবে। সময় মত ঘাটে না পৌছালে জনার্দন হয়ত তাঁর খোঁজ করবেন না। আজ সে কি কেলেংকারীই না করেছে! তার হাতে তো রাহা খরচ বলতে একটি কপর্দকও নেই। আছে কেবল পিঠ-ওড়া জামাটার পকেটে চক্রবর্তীর স্ত্রীর দেওয়া সাবানের দাম।

ঠিক কথা, খুব সময় মত যা হক মনে পড়ে গেছে—দুখানা সাবান তো দেখে শুনে কিনে নিতে হয়। ভাই বোনের পাল্লায় পড়ে একটা সজীব মানুষ কেমন কুঁকড়ে রয়েছে। তাঁর অনুরোধ কবিকে অবশ্যই রাখতে হবে। সে যে ভুলে যায়নি এই তার পরম সৌভাগ্য। জনার্দনের স্ত্রীর মিনতি-ঘন চোখ দুটি কবির বুকে পাতা মেলে।

চক-বাজারে ঢুকে সাবান কিনতে বেশীক্ষণ লাগে না। তবে পছন্দ মত সাবান কিনতে শেষ পয়সাটিও নিঃশেষ হয়ে যায়। কবির একটু অহেতুক ব্যংগ করতে ইচ্ছা করে—একেই বলে চক্রবর্তী বাড়ীর হিসেব !

চক বাজারের মোড়ে একখানা নতুন মনোহারী দোকান হয়েছে। হাজার রকম জিনিষ বিদ্যুতালোকে ঝলমল করছে। যাওয়ার সময় তো

কবির নজরে এ দোকানখানা পড়েনি। পল্লীগ্রামের লোক একেবারে যেন উপুড় হয়ে পড়েছে।

'বাবু এক এক আনা, হরেক মাল এক এক আনা।'

'এত সস্তা!' কবি ভিড় ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে।

সে একটা লাল ফিতায় হাত দেয়। কি চমৎকার দেখতে! সেও তো বাড়ী ফিরে যাবে। সেও তো একটি মাত্র মেয়ের বাপ। কন্যার জন্য সংগে কিছু নেবে না? হীরা পান্না জহরৎ নয়, এক হাত রঙিন ফিতা শুধু—যার দাম মাত্র এক আনা। তার মেয়ে আবদার করেনি, স্ত্রীও মিনতি জানায়নি, তবু উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে কবির অন্তর। এক হাত রাঙা ফিতা পেলে কত খুশি হবে হেনা। সে খুশির কি তুলনা হয়? মাথায় পরে নেচে নেচে বাড়ী মাৎ করবে কারণ অজয় তো কখনও কোনও সৌখিন বস্তু তাকে কিনে দেয়নি।

এসব দেখে সব চেয়ে বেশী যে আনন্দিত হবে, সে হচ্ছে মলিনা। দাম তো মাত্র এক আনা—কিন্তু কোথায় সে পয়সা?

কত লোকে কত কি কিনল। কবি লুব্ধ নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখল—প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল রাঙা ফিতা। সে মূল্যবান সাবানের বদলে কি তুচ্ছ লাল ফিতা চাইবে—না এই জনতার কাছে হাত পাতবে, 'কে রয়েছ দরদী, ভিক্ষা দাও এক আনা?'

লাল ফিতা আরও বিক্রি হল। কবির অন্তর পুড়ে গেল। আর বুঝি সে নিতে পারল না। পয়সা তো মাত্র এক আনা!

জাহাজের সিটি শোনা গেল। কবি ত্বরায় ষ্টেসনের দিকে ছুটল। ষ্টীমার বোধহয় লঙর তুলেছে।

তেইশ

ঘাটে এসে কবি দেখে যে তার অনুমান মিথ্যা নয়—সর্বনাশ হয়েছে, জাহাজ প্রায় মাঝ নদীতে চলে গেছে। এখন সে কি করবে, কোথায় যাবে? অপরিচিত সহরে পয়সা না হলে তো কোনও কিছু করার উপায় নেই। স্থল পথে তার বাড়ী কমসে কম পনর-ষোল মাইল। বড় নদীও পার হতে হবে গোটা তিনেক। এই দীর্ঘ পথ তাকে পায় হেঁটেই যেতে হবে। ভাল সাক্ষী দিতেই সে এসেছিল চক্রবর্তীর সংগে! গ্রাম্য সাধারণের পক্ষে ক্লেশ হলেও সাক্ষী দেওয়া একটা লাভজনক সাময়িক বৃত্তি—তারা ছোট হলেও সেই দিনটির জন্য অন্তত বড়র কাছে কত যত্ন আদর পায়। কিন্তু কবি পড়ল যেন অকূল সমুদ্রে। এখন উপায় কি?

হেঁটেই যাবে।

উমেশটার বরাতে এত সাধের এক টুকরা মাছ জুটল না—সে নিশ্চয়ই জীবন্মৃত হয়ে বাড়ী ফিরেছে। আর কবি কিনা রইল এখানে এইভাবে পড়ে! চোরে চুরি করে, মুদী ভেজাল দেয়, ঠগী ঠকায়—সকলেরই একটা পরিমাপ আছে, কিন্তু চক্রবর্তী অগাধ জলধি। এত খেটে-খুটে রাত জেগে, প্রাণপাত করে, ইহকাল পরকাল খুইয়েও তাঁর কাছে দরিদ্রের কোন ইনাম বকশিশের আশা নেই। সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে সহরে এসে যদি কেউ কোনও দিন সাক্ষী না দিয়ে থাকে তবে সে এ অমানুষিক পরিশ্রমের মর্ম বুঝবে না।

এক পা দু পা করে কবি এগিয়ে চলে।

সুমুখে একটা ময়দান। বহুলোক জনের হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। ব্যাপার কি? একটা প্যাণ্ডেলের চারদিকে কয়েকটি উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। সভা হবে বলেই কবি অনুমান করে নেয়। এত যুবক

যুবতীর অদ্ভুত সমাবেশ সে তো কোন দিন দেখেনি। বাংলা দেশের মেয়েদের এ হল কি? তারা এত দূর এগিয়েছে! গৃহ কোন ছেড়ে তারা ময়দানে এসে জমায়েৎ হয়েছে। এ যে রীতিমত বিপ্লব। ওদের বক্তব্য কি? ওরা কি চায়? কবি অধীরতা অনুভব করে।

এ সাধারণ সভা নয়। তা যদি হত তবে এত পুলিশের আমদানী হত না। নিশ্চয়ই কোনও অসাধারণ দাবীর আলোড়ন রয়েছে এই জন-সমষ্টির ভূগর্ভে। অগ্ন্যুৎপাতের আশংকায় পুলিশী জুলুম প্রস্তুত। আরও এক দল লাল পাগড়ি এল।

বক্তা এসে এখনও সভা স্থলে পৌছায়নি—কিন্তু তার জন্য একি বিস্ময়-কর অধীরতা! যত তার আসার সময় ঘনিয়ে আসছে ততই যেন সকলে এক সংগে দণ্ডপল গুনছে। হট্টগোল গেছে নিঃতরংগ হয়ে।

কবির দুরু দুরু করছে বুকটা।

কি ভাষায় কথা বলবে, কি বাণী শোনাবে, কোন মহা সত্যের উদ্গাতা সে? কবির মনে প্রশ্ন জাগে নানাবিধ। সে ভিড় ঠেলে মঞ্চের নিকটে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সোজাসুজি এগোন অসম্ভব—সে ভিন্ন পথে ঘুরে চলে। প্রকাণ্ড ময়দানটা বেষ্টন করে আসতে হবে, তবে যদি পুব দিক দিয়ে খানিকটা ভিতরে ঢোকা যায়।

অস্বাভাবিক জন সমাবেশ। কে এই মহৎ ব্যক্তি? দেবতা, না ঋষি, না ঐতিহাসিক পরিব্রাজক? কবি তো এই বৃহৎ জগতের কোনও খোঁজই রাখে না। সত্যই সে কূপমণ্ডুক হয়ে গেছে। পরণে তার একখানি মাত্র মলিন শত ছিন্ন ধুতি, মুখখানা শ্মশ্রু গুম্ফে কদম্ব কেশর। কারুর মুখের দিকে কবি চোখ তুলে তাকায় না। এগিয়ে চলে ভিড় ঠেলে। এক একবার তার কূপমণ্ডুক সুলভ মন বলে, তুই এখানে অশোভন,

বাইরে কোথায়ও চল্ এ ভিড় ত্যাগ করে—কিন্তু তর্ক তোলে অজয়—না, থামো। যা ভেবেছ তা ঠিক নয়, তুমি কূপমণ্ডুক হবে কেন ?

ঐ বুঝি দুরু দুরু দেয়া ডাকছে···

বক্তৃতা মঞ্চ থেকে যেন শোনা যায় গুরু গুরু গর্জন—

ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনি করেছ···

কান খাড়া করে কবি। এ তো ঋষির উদাত্ত বাণী নয়, পরিব্রাজকের ও অভিজ্ঞতাদীপ্ত ভাষণ নয়—এ তো সাধারণ মানুষেরই কম্বুকণ্ঠ—যুগ সন্ধির বলিষ্ঠ চীৎকার। কবি হুড়মুড় করে এগিয়ে যেত চায় মানুষের প্রাচীর ঠেলে।

অকস্মাৎ দলে দলে পুলিশ ছোটে।

চুলের মুঠি ধরে টেনে নামায় বিপ্লবীকে। লাঠি, ব্যাটন চার্জ হয় অবিশ্রাম। দেখতে দেখতে জনতা ছত্রভংগ হয়ে যায় চতুর্দিকে। শত ইচ্ছা থাকলেও কবি আর দেখতে পায় না বক্তার মুখখানা। শুধু মনে মনে সে তার বলিষ্ঠ বাহুর আস্ফালন অনুভব করে—কানে এসে বাজে তার মেঘ গম্ভীর কণ্ঠ :

ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনি করেছ

হাঁটতে হাঁটতে কবি নিজের মনেই পাদপূরণ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। কবিতা, ভূগর্ভে নিহিতা উষ্ণ প্রবাহিনীর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাথা কুটে মরে—

ক্ষুধাকে তোমরা বে আইনি করেছ

তারপর, তারপর···?

অসহ্য দহনে কবি দগ্ধ হতে থাকে। মাঝে মাঝে তার গতি মন্থর হয়ে আসে।

কবির গ্রামের দিকে হেঁটে চলেছে। রাস্তার দুধারে অগুনতি ঝাউ

ঝাড়। কতদূর পর্যন্ত যে এঁকে বেঁকে গেছে তা বলা কঠিন। ক্রম ক্ষীণায়মান একখণ্ড বাঁকা চাঁদের আলোতে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু দূরে একটা বড় নদীর আবছা গতিরেখা প্রতীয়মান হয় স্থির কাব্য লেখার মত। জনহীন নৈশপথ, শব্দহীন আকাশ ও বহুদূর বিসারী প্রান্তর। একা কবি ধ্যান করতে করতে এগিয়ে চলে। ভাব আসে তো ভাষা আসে না। ভাষা আসে তো ব্যথা ব্যক্ত হয় না। তবু কবি প্রাণপণে মন্থন করে চলে তার অনুভূতির উদ্বেল সমুদ্র। অমৃত, কোথায় অমৃত?

কখনও কবি একটু থামে, কখনও বা একটু জোরে চলে। গভীর অন্ধকার ভেদ করে যেমন আলোর জোয়ার আসে, তেমনি কি যেন রহস্য-ঘন একটা জ্যোতি দেখা যাচ্ছে, কি যেন তার অপূর্ব আকৃতি। যে অমৃতের সন্ধান করছে কবি, তারই কি বিচ্ছুরণ, তারই কি দীপ্তি,— ভাবে অর্থে ইংগিতে সমৃদ্ধ?

কিন্তু আলো আবার আঁধারে ঢাকা পড়ছে কেন? কেন ধরা দিয়েও আবার দূরে সরে যাচ্ছে কবিতার নবোন্মেষিত কলিকা? দৃঢ় মনে কবি মন্থন করতে চেষ্টা করে বারবার তার কল্পনা ও অনুভূতির অম্বুধি।

ক্ষুধাকে তোমরা যে আইনি করছে
শিকলে বেঁধেছ রুটির মুঠি···

এই তো, এই তো আসছে দিক চক্রবাল উজ্জ্বল করে অমৃতের আলো। কত ভাব, কত ভাষা, কত যে অর্থবহ ব্যঞ্জনা রয়েছে নিহিত! কবি আরও পংক্তিপূরণ করার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে হাটে, না ছোটে ঠিক বোঝা যায় না। সে উন্মাদ না মহাজ্ঞানী তাও স্থির করা সুকঠিন। সে বাঙ্‌ময় না তন্ময় তাও আজ কেউ বলতে পারে না। সে জীবনের এক চরম সত্যের সন্ধান পেয়েছে এই পর্যন্তই বলা চলে।

পরম পুলকে কবি আবৃত্তি করে—

ক্ষুধাকে তোমরা বে আইনি করেছে
শিকলে বেঁধেছ রুটির মুঠি।
হিংসাকে তোমরা অহিংসার মোড়কে মুড়ে
দেশ দেশান্তরে চালান করছে
ধন্য তোমাদের বুদ্ধি!…

এ কোন মহা কাব্যের সে জন্ম দিল? বিস্ময়ে বেদনায় সে নৈশ পরিবেশকে আবৃত্তিতে উতরোল করে তোলে।

ক্ষুধাকে তোমরা বে আইনি করেছ
শিকলে বেঁধেছ রুটির মুঠি…

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়। ক্রমে শেষ যামের দিকে বাঁকা চাঁদ আরও শেষ হয়ে আসে। কবি গভীর শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করে সেই বিপ্লবীর প্রতি যে দিয়েছে তাকে এই নবতম শ্রেষ্ঠতম বীজমন্ত্র। ক্রৌঞ্চ মিথুনের চাইতেও যেন সে অমর হয়ে থাকবে এই অখ্যাত, অপরিচিত গ্রাম্য বাল্মীকির স্মৃতি পথে।

কবি আবৃত্তি বন্ধ করে না।

অতি পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে সে একটা সম্পূর্ণ কবিতাই মনে মনে রচনা করে ফেলে।

আজকার আনন্দ তার আর প্রাণে ধরে না। এই যে উপবাস, এই যে মর্মন্তুদ ক্লেশ সকলই ধন্য হয়ে যায় পরম তৃপ্তিতে।

সে বাড়ী পৌঁছে দেখে যে অনেকগুলো প্রশ্ন কাতর চোখ তার জন্য অপেক্ষা করছে। কারুর কথার সে জবাব না দিয়ে একখানা কাগজ জোগাড়ের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়।

'মা তোমার কাছে কি আছে—একখানা খাতার পাতা, এই এতটুক?'

হেনা করুণ ভাবে মুখখানা বাঁকায়। সে এত বড় হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগ ছাড়িয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার একখানা খাতা জোটেনি। কুসুম একবার একখানা ছেঁড়া খাতা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তা নিঃশেষ হয়ে গেছে বহুদিন আগে।

অজয় সারা গ্রাম ঘুরে অতি কষ্টে দুখানা কাগজ সংগ্রহ করে। একখানা দিয়ে গাবের আঠার সাহায্যে খাম বানায়, অন্য খানায় কবিতাটি লেখে। তারপর কলকাতার এক ঠিকানায় চিঠিখানা বেয়ারিং ছেড়ে দিয়ে স্নানাহার করে।

প্রাপকের ওপর গভীর আস্থা আছে—তাই সে উত্তরের আশায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। পোষ্টাফিস থেকে যে আসে তার কাছেই জিজ্ঞাসা করে, 'আমার কোনও চিঠি আছে?' প্রতিবার সে একই জবাব পায়—তবু জিজ্ঞাসা করে। তারপর একদিন সব ভুলে যায় কবি। চক্রবর্তী বাড়ীর হিসেব তাকে আবার গিলে ফেলার উপক্রম করে।

চব্বিশ

কবি ভগ্নীর বিবাহের সম্বন্ধটা তুচ্ছ করে ছিল, জানা গেল, সে-টা মোটেই তুচ্ছ করার মত নয়। তারা মেয়ে দেখতে চায়, পছন্দ হলে দাবী দাওয়ার জন্য মোটেই আটকাবে না।

মলিনার উৎসাহেই তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখা হয়ে গেল। বরপক্ষ পছন্দ করেছে। এখন কেবল মাত্র চারহাত এক করে দিলেই সব মিটে যায়। সামান্যই খরচ, কিন্তু অজয়ের কাছে পর্বত প্রমাণ। সকলেই উপদেশ দিল, চক্রবর্তী বাড়ীর দ্বারস্থ হও। পাওনা না থাকলেও কিছু অগ্রিম আন,

শোধ হবে কি করে তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু কাজ চালাবার জন্ত আনতেই হবে কলে-কৌশলে।

যে কৌশলে এই মহৎ জগতটায় চলছে মানী এবং ধনী সজ্জনদের বিলাস ব্যসন, সে জগতে সসম্ভ্রমে সামান্তের বেঁচে থাকার মৌলিক মন্ত্রটুকু কবির কাছে আজও অজ্ঞাত। সে তোষামোদ করতে জানে না। পারে না, মিথ্যা ভনিতায় নিজের অক্ষমতাকে অলৌকিক সক্ষমতার পদমর্যাদায় টেনে তুলতে। 'এই যে ধার নিচ্ছি, আসছে আঁয়াম পড়তে না পড়তেই শোধ করে দেব সুদে আসলে। চাই কি সুদটা এখনই আসল থেকে উস্থল করেও রাখতে পারেন। আজ হক, কাল হ'ক আমাকেই তো দিতে হবে।'

কবি সময় বুঝে ছোটদির কাছে গিয়ে হাজির হয়। উপায় না থাকলে আর করা যায় কি! এমনিতেই তো জনার্দন রেগে টং হয়ে আছেন, তাঁর কাছে তো আর কোনও প্রস্তাব করা সম্ভব হবে না।

সন্ধ্যারতির পর সেই বিশিষ্ট সময় এসেই কবি উপস্থিত হয়। চারিদিক নিরালা, ছোটদি একাকিনী। গাছপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠেছে সপ্তমীর। মণ্ডপের বারান্দা পর্যন্ত এসে জ্যোৎস্না পৌছেছে কিন্তু বড় লঘু, বড় অস্পষ্ট, যেন ভয়ে ভয়ে এসেছে—ছোটদির আদেশ ছাড়া বুঝি নির্ভয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। তবু জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নাই—মধুর মাদকতা থাকবেই।

ছোটদি একাকিনী নন।

ভ্রাতা ভগ্নীতে বাদানুবাদ হচ্ছে। কবি দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

জনার্দন বলছেন, 'এমন অপদার্থ লোককে রেখে লাভ?'

'দাদা জগতে পদার্থ বলে কজনকে ধারণা কর? যার ভিতর তেমন বস্তু আছে, সে কি তোমার অধীনস্থ হয়ে চির জীবন কাটাবে? বড় বড়

মহাজনের গদির কর্মচারী, জমিদারের সেরেস্তার গোমস্তা ও মুহুরীরা একটু বোকা বোকাই হয়। মূর্খ ছাড়া বশেও থাকে না, বিশ্বাসীও হয় না।'

এ কার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে? নিশ্চয় কবির সম্বন্ধে। জেলায় সাক্ষী দেওয়ার জের বলেই মনে হয়। চাকরীটা কি তার এত অল্পতেই যাবে? জনার্দন যখন নিজে বিরোধী তখন ভয় আছে বই কি! তার অপরাধ, সে বলতে গিয়েও বলতে পারল না নির্জলা মিথ্যা কথা। ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় মত অস্বীকার করে বসল তার অন্তর। পেটকে চোখ রাঙিয়ে কে যেন মুখের সাজান বুলি ঘুরিয়ে দিল। উঃ যেন একটা কালবশেখী এসেছিল আচমকা! এজলাসের সে অনুভূতি কবি এখনও বিস্মৃত হতে পারেনি। যত সাময়িকই হক একটা অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিল সে—পরম কল্যাণময় আনন্দ।

কিন্তু এখন উপায়?

ভগ্নীর বিবাহ, স্ত্রী কন্যার ভরণপোষণ. পৈত্রিক শ্রাদ্ধের দেনা—সমস্তই যে হিংস্র হাংগরের মত হাঁ করে রয়েছে? আরও কিছু দিন তাকে এখানে মাথা নত করে থাকতেই হবে। এ আত্মসমর্পণ নয়, নিছক বল সঞ্চয়ের জন্য সন্ধি। সুযোগের আশায় কাল হরণ মাত্র। জীবন-যুদ্ধের এ-ও এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছ, বৃশ্চিকে দংশন করছে, তবু মাথা তুলতে পারছ না—অন্তরীক্ষে বোমারু বিমান। সাময়িক তোমার গতি মন্দীভূত, কিন্তু স্তব্ধ হয়নি প্রগতি। তুমি ধৈর্যশীল, তাই তুমি অপরাজেয়—তুমিই তো উপযুক্ত সৈনিক। আগে নিজে বাঁচ, তবেই তো বাঁচাবে জগতকে। কিছুদিন মাথা নত করে থাকতেই হবে—অপমানে অন্ধকারে, আরও কিছুদিন।...

'বেশ, ও যদি বিশ্বাসীই হয়, তবে ওকে নিয়েই তুই লক্ষ্মীপুর যা। আমাকে আর টেনে লাভ কি? হাইকোর্টে একটা মামলা আছে, আমি কলকাতাই যাই।'

'সম্পত্তি তোমার, আর আমি একা একটা স্ত্রীলোক যাব প্রজার জোট ভাঙতে! তুমি আশ্চর্য কর'ল দাদা। একটা অযৌক্তিক জেদ রক্ষা করতে পারলে না বলে রাগ করলে ছোট্ট ছেলের মত।'

'তোমারও জেদ কম নয় বোন।'

'কেন, কি জেদ দেখলে তুমি?' একটু ম্লান হয়েই ছোটদি যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'আজ পর্যন্ত কোন্ বস্তুটার জন্য আমাকে জেদ করতে দেখেছ? ভাল খাওয়া, ভাল-পরা, আড়ম্বর করে তীর্থে যাওয়া? তোমাদের ষ্টেটের একটি পয়সাও কি আমি ভুলক্রমে ব্যয় করেছি। এ জগতে আমার এমন কি কাম্য আছে যে তার জন্য আমি জেদ করব? বিনা অপরাধে দোষ দিও না ভাই, ঈশ্বর আছেন কিন্তু বিচারের নিক্তি হাতে নিয়ে।'

'আমি সে রকম জেদের কথা বলিনি ছোটদি। বলতে চাইছি যে সম্পত্তি যখন লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর, তখন তোমার যাওয়াই ভাল।'

'বেশ আমি একাই যাব—উদ্ধার হলে এর এক কাণা কড়ি আরও তুমি পাবে না। 'ছেস্' দিয়েও কিন্তু এ মহলে নিট মুনাফা ছটি হাজার টাকা।'

জনার্দনের মনটা একটু টাটিয়ে ওঠে, একটু কেন যথেষ্টই টন টন করে—কিন্তু জীবনটা তাঁর ও টাকার চেয়ে অনেক প্রিয়। তা ছাড়া তাঁর নতুন একটা ঝোঁক হয়েছে—বিনা ঝক্কিতে নাকি পাওয়া যাচ্ছে পাখীকে। বাঘিনীর মত জয়ন্তীকে অন্তরালে পাঠাতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। নাটক জমবে ভাল।

পাখীর এক স্বামী নাকি মামলা জুড়ে দিয়েছে। ওয়ারেণ্ট ও সে বের করেছে। সে পাখীকে কোর্টে হাজির না করে ছাড়বে না। এখন পাখীর উচিত কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকা। এবং তার প্রশস্ত স্থান হচ্ছে কলকাতা। পাখীর পিতা মাতাকে জনার্দন পরামর্শ দিয়েছেন

পাকা। পিতার আদর্শ তিনি এখানে অক্ষুণ্ণই রেখেছেন উপযুক্ত পুত্রের মত। পাখীর মা ও বাবার সন্দেহ হলেও তারা স্বীকৃতি দিয়েছে বাধ্য হয়ে।

'আপনি মনিব ধর্মাবতার—যা করেন তাতেই আমরা রাজী। আমরা মুক্‌খু কখনও তো কলকাতার সহর দেখিনি আর এমন ফ্যাঁসাদেও পড়িনি কোন দিন।' শ্যামা ধোপা একে একে তামাক টেনেছে চার ছিলিম।

পাখীর মা বলেছে, 'আমরা অকুল সমুদ্দুরে পড়েছি। আপনার পায় ধরি দাদাঠাকুর, ওর অল্প বয়েস, ওকে একটু সামলে রাখবেন এমনিতেই ও একটু স্বভাব নাচুনে মেয়ে।'

জনার্দন অমনি চেয়ে দেখেছে পাখীর অপাংগে—কত অল্প হতে পারে ওর বয়স এবং কেমন নাচা ওর পক্ষে সম্ভব। 'কিরে রাজী আছিস তো? ভাবিস কি, কলকাতা যাবি, জাহাজে উঠবি প্রথম, তারপর রেলে, তারপর উড়োজাহাজ।'

পাখী কোনও জবাব দেয়নি। শুধু তার স্বভাব সিদ্ধ বুনো দিঠি নিয়ে চেয়ে রয়েছে। দুটো বড় বড় জংলি চোখে সে এক অব্যক্ত আভা। সে হয়ত এখন পর্যন্ত উপলব্ধিই করতে পারে নি তার বিপদের গুরুত্বটা।

অনেকক্ষণ হয় ছোটদি চুপ করে গেছেন, জনার্দন রয়েছেন মহা অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে ভাই বোনে যে এতটা কথা কাটাকাটি হবে তা পূর্বাহ্নে বুঝতে পারলে হয়ত জনার্দন সংযত হয়ে চলতেন। তাঁর তো লক্ষ্মীপুর যাওয়ায় বিশেষ কোন আপত্তির হেতু নেই। হেতু দাঁড়াল ঐ মূর্খটাকে জেদ করে সংগে নেওয়ার কথায়। আর চিরনির্ভরশীল আশ্রিত ধোপা বংশকে সমূহ বিপদে একটু আশ্রয় দেওয়া জন্ত। আর চতুর্দশ পরগণার মধ্যে নামে, যশে, অর্থে খ্যাত চক্রবর্তী বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে অপমৃত্যুর আশংকা থেকে একটু দূরে রাখার নিমিত্ত। সামান্ত একটা

ভূমিহীন কৃষাণ ব্রজদাস কি করল, লক্ষ্মীপুরে তো বহু সমর্থ ব্রজদাসের বাস।

'তোকে অনুরোধ করি তুই ফের জয়ন্তী—একটা মহলের খাজনা ক বছর না পেলে আমাদের হবে কি!'

'তুমি বিলাসী হয়েছ, তুমি আয়াসী হয়েছ, তোমার মনে কিছু দিন হয় ক্লীবের মত প্রাণ ভয় সঞ্চারিত হয়েছে—বলত সত্য কিনা দাদা? যে অহংকারে অর্থকে তুচ্ছ করে, সে দেবসেবা কিংবা দেবত্র রক্ষার অনুপযুক্ত। অতএব তোমার এবং আমার পথ এক নয়। সন্তান বল, স্বামী বল, সংসার বল আমার এমন কি মোহ আছে, যার জন্য আমার ইহকাল পরকাল খুইয়ে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজিউর বিরাগভাজন হব?' ছোটদি গলা নামিয়ে একটু তীব্রস্বরে বলেন, 'তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সংসারের আবেষ্টনে ফিরে যাও—হাইকোর্ট কর, কলকাতা কর, আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমাকেও লক্ষ্মীপুর যেতে নিষেধ করতে এস না। কে তুমি, ওখানে দাঁড়িয়ে কি শুনছ? এদিকে এস। এক পা নড়লেই পাইকদের ডাকব।'

আবছা আলো থেকে মানুষটা ভীত সন্ত্রস্ত পদে ছোটদির কাছে এগিয়ে এল। 'আমি কবি।'

'কি করছিলে?' ছোটদি প্রশ্ন করলেন।

'আমি…আমি…'

'কি শুনছিলে?'

'আমি এসেছিলাম—'

'সে কথা শুনতে চাইনে। আগে বল কি করছিলে?'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শুনছিলাম।'

'সমস্ত শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'সমস্ত বুঝেছ?'

'যত দুর সম্ভব সবই বোধ করি বুঝেছি।'

'বেশ করেছ! ভাল করেছ! তুমি কি লক্ষ্মীপুর যেতে রাজী আছ?'

'থাকব না কেন? চাকরী করলে আপনাদের আদেশ তো মানতেই হবে। কিন্তু ভগ্নীর বিয়েটার জন্য...'

'কিছু টাকার প্রয়োজন—না? কত টাকা? আমার লক্ষ্মীনারায়ণ-জিউর তহবিল থেকে তোমাকে দান করব—অর্থাৎ তোমার বোনের বিবাহে সাহায্য। প্রতিদানে আমি আর কিছু চাইনে, চাই একজন সত্যনিষ্ঠ ঈশ্বর সেবক, যে মৃত্যুকে ভয় করবে না, কোন বাধাকে বাধা বলে গ্রাহ্য করবে না। কত টাকা চাই?'

'সেও আপনি অনুমান করে দিলেই ভাল হয়।'

'পাঁচ শ টাকায় হবে?'

'এক সংগেই চোখ কপালে ওঠে চক্রবর্তীর ও কবির।

'বুঝলে, সপ্তাহ মধ্যে বিয়ের কাজ শেষ করে আমার সংগে যেতে হবে। তার জন্য আরও বেশী কিছু যদি দরকার হয়, তাও তুমি পাবে।'

দাক্ষিণ্যের একটা গোলক ধাঁধাঁয় কবিকে ঢুকিয়ে দেন ছোটদি জয়ন্তী। কবি চলে যায় রোমাঞ্চিত হয়ে। জনার্দন বাড়ীর দিকে পা বাড়ান কাঁকড়া বিছের দংশনে জর্জরিত হৃদয়ে।

সকলে চলে গেলে ছোটদি ভক্তি আপ্লুত অন্তরে বলেন, 'হে দেবতা, আমি ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা, আমার কোনও কিছুতেই আশক্তি নেই। তোমার অর্থ তোমার জন্যই ব্যয় করছি—কবি আমার কেউ নয়। ব্যয় বাহুল্যে তুমি দোষ ধ'র না প্রভু। আর নারী হয়ে যে কঠিন বোঝা মাথায় তুলে নিলাম, তা তোমার আশীর্বাদে যেন শেষ পর্যন্ত বহন করতে পারি। আমাকে শক্তি দাও, ভক্তি দাও, ধৈর্য দাও অটুট।'

বাড়ী ফিরে যেতে যেতে কবি ভাবে কত মহানুভব ছোটদি! বাইরে রুক্ষ, ভিতরে স্নেহের নির্ঝরিণী। একেই বলে বড়। যখন হাত খুলে

গেল তখন দিতে চাইলেন কিনা অপর্যাপ্ত ভাবে। দয়া, মায়া, দাক্ষিণ্য একই সময় যেন নেমে এল অজস্র ধারায়। হাজার হলেও কবি মানুষ, হঠাৎ দুর্বলতায় পথের নিশানা ভুল করে।

বাড়ী পৌছাতে বেশ খানিকটা রাত হয় তার।

পঁচিশ

দুখানা বড় নৌকা গাঙের জলে ভাসছে। তার মধ্যে যেখানা একটু বেশী বড় সেখানা যাবে লক্ষ্মীপুর। অপরখানা যাবে জনার্দনকে নিয়ে ষ্টেসনের দিকে।

প্রথম ছাড়ল ছোটদের নৌকা। সে নায়ে একমাত্র পুরুষ যাত্রী কবি। তার অনেক পর ছাড়ল জনার্দনের পান্সী। সে পান্সীতে একমাত্র স্ত্রীলোক যাত্রী পাখী। সে বিষণ্ণ চোখ মেলে চেয়ে আছে পারের দিকে—যেখানে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বাবা ও মা। কিন্তু কতক্ষণ চোখের জল সামলে রাখা যায়! এ তো শুধু সাময়িক বিচ্ছেদ ব্যথা নয়—মর্মান্তিক আংশকা রয়েছে গভীরে।

'পাখী ডেকে বলে, কেঁদ না মা, বাড়ী যাও।' বলতে বলতে বুনো পাখীও চোখ মোছে।

দরিদ্র ধোপার মেয়ে, বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে গিয়ে নানা ভাবে যাতনা পেয়েছে বিস্তর। একটা আশ্রয় ধরে স্থির হতে পারেনি কোন দিন। যখনই যা ধরেছে তখনই তা ভেঙেছে অসাম্যের ঝড়ে। উপবাস, অর্ধবাস, প্রায়নগ্নতা, লাঞ্ছনা কত যে গিয়েছে দেহের উপর দিয়ে!

আজ যে নায়ে সে উঠল, সেখানে আহার্যের অভাব নেই, বস্ত্রের

অনটন নেই, আজ্ঞামাত্র শয্যা হয়ত প্রস্তুত হতে পারে দুগ্ধ ফেননিভ কিন্তু জংলি পাখীর মনে হয়, কে যেন দিয়েছে তার স্বাধীন পায়ে শিকলী এঁটে। নভোচারী বিহংগিনীর পাখা দুটোর পালক কে যেন কাটল অতর্কিতে।

জোয়ারের জোরে নৌকা অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। পাখীর মা ও বাবা গাঙের পার ধরে হাঁটতে হাঁটতে এল অনেকখানি পথ। তারপর একটু একটু করে তারা মিলিয়ে গেল নদী তীরের গাছপালার সংগে।

বুনো পাখী এইবার বুঝল যে সে সত্যই এক ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়েছে। খাঁচায় বন্ধ করে তাকে যেন চালান দেওয়া হচ্ছে কোন এক দূর দেশে—যেখানের প্রতিটি বাড়ী, ঘর, রাস্তা তার কাছে অপরিচিত। একটি মানুষকেও যেন আত্মীয় বলে মনে হয় না। এদের সমস্তই স্বতন্ত্র। হাঁটা চলা দৃষ্টির ইংগিতগুলো পর্যন্ত। কল্পনা করতে করতে পাখী হাঁপিয়ে ওঠে। কলকাতার সহর সম্বন্ধে লোকের মুখে সে যা শুনেছে আজ তার ভয়াবহ রূপটাই পাখীর মনে ছবি ফেলে বারবার। ইট কয়লা, লোহালক্কড় আর কুণ্ডলী পাকান ঘন ধোঁয়ার মেঘ। তার ভিতর কিলবিল করছে সহস্র সহস্র মানুষ। কেউ কারুকে চেনে না, কেউ কারুকে ভালবাসে না, কেউ কারুর জন্য সহানুভূতি জানায় না এতটুকু। ভাবতে ভাবতে পাখীর এক এক সময় মনের পাত্রটা খালি হয়ে যায়। ও জলের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

দিন অবসন্ন হয়ে আসে। অদূরাগত সন্ধ্যার আস্বাদ পাওয়া যায় চতুর্দিকে। মাঠ থেকে গরু চরিয়ে রাখাল বালকেরা বাড়ী ফিরছে। বৌঝিরা দ্রুত শেষ করছে ঘাটের কাজ কলরব করে। দক্ষিণা হাওয়া বইছে তার অদৃশ্য পাখনা মেলে। তারই ছোঁয়া কখনও লাগছে জলে, কখনও কূলের অনামা ফুলে পল্লবে। কৃষাণ বাড়ী ফিরে চলল দিনান্তের

কাজ শেষ করে। যে পথিক পার হতে পারল না, সে রইল ব্যাকুল হয়ে গাঙের দিকে চেয়ে।' যদি হঠাৎ কোনও নাও আসে, তাকে অনুগ্রহ করে পার করে দেয় ওপার !

প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে এল। পাখী বলল, 'আমি কিচ্ছু শুনব না, বাড়ী ফিরব ঠাকুদ্দা ?'

'তোর না মাথার ওপর একটা মামলা ঝুলছে ? কত বড় ফৌজদারী কেস্ তা তুই বুঝিবি কি করে ? যারা বুঝেছে, তারা ঠিক হিসেব করেই আমার হাতে সঁপে দিয়েছে। পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় ! এখন কি তোর ইচ্ছা মত তোকে আগুনে ঠেলে দিতে পারি ?'

'না, 'না আমি বাড়ী ফিরে যাব ঠাকুদ্দা, তোমার পা দুখানা ধরি, মাঝিকে হাল ঘুরাতে বল।' পাখী কেমন যেন পাগলের মত চোখ করে চাইতে লাগল। 'আমার ভাল লাগেনা গো এই নায়ে চড়ে যাওয়া।'

'নৌকা আর কতক্ষণ, এরপরই তো জাহাজ, তারপরই তো রেলের বাঁশী···বেলা দশটায় হুস্ করে কলকাতা পৌছাব।'

'আমি কলকাতা যাব না, কনকপুর ফিরব।'

ভৃত্য একটা আলো দিয়ে গেল পান্সী নায়ের খাস কামরায়।

পাখীর আলুথালু বেশ। কেমন একটা ঘর্মাক্ত প্রলোভন ওর দেহের চারদিকে জ্বলছে। চোখে ভয়ার্ত চাহনি। জনার্দন ধীরে ধীরে জানালাগুলো বন্ধ করে দিলেন। 'তুই কি ক্ষেপে গেলি পাখী, তোর মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। নইলে আমার বড্ড বয়ে গিয়েছিল তোর জন্য খরচান্ত হতে।'

'ঠাকুদ্দা আমি কিচ্ছু শুনব না—আমি মার কাছে ফিরে যাব। আপনি যে দোর জানালা বন্ধ করলেন ?'

'তুই যদি ঝাঁপিয়ে পড়িস, অপমৃত্যু হয় তো থানা পুলিশ করবে কে ?'

'না, না আপনি দোর জানালা খুলে দেন। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে

অপমৃত্যু হয়ে মরব না, বাড়ী যাব, মার কাছে যাব ঠাকুদ্দা।' পাখী উঠে একটা জানালা খুলতে চেষ্টা করে। 'ঠাকুদ্দা, আমাকে ছেড়ে দেন।'

বাহিরে মাঝি মাল্লারা স্তব্ধ হয়ে পাখীর কাকুতি মিনতি শোনে। ভৃত্য কর্তব্য কাজে ত্রুটি করে। পাখীর আর্তনাদ ছাপিয়ে জনার্দনের মহা ঔদার্যপূর্ণ যুক্তি ও ব্যাখ্যা শোনা যায় গম্ভীর কণ্ঠের। ছোটদি শুনিয়েছিলেন জনার্দনকে গীতাভাষ্য, জনার্দন এ এক অভিনব ভাষ্য শুনিয়ে দেন মাঝি মাল্লাদের এবং ভৃত্যকে। সত্যই পাখী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে। ওর মাথার ওপর খাঁড়া, তবুও মূর্খের মত কিনা যা তা আবদার করছে।

পাখী যত মরিয়া হয়ে ওঠে জনার্দন ততই ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে হাসেন। তুই একেবারে ক্ষেপে গেলি পাখী—হেঃ হেঃ হেঃ।'

হয়ত মাঝি, মাল্লা ভৃত্য সকলের মনে একটা সন্দেহ ঘনীভূত হতে পারত। কিন্তু তা হয়েও যেন হল না। ওদের মনগুলোকে পয়সার আফিং খাইয়ে একেবারে নেশাগ্রস্ত করে রাখা হয়েছে। পুরুষ পরম্পরায় ওরা ক্রীতদাস বনে গেছে। তাই জনার্দনের কথাই ধরে নেয় সত্য বলে। কিন্তু এ নেশাও ওদের একদিন কাটবে। সে-দিনের নেশাখোর অপাংক্তেয় জাতটা দেখ না আজ জগতের কোন্ স্তরে এসে পৌঁছেছে? কোনও ব্যাখ্যা কোনও ভাষ্যই ওরা আজ শুনছে না। ধরছে জিঘাংসু নেকড়ে বাঘের মত যখন তখন টুটি কামড়ে।

এবার জেলা থেকে ফিরেই এ ঘটনার জাল বুনে ছিলেন চক্রী জনার্দন নিজ হাতে। তিনি সংগোপনে নিশি রক্ষিতকে পাঠিয়েছিলেন শ্যামা ধোপার কাছে।

'নিশি কি জন্যে এত রাত্তিরে? পান চুন কিছুই মজুত নেই আজ।

হাটে সব মাল কাটতি হয়ে গেছে। আজ বিয়ের যোগ ছিল একটা। এখন বরং না দাঁড়িয়ে কাল বিকেল নাগাদ এস।'

'আমি ওসব জিনিষের জন্য তো আসি নি, এসেছি অন্য একটা কারণে।' নিশি দাওয়ার সিঁড়িতে পা দেয়।

অমনি আলোটা নিভিয়ে দেয় পাখীর মা। চুন নেই নাকি? রয়েছে তো এক গামলা। পান নেই বুঝি? আছে দেখি এক ডালা। দেখলে আর রেহাই নেই, নিশ্চয় ধার চাইবে নিশি পোদ্দার।

'আলো নিভালে যে? ভালই করেছ পাখীর মা। কেউ আবার কিচ্ছু না শোনে। সবাই শুয়ে পড়েছ বুঝি, তামাক খাওয়াবে না?'

তাওয়ায় আগুন নেই—দেশলাই জ্বালতে হবে। চুপ করে থাকে স্বামী স্ত্রী।

নিশি রক্ষিত নাছোড়বান্দা! সে অন্ধকারেই দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে, বলে, 'তোমার এক জামাইয়ের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছে এই গত পরশু জেলায়। সাধুই বটে! দিব্বি সজ্জন। ইয়া লম্বা লম্বা জটা, মামলা করেছে পাখীর নামে। ওয়ারেণ্ট—গেরেপতারী পরওনা এল বলে!'

'কে বললে?' স্বামী স্ত্রীতে উঠে বলে। 'শুনলে কার কাছে নিশাকর?' পান এবং চুনের উন্মুক্ত পাত্রের কথা ভুলে গিয়ে ওরা দেশলাই জ্বালে। পাখী ঘুমে অচেতন। 'তামাক খাবে নিশি?'

'নিশ্চয়।'

পূর্ণ এক কল্‌কে তামাক প্রস্তুত হয়।

'চক্রবর্তী মশাই জেলায় গিয়েছিলেন। তিনিই বললেন আমাকে অনেক দুঃখ করে। মেয়েটার বরাতে আর সুখ হল না। দেখতে পরীর মত, কিন্তু কপালটায় ছাই। শুনে অবধি আমি আর আমাতে নেই শ্যামমোহন। বলতে এলাম—এখন সময় থাকতে শরণাপন্ন হও চক্র-

বর্তীর। তিনি ধুরন্ধর ব্যক্তি, একটা কিছু বিহিত করবেনই।' ভাল করে কলকেটি শেষ করে নিশি উঠল। 'আজ তবে আসি।'

'পান নেবে না ?' পাখীর মা জিজ্ঞাসা করল।

'থাকলে দাও।'

'চুন ?'

'আপত্তি নেই ?'

তারপরই পাখী চলল কলকাতা।

ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ল। পাখীর মা ও বাবা কিছুক্ষণ বাদে বাড়ী ফিরে এসে দেখে যে দাওয়ায় সন্ন্যাসী জামাতা বসে।

'কি নির্লজ্জ, তুমি না মামলা করেছ পাখীর নামে ?'

'কে বললে শ্বশুর মশাই ? আমি আবার কাশী চলেছি, তারপর হরিদ্বার। এই দেখুন ভদ্রাসন বিক্রি করে টাকা এনেছি আপনার মেয়েকে দিয়ে দিবেন, সে কোথায় ? থাক্‌গে, তার কাছে আমার কিছু বলার নেই। জয় নিত্যানন্দ !' টাকার থলেটা রেখে সে বেরিয়ে গেল হন হন করে।

পাখীর মা কাতরস্বরে আর্তনাদ করে উঠল। 'মনিব তোমার এই মনে ছিল!'

বড় শাল্মীটার খোপে প্রায় সেই মুহূর্তে পাখীও বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সে প্রতিরোধ করেছে যতদূর সম্ভব।

ছাব্বিশ

মহলে যাতায়াতের জন্য একখানা রঙিন বজরা ছিল সাত মাল্লাই। নৌকা না বলে জাহাজও বলা চলে, বলা চলে ভাসন্ত একখানা বাড়ী। সাজ, সরঞ্জাম, সুবিধা, সুযোগ যা রয়েছে, তা সব সময় বাড়ীতেও পাওয়া অসম্ভব। বজরাখানার সংগে সংগে চলেছে খান পাঁচেক ছিপ—সে-গুলোর গড়ন আগাগোড়া সরু। চলতে পারে হাওয়ার সংগে পাল্লা দিয়ে। ছিপে, ছিপে ঢাল সরকি, রামদা, বন্দুক। পেয়াদা পাইক বরকন্দাজ আছে প্রায় এক শ জন। সাধারণত কোনও কাজেই এরা লাগে না, হঠাৎ যদি একদিন প্রয়োজন হয়, তাই এ গুরুভার বহন করে চলে নিরীহ প্রজারা লক্ষ্মীনারায়ণজিউর আদেশে। বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যে যেমন শান্তি কালীন ফৌজ থাকে এরাও তেমনি তাদেরই একটি কচি-সংস্করণ! তাই বহুকাল থেকে এদের যাবতীয় মাসুল জুগিয়ে আসছে যত দেবোত্তর মহল।

বজরাখানার ছাদের ওপর উন্মুক্ত রোদে বর্ষায় পরিশ্রমী মাঝি-মাল্লা চাকর-বাকর বেশীর ভাগ সময় কাটায় কর্ত্রীপক্ষ যখন নায়ে থাকেন। রান্না-বান্না হয়ত একটু কোথাও আবডাল ক'রে দ্রুত সেরে নিতে হয়। নৌকার চলতি মুখে বড় একটা বিশ্রাম করার সুযোগ পায় না কেউ। উল্‌টা পালটা হাওয়া আছে, ঝড় বৃষ্টি রয়েছে, আরও জোয়ার ভাঁটার সুবিধা অসুবিধার হিসাব আছে নানা রকম।

ছোটদি বসে রয়েছেন একখানা সুসজ্জিত কামরায়। তাঁর দু'খানা গরদ ও চাদর ঝুলছে ফুলের মালার মত একটা হরিণের সমুদ্ধত শিঙে।

দেখলে সত্যি ভয় হয়।

মাঝি-মাল্লাদের নিশ্বাস ফেলার সময় না থাকলেও, জয়ন্তীরাণীর প্রচুর অবকাশ। কাছারী বাড়ীর শালিসি নেই, পূজাপার্বণের ঝামেলা নেই, না আছে মামুলী দাও, দাও, খাই, খাই রব। বেশ ভাল লাগছে ছোটদির নদীবক্ষে ভেসে চলার এই নতুন ছন্দ। তিনি মাঝে মাঝে চেয়ে থাকেন নদী দিগন্তে—কখনও বা বনশ্রী-মেখলা আকাশের দিকে। পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা সারিবদ্ধ শংখচিল বিলীন হয়ে যাচ্ছে লঘু মেঘের মত ধীরে ধীরে। লক্ষ্মীপুরের সমস্যা বহুল কথা আপাতত চাপা পড়েছে নতুন যাত্রার আস্বাদে। নৌকায় ওঠা মাত্রই ছোটদির নাম হয়েছে জয়ন্তীরাণী। এই-ই নাকি কনকপুরের বিগ্রহ-জিউর নির্দেশ। নির্দেশ না ব'লে বরং শুদ্ধ হয় ব'ললে, এই-ই হচ্ছে স্বপ্নাদেশ। চক্রবর্তী বংশের পুরুষ কেউ নায়ে উঠলে, বলা হয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজিউর মোহন্ত।

'সুরেশ!'

'আজ্ঞে রাণী মা?' চাকর এল।

'কবি কোথায়?'

সুরেশ চলে গেল। খানিকবাদে ফিরে এসে বলল যে সে নাকি দলিল পত্র নিয়ে ব্যস্ত।

'রেখে দিতে বল ওসব। বল তাকে আমি ডাকছি। না, না থাক, তুমি যাও, আমি নিজেই যাচ্ছি। পাশের কামরায় তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি···না থাক। পরে দরকার হলে ডাকব'খন।' জয়ন্তীরাণী উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে তিনি কবির কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর উপস্থিতি যতই গোপন করতে চান, তুধে গরদের খসখসানি

ততই মুখর হয়ে ওঠে নিঃশব্দ ঘরখানিতে। হ্যাঁ, নায়েব না হয়েও তার চেয়েও কি যেন নিবিষ্ট মনে পাঠ করছে কবি। দলিলের সমুদ্রতটে এসে যেন কে নির্বাক হয়ে রয়েছে বিস্ময়ে।

রত্নাকরের হৃদিগর্ভের যিনি সমস্ত খবর রাখেন, সেই অভিজ্ঞা জয়ন্তী-রাণী মৃদু মৃদু হাসেন। জ্ঞানে ও সারল্যে কবি এখনও বালক তুল্য! প্রয়োজনে নায়েবীর যূপকাষ্ঠে একে তাঁর বলি দিতে মায়া হয়। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণজিউর যে কি ইচ্ছা তা তো জয়ন্তীরাণী এত কাল সেবা করেও হঠাৎ আজ বলতে পারছেন না!

গরদের খসখসানিতে কবির চমক ভাঙল না। চমক ভাঙল তাঁর দেহের পুষ্প ও চন্দনের গন্ধে। ফুল ও চন্দন কখন তিনি স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু এখনও রয়েছে তার সুবাস তাঁকে জড়িয়ে।

'ছোটদি আপনি?'

'হ্যাঁ কবি।'

'এই দলিলগুলো কি পড়ে দেখেছেন?'

'প্রয়োজন করে না।'

'কেন?' একটু উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয় কবির।

'এতবার ওগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে যে প্রায় আমার মুখস্থ।'

'ও! তবে আপনি সমস্তই জানেন।'

ছোটদি একটু স্মিত মুখে বলেন, 'বিশ্বাস না কর, দাতা গ্রহীতার নাম কর, আমি ভিতরের বয়ান বলে যাই দেখবে একটুও ভুল হবে না, এটুকু স্মরণশক্তি আমার আছে।'

ছোটদির মুখের দিকে চেয়ে কবি আবার শুধু মন্তব্য করল, 'ও!'

এ বিস্ময়, না পুলক, না শ্লেষ কিছুই স্থির করতে পারলেন না জয়ন্তী-

রাণী। সাধারণ একটি মাত্র শব্দ বলেও গ্রহণ করা চলে না। কি যেন তাৎপর্য, কি যেন গভীর ইংগিতের স্পষ্ট আভাস আছে ভিতরে। ছোটদি একটু কেমন যেন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এ তো নাবালক কিংবা মূর্খের উক্তি নয়।

'তুমি কি বলতে চাও কবি?'

কবির মনে এত কথা এসেছে যে তা অল্পে বলা কঠিন। তাই সে জয়ন্তীরাণীর প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চায়। 'এমন কিছু নয়।'

'মিথ্যা কথা।'

কবি চমকে ওঠে সুকঠোর মন্তব্যে।

ছোটদির মর্মে গিয়ে প্রতিফলিত হয় ওর চমকানি—যেন রৌদ্রে বসে কে নাড়া দিয়েছে উজ্জ্বল আর্শিতে। ছোটদিও বিব্রত হন—কিন্তু নিজেকে সংযত করে নেন নিমেষে।

'ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সে কথার অপলাপ করেছ তুমি। আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। তোমার কাছ থেকে অন্তত আমি এ প্রত্যাশা করিনি।'

'ঈশ্বর কে ছোটদি?'

'যিনি এই দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক। তুমি কি তাঁকে আজও চিনতে পারনি? না চেনারও তো কোনও হেতু দেখছিনে। এই দেবোত্তর মহলগুলোর হাজার হাজার প্রজারা কে না চেনে তাঁকে!'

'চিনব না কেন? মুখ্যত আপনি আর গৌণ ভাবে চক্রবর্তী।'

'কি, কি—কি বললে?'

অত্যন্ত প্রজ্বলন্ত মুহূর্ত। বলতে গেলে ঘৃতাহুতি পড়েছে অগ্নিকুণ্ডে। জয়ন্তীরাণী দেখলেন যে একখানি ক্লান্ত হাসি মিলিয়ে গেল কবির মুখে। ঘন বর্ষার মতই ব্যথায় মেদুর। ছোটদি নিজেকে সম্বরণ করলেন কি যেন কি ভেবে।

'ক্ষমা করুন আমি বুঝতে পারিনি এতদিন। আর বুঝলেও এমন করে তলিয়ে বোঝার কখনও সুযোগ আসেনি আমার। জীবনে হয়ত অনেক দলিল পড়েছি, অনেক দলিল নকলও করেছি, কিন্তু তার মর্মার্থ এমনভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি কোন দিন। সুস্থ মনে শান্ত চিত্তে একটি দিনও কি আমার কেটেছে বিগত এই দশ বছরে?'

কবি ভাবাবেশে সোজা হয়ে উঠে বসল। 'এই মানব সভ্যতার সমস্ত ক্রম বিকাশটাই যেন আমার চোখে ধরা পড়ছে। বৈজ্ঞানিক, তত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিক, কিংবা দার্শনিকের জ্ঞান ভাণ্ডারে কি আছে জানি নে, কিন্তু কনকপুরের রায় বংশের দলিলের একটি বাণ্ডিলে আমি দেখতে পাচ্ছি আজ সভ্যতার সম্পূর্ণ স্বরূপটা। তাম্রপত্রে, তুলটের কাগজে, বাদশাহী আমলের অংগুরীর ছাপে, ইংরেজ শাসনের দলিলের ষ্ট্যাম্পের পটভূমিতে সমস্ত জগতটার যেন প্রতিচ্ছবি পড়েছে। ও!'

আবার সেই ব্যঞ্জনা বিদ্ধ একটি মাত্র মর্মঘাতী স্বর—একটি মাত্রবর্ণ! এমন যে জয়ন্তীরাণী তাঁকেও অভিভূত করে ফেলে। কি যে বলবেন, কি যে করবেন তিনিও বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি অপলক চোখে চেয়ে থাকেন।

মহলে যাচ্ছে—গতকাল কবিকে ছোটদি একখানা ভাল কাপড় পরতে দিয়েছেন। ভাল অর্থে গরদও নয় তসরও নয়—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানা ধুতি। শ্মশ্রুগুম্ফ' আগেই সে মুণ্ডন করে এসেছিল। এখন কবি বসে রয়েছে একখানা সুসজ্জিত শয্যায়। নিকটে নানা প্রয়োজনীয় আসবাব ও দলিল পত্র। কেমন চমৎকার জ্ঞানী ও গুণীর মত মানিয়েছে—দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই কি কনকপুরের সেই কবি? সামান্য একটু সাজ সজ্জা ও পরিবেশের পরিবর্তনে একই মানুষ এমনও বদলে যায়! তার জাতি, বর্ণ, বিগত জীবনের অপমান ও লাঞ্ছনা একেবারে ম্লান হয়ে যায়।

'আশ্চর্য !' ছোটদি অস্পষ্টে নিজের মনে মনে আবার বললেন, 'আশ্চর্য !' কবির কানে কিছু পৌছাল না। জয়ন্তীরাণী প্রায় বিগত যৌবনা। তবু তিনি এক নারী এবং বোধহয় এ ক্ষেত্রে যেখানে আর কোনও প্রতিযোগিনী নেই, অনিন্দ্যসুন্দরী। সেই নারী কণ্ঠের বিস্ময় ঘন স্বর বেজে উঠল—আশ্চর্য, কিন্তু কবির কোনও পরিবর্তন হল না। তার সমুদ্রাভিসারী মন হয়ত এখানে নেই। সে হয়ত সন্তরণ করে চলেছে রত্ন মৌক্তিকের সন্ধানে।' দারুণ উৎকণ্ঠা, সে মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের সমস্ত রহস্যটা ধরে ফেলবে নখ দর্পণে।

এবার গরবিনী অহংকারী জয়ন্তীরাণীর মনে হল কবির তুলনায় তিনি কত নিঃস্ব, কত দীনহীন। তাঁর পূজা পার্বণের যুক্তি, গীতা ভাষ্যের অহমিকা আজ তো কোনও কাজেই লাগছে না। মাটির প্রদীপ যেন নিষ্প্রভ হয়ে এল সূর্যোদয়ের সংগে সংগে—কি সুমহান জ্যোতি !

সহসা প্রণতি জানাতে চায় চির অনবনমিতা মহা দর্পিণী জয়ন্তী। কিন্তু উঁচু মাথা কিছুতেই তো নত হতে চায় না। ছোটদি থাকেন লজ্জায় দ্বিধায় নিতান্ত বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে।

'ছোটদি !' বহুদূর থেকে যেন ডাক এল।

'কি কবি ?' অতি নিকট থেকে যেন প্রতিধ্বনির মত জবাব শোনা গেল।

'প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের কথা বলতে পারব না—তখন মানুষ কি অবস্থায় ছিল জানিও না। মানুষ আরও কয়েক বছর পেরিয়ে এল। এল প্রস্তর যুগে। শিখল অস্ত্রের ব্যবহার। ক্রমে গুহাশ্রয়ী মানুষ গোষ্ঠী বদ্ধ হয়ে চলতে লাগল। জীবন যুদ্ধের তাড়নায় শিখল চাষ-আবাদ। ফসল মজুত হতে থাকল গোষ্ঠীপতির গোলায়। আবাদী বনভূমির তিনি হলেন একচ্ছত্র সম্রাট। বণ্টনের ভাগ হয়ত নিয়ম মত পেল, কি পেল না, একটা অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠল পরিশ্রমী মানুষের মনে।'

'এ মানুষগুলো কারা ? এদের কথা তো কোনও শাস্ত্র গ্রন্থে পুরাণে কিংবা রামায়ণ মহাভারতে পড়িনি। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।'

'অতি সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, যদি রাগ না করেন। এ জনসাধারণের কথা—রামায়ণ মহাভারত কিংবা মহাকাব্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়।'

'না, রাগ করব কেন ? যা জানিনে তা আগ্রহ করেই শুনব।'

ঐ ক্ষুব্ধ মানুষগুলো আজকার লক্ষ্মীপুরের চাষী প্রজাদের অতি প্রাচীন বৃদ্ধ প্রপিতামহ। আর আপনার ভাই হচ্ছেন গোষ্ঠিপতিদের কালানুক্রমিক সভ্য শতকের ওয়ারিশ।'

ছোটদির মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন ঝিম ঝিম করে উঠল। কবি ছোবল মারেনি, শুধু একটা তত্ত্ব পরিবেশন করে গেছে, তবু এত বিষ!

'তারপর এল মৌখিক চুক্তির রেওয়াজ। আবার চাষী ঠকল। জমির সীমানা চৌহদ্দি বদলায়। পরিশ্রম করে সারা বছর কিন্তু পেট ভরে না কারুর। ফের অসন্তোষ, ফের সংগ্রামী মনোভাব। তার ফলে আসে তুলটের দলিল, তাম্রশাসন, বিধি বন্ধ হয় স্থিতিশীল আইন। আর ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কৃষক জয়ের আনন্দে জমির সংগে বাড়ী করে, পুকুর কাটে, ফসল তোলে নিজের গোলায়। অবশেষে মৃত্যুকালে ঐ শ্রমলব্ধ স্মৃতিগুলো স্ত্রীপুত্রের হাতে তুলে দিয়ে কোথায় যেন হেসে কেঁদে যাত্রা করে। কিন্তু তবু জটিলতা বাড়ে দিন দিন।'

কবি ছোটদির সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে একবার চেয়ে দেখে। নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আবার বলতে থাকে, 'অপর দিকে গোষ্ঠীপতিরা, সামন্ত যুগে এসে পড়ে! সামন্ত চেতনা নানাবিধ কুটিল মধ্য স্বত্ব সৃষ্টি করে চলে—এই যেমন তালুকদারী, জমিদারী, বাদশাগিরি। জমির কাছাকাছি গেলে তো মাথাই ঠিক রাখা যায় না। হাওলা, কর্ষা, মিরাশিজারা স্বত্ব আছে হাজার রকম—তত্ত্ব হচ্ছে শ্রমশীলকে কেবল দোহেন। খাটব

না খাব—সমাজকে পরিশ্রম করে কিছু দেব না, শুধু বসে বসে শুষে শুষে নেব। নইলে এত খৎ, কবলা, নিলাম, মর্টগেজ, খায়-খালাসী সৃষ্টি হতে পারে ? সত্যিকারেয় যারা জমির মালিক তারা নিঃস্ব ভূমিহীন হয় কূটবুদ্ধির জালে জড়িয়ে পড়ে। ক্রমে জটিলতা বাড়ে দিন দিন। ক্ষীণ হয়ে আসে সমাজের পুষ্টিহীন মেহনতী স্নায়ু।'

ব্যাখ্যা করতে করতে কবির যেন ব্যথায় এবং জ্বালায় মর্ম মথিত করে ছাড়ে। তার সমস্ত মুখমণ্ডলে ছাপ পড়ে অপরিসীম ক্লেশের। জয়ন্তী নির্বাক হয়ে সব লক্ষ্য করেন। তাঁর হাজায় ইচ্ছা হলেও একটা সহানুভূতির কথা উচ্চারণ করতে সাহস হয় না। তিনি যেন এক্ষেত্রে অপাংক্তেয়, কবির কাছে দরদী মন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনধিকারী—ছাড়পত্রের অযোগ্য। তবু প্রশ্ন না করে স্থির থাকতে পারেন না, 'থামলে কেন, বলে যাও—তারপর, তারপর কবি ?'

'আবার ওরা রুখে দাঁড়ায়—কোথায়ও বা স্নায়ুযুদ্ধ চলে। হাতিয়ার রুধিরাক্ত হয় নানা স্থানে। সামন্ত যুগ মালাবদল ক'রে গোত্রান্তরিত হয় শ্রেষ্ঠী সম্রাটের যুগে। বেনিয়ার পালংকে আশ্রয় নিয়ে রাজ কন্যা হাঁফ ছাড়ে।...এবার চলে নির্মম হস্তে জনসমুদ্র মন্থন কিন্তু মুখে বাণিজ্যিক হাসি, কাগজে পত্রে নির্লজ্জ প্রচার—আহা ক্ষুধিতদের আমরা কত ভালবাসি ! সংগে সংগে আসে দুর্ভিক্ষ মহামারী। ছিন্নমূল মানুষ তছনছ হয়ে যায়। যারা বাঁচে তারা এবার বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের জন্য সংঘবদ্ধ হয়। কৃষক হৃত জমির স্বামীত্ব পেতে চায়, শ্রমিক নিতে চায় তার ন্যায্য অধিকার কেড়ে। নিঃস্ব মধ্যবিত্ত সচকিত হয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে পথ দেখায় গণবিপ্লবের ঝড়ে।...সেই ঝড়েরই আভাস দেখছি লক্ষীপুর। ছোটদি ওদের দাবী মেনে নিতেই হবে।'

সাতাশ

এ অগ্নি ঝড়ের বিদ্যুৎ-বিকাশ ছোটদির চোখেও ধরা পড়েছিল। তিনি ঠিক কবির মত না দেখলেও 'যতটা দেখে সেদিন জনার্দনকে সতর্ক করেছিলেন' ততটাও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু কবির কথায় তিনি বুঝলেন যে ঝড় একেবারে দুর্নিবার হয়ে দ্বার প্রান্তেই এসেছে। প্রথম কবি যখন বলতে আরম্ভ করল তখন এ প্রসংগ তাঁর কাছে অবোধ্য ঠেকলেও, শেষ পর্যন্ত একেবারে না হক, প্রায় পৌনে ষোলআনী প্রাঞ্জল হয়ে গেছে। মনে মনে তিনি রীতিমত শংকিত হয়েছেন। সত্যই কি প্রলয় এল? জেলে জোলা মাঝি চাষা ভূষা—যত অশিক্ষিত, কুৎসিৎ, কদাকার মানুষগুলোর হাড়ে কি বজ্র আছে লুকিয়ে? বিশ্বাস করতেও মন সরে না, আবার অবিশ্বাসের যুক্তিও সুদৃঢ়ভাবে দানা বাঁধতে পারে না। বুদ্ধিমতী জয়ন্তী দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঘূর্ণি দোলায় দুলতে থাকেন দ্রুত। তাঁর মাথা ঘুলিয়ে ওঠে।

তিনি কবির সুমুখ থেকে না বলে-কয়ে নিজের কামরায় চলে যান। একখানা অতি কৃষ্ণ মেঘের ছায়া পড়ে জলে। মনে হয় দিনটাই বুঝি রাত হয়ে যাবে। গাঙের কালো জল আরও কালো হয়ে এল। অকালে ঝড় আসবে নাকি?···

খানিক বাদেই বাইরের ঝড়ের কথা ভুলে তাঁর মনের তরংগ সামলাতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। জনতা, বিপ্লব কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয় কিন্তু সমস্তটা একেবারে অসহনীয়। বুকটা যেন ভেঙে-চুরে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে এতদিনের সমাজ, এতদিনের ক্রিয়াকাণ্ড, দোল দুর্গোৎসব, দরি নারায়ণের সেবা, অতিথির আপ্যায়ন—সমস্তই কি উঠে যাবে? ভূ ব্যবস্থাকে জড়িয়ে যে আবহমান কাল ধরে এই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ শিব

মেলেছে ! যেদিন শুভ পুণ্যাহ হয় সেদিন সমস্ত পরগনার লোকগুলো যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউকে দর্শনী দিতে ভেঙে পড়ে। এই ভক্তি ও নিবিড় বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত ! এ হতে দেওয়া যায় না।

ছোটদি আবার উঠে দাঁড়ালেন। কবির কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলেন। 'কবি !'

'বলুন ছোটদি।'

'তবে কি ধর্ম থাকবে না—এই সনাতন ক্রিয়া কর্ম ? ভূমি যদি না থাকে আয়ই যদি লোপ পায়, তবে দিন দিন ধর্মও তো লোপ পাবে নিশ্চয় ?'

'না। সত্যই হচ্ছে ধর্ম এবং তা শাশ্বত। এর ক্ষয় ক্ষতি নেই।'

'তোমার তত্ত্ব কথা বুঝলাম না। জটিল না করে সরলভাবে যদি কিছু বলতে পার তবে বল। জীবনভর যা বুঝলাম, যা শাস্ত্র পুরাণে পড়লাম, তেমনি যদি তোমার কথা জট পাকান হয় তবে আর ছুটে এসে লাভ হল কি ?'

'মানুষের, মানুষের মত বেঁচে থাকাটাই আসল ধর্ম। তার চরম কর্ম হচ্ছে দেহের ও মনের খোরাকী সংগ্রহ করা। দেব সেবা, ভূমি ব্যবস্থা যদি সে সংগ্রহের অন্তরায় হয় তবে তা কি ত্যাগ করা উচিত নয় ? যখনই যা জন কল্যাণের পরিপূরক না হবে, তখনই তা সংগ্রামী মানুষ নির্মম ভাবে কেটে বাদ দিয়ে দেবে।'

'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউর বাৎসরিক পূজার ব্যয়, ভেট বেগারই পর্যন্ত ?'

কবি গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়, 'সব জেনে শুনেও একি অন্ধের মত প্রশ্ন আপনার ?'

গাঙের জলে সেই যে কালো ছায়াটা পড়েছিল তা এখনও বিলীন হয়ে যায়নি। বজরাখানাও থামেনি। বহুদূর দূরান্তের তট অরণ্যের ঘন শ্যামলতাও যেন থমথম করছে। কবি শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে

চেয়ে রয়েছে। ছোটদি রয়েছেন তার মুখের দিকে চেয়ে। কবির যে দৃষ্টি বাইরে নিবদ্ধ কেমন করে সেই দৃষ্টি যেন ছোটদির অন্তরের গম্ভীর ব্যথার কাহিনীগুলি অন্বয় ব্যাখ্যা সমেত পাঠ করতে লাগল।

ঝড় না এসে বাইরে এক পশলা ঘন বৃষ্টি নামল। ছোটদি উঠে জানালা কপাট বন্ধ করতে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন যে ঘরটা বেশ অন্ধকার হয়েছে। গুহাবাসী এক ভাবমুগ্ধ সন্ন্যাসীর মত তখনও কবি বসে রয়েছে। ছোটদি চকিতে কি যেন চিন্তা করে নিলেন। তারপর একখানা আসন টেনে এনে কবির একেবারে মুখোমুখি বসলেন। একি! কবির চোখে জল কেন? বেশী নয় কেবল মাত্র সজল হয়েছে চোখের পাতা দুটি। শুধু সজলতাও নয়, দুটি বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে এল চোকের কোণায়। আধো আলো, আধো অন্ধকারে এ যে কি রূপ তা ছোটদি বর্ণনা করে বোঝাতে পারেন না। সারাজীবন ক্রুরতা, দৃঢ়তা এবং অসহিষ্ণুতারই চর্চা করে এসেছেন। এখন তিনি কি করে ব্যাখ্যা করবেন এ তন্ময়তা ও দরদে দ্রবীভূত অন্তরের কথা? ব্যঞ্জনা বিদ্ধ যে স্বরবর্ণটি বারবার অসীম অনুভূতিতে উচ্চারণ করেছিল কবি, আবার কি সেই শরেরই আঘাত লাগল তার মর্মে? ও তো অশ্রু নয়, মধু। কাঁদুক কবি, সে যা বলার তা বলুক। ছোটদির জীবনে হয়ত এ সুদিন এই প্রথম ও এই শেষ। তিনি অঞ্চলে ও মধু মুছে নিতে পারেন, কিন্তু মুছবেন না। কোনও পুরুষই তো তাঁর মুখোমুখি বসে আজ পর্যন্ত একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেলেনি। এ কি অপূর্ব আস্বাদ!

'ছোটদি, জনতা ক্ষুধার্ত। সে আইন. আদালত ডিগ্রি, নিলাম বোঝে না—অন্ন চায়, চায় বস্ত্র। এমনি চায় না, চায় পরিশ্রমের বিনিময়ে।'

জয়ন্তী একটু দমে যান। তিনি তাঁর একার কথাই শুনতে চেয়ে-

ছিলেন। এ পরিবেশে অন্তত অন্যের কথা কেমন যেন কটু ও বিস্বাদ। কিন্তু তিনি বাধা দিতে পারলেন না। প্রেম না হক তবু তো পুরুষের উক্তি!

কবি আবার বলতে আরম্ভ করল, 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর যে মানুষ কয়েক হাজার বছর এগিয়ে এল, আমার মনে হয় কি জানেন, তখন সে হয়ত প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল মাকে। মা ছিল স্তন্যদায়িনী, মা ছিল আহার সংরক্ষণ কারিণী। ভাবলে আমার দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে, সে মার স্বরূপ আজ পর্যন্তও আমরা দেখতে পাই দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত জনপদে। ক্ষুৎ পিপাসায় হা-অন্ন হা-অন্ন করে মা টলতে টলতে চলছে, কিন্তু বিশুষ্ক প্রায় দুধের বোঁটাটি ঠিক সন্তানের মুখে ধরে রয়েছে।' কবির বাষ্পাকুল কণ্ঠের স্বর কিছুক্ষণের জন্য আর ভাষা উচ্চারণ করতে পারল না। সে থামল। তার ঠোঁট দুখানা কাঁপতে লাগল অত্যন্ত ক্লেশে।

কবির ঘাম হচ্ছে। ছোটদি একখানা হাত পাখা নিয়ে এলেন। বাইরে তখনও বর্ষা ক্ষান্ত হয়নি। ছোটদি একটা জানালা খুলে দেখলেন যে নদীর জল, আকাশ, তটচিহ্ন সব অস্পষ্ট। ঠিক তাঁর মনের যাবতীয় চিন্তার মত ঘুলিয়ে গেছে। বৃষ্টি আসতে পারে, তিনি ফের জানালা বন্ধ করে দিলেন।

'সেই মাকে একদিন পিতা এসে দৈহিক প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে পিছনে ঠেলে দিল। পশুপালনে তার স্বাভাবিক অপটুতাই পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। জানিনে কোন অশ্রুমতী স্বাধিকারচ্যুতা মা প্রথম অন্তরালে চলে গেল, কিন্তু তার চোখের জল আজও ঘোচেনি সমাজ থেকে। শৃঙ্খলিতা জননীর দীর্ঘ শ্বাস আজও শোনা যায় আকাশে বাতাসে মুহুর্মুহু।...তারপর যা বলছিলাম সেই কথাতেই ফিরে যাই। পশু সম্পদের মালিকানা স্বত্ব পিতার অবর্তমানে কে পাবে? সেই তর্ক থেকে ওয়ারিশ সূত্রের আবির্ভাব। সন্তান হল নিরংকুশ দাবীদার। মা রইল

অন্তরালেই। ছায়া চিত্রের মত আবার শত শত বছর পেরিয়ে গেল। পশু-সম্পদই বুঝি আজকের এই পাপ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করল। অগণিত নর ও নারীর অভিশাপ নিয়ে জন্মাল নবজাতক—গোষ্ঠীপতি। যৌবনে মহীপতি মৃত্যুকালে জরাগ্রস্ত শ্রেষ্ঠী রাজ।'

কবি একটু চুপ করে ফের বলতে লাগল, 'এ কথাও আমার ঠিক বলার বিষয় নয়। বলতে চাইছিলাম সেই অন্তরালবর্তিনী লাঞ্ছিতা মার কথা। যে মার প্রতিবিম্ব রয়েছে আপনাতে, কুসুমে, ডালিমজানে, মধুমালতীতে।'

'বল কি কবি আমাতে!' ছোটদি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকেন। তাঁর চোখ যেন কেমন করে ওঠে।

'হ্যাঁ আপনার মুখেই তো দলিতা লাঞ্ছিতা মার প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি আমি। আপনি সান্নিপাত নন, বিকার। আপনি চক্রবর্তী বংশের এই বিশাল জমিদারীর ওয়ারিশ নন, দুবেলা মাত্র দুটি অন্নের দাবীদার। আপনার কোন স্বত্বই নেই, তবু যাবতীয় অসত্যই আপনাকে দিয়ে করান হচ্ছে।'

'কি বললে তুমি, আমাকে দিয়ে—'

অতি তৎপরতার সংগে কবি জবাব দেয়—এখন আর তার কণ্ঠে ভাবালুতা নেই, বরঞ্চ মুখে চোখে দেখা যায় সুকঠোর দৃঢ়তা। 'হ্যাঁ আপনাকে দিয়ে। একবার নিজের জীবনটা ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখুন, মহা ঐশ্বর্যশালী পিতা আপনাকে কি দিলেন? অকাল বৈধব্য।'

যাতনায় অস্থির হয়ে জয়ন্তীরাণী জবাব দেন, 'উঃ তুমি জ্ঞানী হয়ে আজ এই কথা বলছ! আমি যে সইতে পারছিনে। স্বর্গত পিতাকে অহেতুক দোষারোপ কর না। অকাল বৈধব্য আমার ভাগ্য।'

'নিশ্চয় নয়। দশ বছরের একটা মেয়ে ভাগ্যের কি বোঝে? তাকে

গৌরীদান করা হয়েছে এক বৃদ্ধের সংগে। কৌলীণ্যের খড়্গের একটি আঘাত—ব্যস।'

'সেজন্য আমার পিতাকে টানছ কেন? নিয়তিই যে এখানে প্রধান।'

'কিছুতেই নয়—তা হতে পারে না। আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি পিতা অতিরিক্ত বুঝতেন, যা সাধারণের চিন্তার বাইরে। জনার্দনের কৈশোরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এ পুত্রকে দিয়ে এ বিশাল সম্পত্তি রক্ষা হওয়া অসম্ভব। তাই তিনি আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কৌলীণ্য ও দেবসেবার খাঁড়ায় কেটে তীক্ষ্ণতম করে রেখে গেছেন। বাধ্য হয়ে এখানে একটা কঠিন উদাহরণ দিতে হচ্ছে। বাদশা হারেমের কথা শুনেছেন, যেখানের কাহিনী ও গল্পের খোশবু সাহিত্যে, কাব্যে অমর হয়ে আছে—অতি বীর্যবান তাতার পুরুষদের অকর্মণ্য করে রূপসী বেগমদের মর্যাদা ও আবরু রক্ষার ভার দেওয়া হত?'

'চুপ কর কবি, চুপ কর। নইলে তোমার জিভ টেনে…'আর কথা শেষ করা হল না। জয়ন্তরাণী বুঝি সংজ্ঞা হারালেন আচম্বিতে।

আক্রোশ

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। বৃষ্টি একটু থেমেছে, কিন্তু আকাশে মেঘের থমথমানি কমেনি। এখানে নদীর পারে ছোট একটা বন্দর আছে। দুতিন খানা মাত্র দোকান। সপ্তাহে একদিন শুধু হাট মেলে। নিকটে মনুষ্য বসতি খুব ছাড়া ছাড়া। কেবল নদী, খাল, জংগলাচর আর মাঝে মাঝে শোনা যায় দূরাগত সমুদ্র গর্জন। সময় সময় লোমহর্ষণ ডাকাতি রাহাজনি এ অঞ্চলে সংঘটিত হয়। জয়ন্তরাণীর অবশ্য সে ভয় নেই। তবু মাঝিরা নৌকা থামাল। ছিপ কখানাও বজরার পাশে এসে ভিড়ল। দুটো নদী এখান থেকে দুদিকে চলে গেছে। একটা দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার

মধ্যেই লক্ষ্মীপুর পৌঁছা সম্ভব। অন্যটা দিয়ে তিন দিনে। প্রথমটার আশংকা হচ্ছে দিক চিহ্নহীন শুধু জল—তাতে আকাশে কালো মেঘের ভার। যখন তখন দমকা ফোঁফানি ছাড়তে পারে। এমনিতেই নদীর জল থরথর করে, হাওয়া এলে তো কথাই নেই।

ভৃত্য সুরেশ ছোটদির কক্ষে প্রবেশ করল। জয়ন্তী সেখানে নেই। তিনি নিশ্চয়ই কবির কামরায় গেছেন। সুরেশ ধীর পদে এগিয়ে গেল। রাণী মা!'

'কে সুরেশ? একগ্লাস জল দিতে পার?'

সুরেশ একটু মুসকিলে পড়ল। যদিও সে কায়স্থ তবু তার হাতের জল জয়ন্তীরাণী খান না। 'আপনি কি'

শ্লথকণ্ঠে অনুযোগ ঢেলে জয়ন্তীরাণী বললেন, 'কথা না বাড়িয়ে নিয়ে এস। পারলে একটা আলো দাও। জানালাগুলোও কি আমায় উঠে খুলে নিতে হবে?'

'না রাণী মা, আমি এক্ষুণি সব করছি।'

'উঃ কি অন্ধকার! রাত হল না কি?'

'না—তবে সন্ধ্যে হয়েছে।' সুরেশ চলে গেল।

একটু পরেই সে কালো পাথরের গ্লাসে জল ও একটা আলো নিয়ে এল। জল এবং আলো যথাস্থানে নামিয়ে রেখে সে জানালাগুলো খুলতে গেল।

আতংক বিহ্বল নেত্রে ছোটদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবি কোথায় সুরেশ?'

'হয়ত কূলে পায়চারি করছে, ডাকব?'

'না। দরকার নেই।' জয়ন্তী রাণীর আকণ্ঠ পিপাসা থাকলেও তিনি জল খেলেন না। একটু চোখে মুখে ছিটে দিয়ে বোধ হয় সন্ধ্যা করতে নিজের কামরায় উঠে গেলেন।

মাঝি মাল্লারা রান্নার চেষ্টা করছে। একটা গ্রাম্য গানের গমক শোনা যাচ্ছে ছিপ নাও থেকে—

আমি ভিন গাঁয়ের মাঝি বন্ধু
ময়ুরকণ্ঠী নাও ভিড়িয়ে এলাম তোমার ঘাটেতে,
নিগূঢ় কথা বলে যাব কানেতে
আহা তোমার রাঙা দুখান ঠোঁটেতে···

পারের কয়েক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিল ইতিমধ্যে। যেমনি একটা ঠাণ্ডা জলো বাতাস ছাড়ল, অমনি তাড়াতাড়ি করতে লাগল সবাই। আবার বুঝি জল নামবে। বর্ষাকে যতটা ভয়, তার চেয়েও ভয় তুফানকে। ডাকিনী নদী ইচ্ছা হলেই ফুঁসিয়ে উঠে ছোবল মারতে পারে যখন-তখন।

জয়ন্তী নিজের কামরায় গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে জানালা খুলে দিয়ে বসে রইলেন। বোধ হয় এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি। কোথায়ও হাওয়া নেই, কেমন একটা গুমোট যেন। কোথায়ও আলো নেই, কেবলই অন্ধকার। নদী, খাল, গাছপালা, সবই কালিলেপা—ঘন কষ কালির দোয়াত ওলটান বুঝি! বজরায় যে আলো জ্বলছে, তা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত অন্ধকারের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যেমন মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে-ওঠা জলো হাওয়া ছোটদের নিশ্বাস টানার পক্ষে অপ্রচুর!

ছোটদি অতি কষ্টে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করলেন। ইষ্টদেবতার নাম করলেন, না বারম্বার ভুল করলেন, তা আজ বলা কঠিন। ভক্তি নেই, উপেক্ষাও নেই; তাঁর দেহ ও মন ভরা কেবল শ্রান্তি। তিনি আজ এত পরিশ্রম কি করলেন? হাজার লোকের নিমন্ত্রণের তিনি কি তদারক করেছেন চীৎকার করে—না কোনও পার্বণের জন্য উপবাস করেছেন নিরম্বু? কিছুই করেন নি। কোনও উৎসবের উচ্ছিষ্ট লোভী বাড়ীর পাশের তাঁতী, ধোপা, নাপিতের ছেলে মেয়ে বৌ ঝিও তাঁর মাংস

টানেনি ছোটদি, ছোটদি বলে। তবে তাঁর হল কি? এমন একটা কিছু হয়েছে যা তিনি বলতেও পারছেন না, ভুলতেও পারা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

'রাণী মা, মাঝিরা জিজ্ঞাসা করছে কোন পথ ধরবে? ঝড় জলে তো সোজা পথে লক্ষ্মীপুরের দিকে পাড়ি দেওয়া উচিত নয়।'

'ব্যস্ত কি, কাল ভোর নাগাদ সোজা পথ ধরলেই চলবে।'

সুরেশ একটু আশ্চর্য হল। কোনও দিনই তো জয়ন্তীরাণী এমন ক্লান্ত কণ্ঠে ঠাণ্ডা কথা বলেন না। সুরেশ ভেবেছিল এই অন্ধকার ও মেঘের মধ্যেই বুঝি বড় নদীতে নাও ধরার হুকুম হবে। সমস্ত শুনেও সে একটু অপেক্ষা করে গেল—কারণ সে ভুলও তো শুনতে পারে।

রাত্রে জয়ন্তীরাণী কিছু ফলাহার করে থাকেন। সময় মত সুরেশ তা গুছিয়ে রেখে গেল। কিন্তু জয়ন্তীরাণীর কিছুই মুখে দিতে ইচ্ছা করছে না। কবি যা বলেছে তার সারাংশের মধ্যে এক বৃহৎ অংশই হচ্ছে আহারের জন্য সংগ্রাম। সে আহার্যে তাঁর স্পৃহা নেই কেন? কেন নেই সে জন্য বিপুল উৎকণ্ঠা? ছোটদির দৈনন্দিন অভাব নেই বলেই হয়ত তিনি স্পৃহাশূন্য—তিনি ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে। স্বর্ণ, অর্থ, দাঢ্য মানুষের যা কাম্য তা তাঁর করতলগত। কিন্তু সুখ নেই কেন? যাঁর অযাচিত খাদ্য গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাঁর প্রাণ কাঁদে কি ক্ষুধায়? এ আবার কি অদ্ভুত দৈন্য! হয়ত এ নিষ্ঠুর দৈন্যের সংবাদ কবি রাখে না—বিরাট ঐশ্বর্যের মধ্যে বসেও যে মানুষ হাহাকার করতে পারে তা নিঃস্ব কবি জানে না। বোঝে না ভিন্ন শ্রেণীর মর্ম ব্যথা। দুবেলা দুটি অন্নের চেয়েও জগতে রয়েছে অনেক বড় বড় কথা। দরিদ্র কবির জন্য একটু অনুকম্পা হয় জয়ন্তীরাণীর।

কবি এখানে নেই। হয়ত তাকে প্রশ্ন করলে একথারও সে একটা ধারাল জবাব দিত। বৈষম্যহীন, শ্রেষ্ঠী ও সম্রাট বর্জিত সমাজে কোথায়

এবং কেমন করে জন্মাবে এ মনোবিকার? বালবিধবা ছোটদির অস্তিত্বই যদি লোপ পায়—তবে তাঁর দীর্ঘশ্বাস কল্পনাতীত নয় কি?

বরঞ্চ সে সমাজে দেখা দেবে নিটোল স্বাস্থ্যবতী শ্রমশীলা মা। বহু সন্তানের জননী, তবু দেহ ভাঙছে না। পথচারী কুক্কুরীর মত দুটি ভাত দাও গো, ফ্যান দাও গো বলে বড় বড় ইমারতের পদপ্রান্তে আর্তনাদ করছে না

ভাবতে ভাবতে জয়ন্তীরাণী কতক্ষণ যে কাটিয়ে দেন বলা চলে না। জল নামে বড় বড় ফোঁটায়। কাপড় চোপড় ভিজে গেলে তাঁর হুঁশ হয়।

'সুরেশ।'

'আজ্ঞে।' নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে ভৃত্য জবাব দেয়।

'কবি কি এসেছে ওপর থেকে?'

'বলতে পারিনে। কামরায় তো আলো জ্বলছে।'

'তাঁকে রাত জাগতে নিষেধ কর—খাওয়া কি হয়েছে? লক্ষীপুর পৌছতে দেরী আছে দু তিন দিন—দলিলপত্র একটু একটু করে দিনের বেলা দেখলেই হবে।'

'আজ্ঞে ভাল কথা—যাই তাকে বলি গে।'

অল্প সময়ের মধ্যেই সুরেশ একটা দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এল—কবি তার কামরায় নেই।

শ্লথ অঞ্চলটা দ্রুত গুছিয়ে নিতে নিতে ছোটদি বলেন, 'এতক্ষণ তোমরা কি করছিলে যে খবরটা আমাকে পর্যন্ত জানাও নি? হয়ত ভাবতে ভাবতে সে পাগলটা কোথায় এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। যাও শীগ্‌গির মাঝি মাল্লা পাইকদের ডাক। মশাল জ্বেলে খোঁজে পাঠাও।'

ছোটদি জয়ন্তীরাণীর উত্তেজিত কণ্ঠ। কারুকে আর ডাকার প্রয়োজন হয় না। যে যার দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। কেরোসিনের টিন কেটে তখনই মশাল জ্বালান হয়। বর্ষার মধ্যেও অগ্নি শিখা লকলক করে ওঠে।

'কেউ তোমরা কবিকে কূলে উঠতে দেখেছ ?'

সকলে মাথা হেঁট করে থাকে। কেউ কথা বলতে সাহস করে না।

'যদি সে মনের দুঃখে গাঙের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকে' যদি সে আত্মহত্যা করে থাকে ? তোমরা কোথায় যাবে তার খোঁজে ?'

সমস্যাই বটে। আবার সকলে নতমস্তকে কালক্ষেপ করে।

'আমি জানিনে, তোমরা যেদিকে ইচ্ছা যাও, মোট কথা জীবিত কি মৃত কবিকে আমি চাই-ই চাই।'

মশাল ধরে নদীর স্রোত বরাবর চার পাঁচখানা ছিপ ভেসে চলল কবির খোঁজে। আর হাটখোলা উঠে প্রায় পঞ্চাশ জন পাইক পেয়াদা ভাগ হয়ে গেল ছোট ছোট দলে। কয়েকটা পায়ের চিহ্ন দেখা গেল কাদায়। মনে হল কবির পায়েরই দাগ। কিন্তু পদচিহ্ন অনুসরণ করে অনেকক্ষণ খোঁজা গেল না। বৃষ্টি নামল শ্রাবণ মাসের ধারার মতন। মশালগুলো নিভে গেল একটা একটা করে। জল না থামলে আর কোনও বুদ্ধি, বিদ্যা, গায়ের জোর খাটান যাবে না এই ঘন মেঘলা অন্ধকারে। শক্তিমান দুঃসাহসী মানুষগুলো নায়ে ফিরে এসে চোরের মত চুপ করে বসে রইল মুখ গুঁজে।

জয়ন্তীরাণী সারারাত ধরে চোখ বুজলেন না। পেয়াদা, পাইক, মাঝি, মাল্লারা যে হয়রাণ হয়ে নৌকায় ফিরল, তা টের পেলেন। কারুকে ডেকে তিনি আর কবির কথা জিজ্ঞাসা করলেন না।

অতি প্রত্যুষে উঠে ভৃত্য জানাল যে এখনও একটু একটু অন্ধকার থাকলেও ভোর হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্মীপুরের দিকে নৌকা খুলবে, না আবার কবির খোঁজে বের হবে।

'মাঝিকে পাল খাটাতে বল।'

'বাতাস যে উলটা রাণী মা ?'

'আমি লক্ষ্মীপুর যাব না—বাড়ী ফিরব।'

বিস্মিত ভৃত্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেরিয়ে গেল।

উনত্রিশ

ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনি করেছ
শিকলে বেঁধেছ রুটির মুঠি...

আত্ম-বিস্মৃত কবি আবৃত্তি করতে করতে পথ চলে। কাঁটা, জংগল, অন্ধকার কোনও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। জামা কাপড় থাকল কি ছিড়ল সেদিকেও আজ তার নজর নেই। সে যেন নিশির ডাকে হেঁটে চলেছে। না না নিশিও তাকে ডাকেনি। চলেছে এক অসহনীয় মর্মবেদনায়। শাশ্বত জনতার অন্তর্লীন গূঢ় ব্যথার সূত্রটা সে ধরে ফেলেছে ছন্দে। বারম্বার আবৃত্তি করে কবি অস্ফুট স্বরে—

ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনি করেছ
শিকলে বেঁধেছ রুটির মুঠি...

মানুষকে তার আদিম এবং স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য অস্বাভাবিক আইনের শৃংখল হয়েছে কত রকম! মানুষ অন্নদাস হয়ে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়েছে। তার চিন্তার মৌলিকতা করেছে নষ্ট। নিজে পুলিশ সেজে অতর্কিতে চোর বলে গ্রেফ্‌তার করছে নিজের আত্মজকে। আবার বিচারকেরা গুরু গম্ভীর ভূমিকায় নেমে তাকেই দিচ্ছে ফাঁসির হুকুম।

মাতৃগর্ভ থেকে তো চোর, খুনী, ডাকাত হয়ে কেউ ভূমিষ্ঠ হয়নি। যা কিছু তার রোগ সে তো সমাজ বিকার,—কোনও ক্ষেত্রে মহামারী। যদি অজ্ঞতা দীনতার জন্য সে ব্যধিগ্রস্ত হয়ে থাকে, সরলতার জন্য সে যদি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তোমারই ষড়যন্ত্রে পেছনের গর্তে পড়ে পংগু হয়ে থাকে, হে তথাকথিত সজ্জন, তুমি কি তার ললাট লক্ষ্য করে চালবে গুলি? সে আর যাই হক? রেসের ঘোড়া নয়! তোমার ধমনীতে আজ না হয় রক্ত বইছে নীলা—কিন্ত তুমিও সেই আদিম

পিতারই আত্মজ! অবয়বে ভ্রাতা বলে চেনা যায়। কবি ভাবে নানা কথা।

উন্মুক্ত আকাশের তলে, প্রকৃতির আশীর্বাদে ফসল হয়েছে অপরিমিত। মানুষ ভোগ করে ইচ্ছানুরূপ, দান করে মুক্ত হস্তে—তবু ফুরায় না ফসল। এল বাণিজ্যিক লোভ, সুরু হল দুর্নিবার বঞ্চনার ইতিবৃত্ত! লৌহ যবনিকার অন্তরালে চলে গেল মানুষের খাদ্য। অন্ধকারে দেখা দিল ক্ষুধার্ত জনতা। তোমরা অনায়াসে থাকে বল, চোর, ডাকাত, খুনী।

কবি পথ চলতে চলতে বলে, 'কিন্তু আমি মানব না। আমি বলতে পারব না ওদের অপরাধী।'

ছোটদি অজ্ঞান হন নি। হয়েছিলেন অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি যখন বিবশ হগে চুপ করে চোখ বুজেছিলেন কবি তখন ভ্রান্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল বজরা ছেড়ে। সকলেই দেখেছিল কিন্তু কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। সে যে একেবারে আর ফিরবে না, তা একজনও যদি বুঝতে পারত তবে কথনই এ রহস্যময় নাটক সৃষ্টি হতে পারত না।

কোন্ পথে কবি যাবে তার নিশানা সে জানে না। তবে তার অন্তর থেকে যে প্রেরণা জন্মেছে সেই তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, ওরে এখানে নয়, এখানে নয়—অন্য কোথায়ও, ভিন্ন কোনও স্থানে।

সন্ধ্যার পরই জল নামল। কবির চেতনা হল না। সে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে চলেছে! চেতনা যে কবির হয়নি তাই বা বলা চলে কি করে? তার অবচেতনা মনের তলায় আবার বিপ্লব দানা বেঁধেছে। স্থির সে সমুদ্রের মত; ওপরে উদ্দাম চাঞ্চল্য নেই। এবার ভিতর থেকে যেন জোয়ার উথলে উঠছে। পিতৃশ্রাদ্ধের দেনা, ভগ্নীর বিবাহের ঋণ, ছোটদির রক্ত চক্ষু সকলই সে কোন্ শক্তিতে যেন উপেক্ষা করে চলেছে।

হাটের সীমানা ছাড়িয়ে সে মাঠের সীমানায় এসে পড়ল। দিগব্যাপী কালি লেপা অন্ধকার। শ্বাপদ ও বিষাক্ত সরীসৃপ বহুল জল-জংগলে

বোঝাই মেঠো পথ। তবু আর সে কি ফিরতে পারে না। অন্তত বজরায় তো কিছুতেই নয়। এবার তার ব্যক্তিগত দেনা অস্বীকার করার পালা এসেছে। সমষ্টিগত চেতনা তার ভিতর না জাগলে ব্যক্তি-মানুষের ঋণ যতবার সে পরিশোধ করবে ততবারই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বাঁধবে আইনানুগ নানা অছিলায়। আজ অন্নের দেনা শুধলে কাল বস্ত্রের ফাঁস গলায় এসে শ্বাস রোধ করে দাঁড়াবে।

এখন সংসার তার অনেক ছোট হয়ে এসেছে, দায়িত্ব হয়েছে নিতান্ত সীমাবদ্ধ। এইবার নাও হাল্‌কা হয়েছে, তাকে পাড়ি জমাতে হবে। ঝড়োগাঙ, বড় নদী বলে কূলে বসে কাঁদলে তো চলবে না। কখন ঝড় থামবে সে জন্য অপেক্ষা না করে, বড় তুফানকে ডিঙিয়ে যাওয়াই আজ হয়েছে কবির লক্ষ্য।

ব্যক্তিগত ঋণ, ঋণ নয়—আর চলিত আইনও আইন নয়। কবি হিসাব করে দেখেছে সূক্ষ্ম।

ওরে তোর ভয় কি? মুক্ত মাঠে নাম, হেঁটে চল দৃঢ় পায়। অন্ধকারে যে বাজ গর্জায়, তারও আলো আছে—বিপ্লবীর মৃত্যু নেই। দেহ যদি সে ছাড়ে, দেহাতীত হয়ে জনতার অন্তরে উপাস্য হয়ে থাকে।

বৃষ্টি আর একটু জোরে নামল। কবির পা দুখানাও সেই তালে তালে দ্রুত চলতে থাকল। বজরার আলো, ছোটদির ভীতি ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হতে হতে কবির স্মৃতি থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক থানা মাঠ, তারপর খানিকটা জংগল, আবার মাঠ, তারপর সোঁতা খাল—কবি এগিয়ে চলেছে।

দূরে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো। গাঁয়ের লোকেরা কি মাছ ধরতে নেমেছে নতুন জলে?

না।

কবি থামল।

ছোটদির উক্তি তার আবার মনে পড়ল—মুহুরী থেকে নায়েবী। সে আর দেরী না করে পা চালিয়ে দিল জোর কদমে। সুমুখে আঁধার—পিছনে মশাল—এ যাত্রা তার কিছুতেই বুঝি অব্যহতি নেই। তবু অন্ধকার ভাল, দুর্যোগ আজ অভিনন্দন যোগ্য—কারণ তার ভিতরে রয়েছে বিদ্যুৎ বিকাশ। স্বপ্ন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ঐ তো কবির গন্তব্য পথ দেখা যায়।

চোখ ধাঁধান মশালের আলো, আলো নয়—জয়ন্তীরাণীর কঠোর নির্দেশ। আর কি লক্ষ্মীপুর ফেরা যায়!

সব বুঝেও কবি হঠাৎ থামে।

অজয় প্রশ্ন করে, আর কত বার কবি নাম হাসাবে? বুদ্ধির প্যাঁচ কষে, দ্বিধা দ্বন্দ্বের কাঁটায় আর কত কাল জড়াবে? ভাবলে কি ভাবনার শেষ আছে? মননশীল মানুষ যুক্তির জটিল জাল থেকে কি কখনও মুক্তি পেয়েছে? চাই নিষ্ঠা চাই আত্মসমর্পণ, চাই সামগ্রিক সংগ্রামে একান্ত বিশ্বাস। ওরে বিপ্লবে তোর জয় হবে। তোর ক্ষয় নেই, ভয় নেই ছোটদিকে, তোর জয় যে সুনিশ্চিত।

লক্ষ্মীপুরের দেবোত্তর মহলগুলোর দলিলের ছত্রে ছত্রে তুই কি দেখেছিস?

'রক্ত!' কবি জবাব দেয়, 'চাপ বাঁধা, কঠিন কাল্‌চে রক্ত। কোথায়ও বা মাটির সংগে মিশে গেছে কোথায়ও বা উৎখাত শূন্য ভিটার শুকনা পলাশ ফুলে শুকিয়ে রয়েছে। দেশ ছেড়ে, লোকালয় ছেড়ে কেউ কেউ সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হ'য়ে চলে গেছে স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে গঞ্জে, বন্দরে কিংবা কলকারখানায় মজুরের খাতায় নাম লেখাতে। ভাবলে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়: কী চক্রান্ত! যারা ছিল সত্যি সত্যি মাটির মালিক, তারাই রাঢ অর্দ্ধভুক্ত মজুরে রূপান্তরিত!'

অজয় মন্তব্য করে, 'তবে!'

কবি বলে, 'চুপ কর ভাই, আমি আরও জানি, আরও অনেক কিছু জানতে পেরেছি ওদের গুপ্ত দলিল পাঠ করে'। অল্পবয়স্ক কৃষাণের মা বোন, যারা উমেদারী করেও চাকরী পায়নি, ভিক্ষা করেও যাদের অন্ন জোটেনি—তারা শেষ পর্যন্ত পেশাকর হয়েছে। পেশাকর মানে কি জান ? বেশ্যা। অবাঞ্ছিতা ঘৃণিতারা কেন রয়েছে এ সমাজে তা জান ? যুক্তি শুনেছ বুদ্ধির একচেটিয়া বেনিয়াদের ?'

উৎসুক অজয় সবিস্ময়ে বলে, 'না।'

'ওরা সমাজের পরিশ্রুত জলবাহী নল নয়—কলুষ-কলংক-পূতি গন্ধ বাহী ড্রেন। সৈন্যসামন্ত রাজতন্ত্র সমাজ বাঁচিয়ে রাখতে ওরা না কি অপরিহার্য।

অজয় অবাক হয়ে থাকে।

'কিন্তু, কিন্তু আমার বুক ফেটে যায় যখন আমি ভাবি এই হীন বৃত্তিরও ওদের মাঝে মাঝে লাইসেন্স বাতিল করে দেয় পুলিসে—কেউ কেউ হয়ত শত চেষ্টা করেও আদৌ জোটাতে পারে না পেশাকরের টিকিট। তখন মা বোনেরা বস্তি থেকে সোজা রাস্তায় নামে। ভাঙা-জীবন আরও ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। অন্ধকার দেখে দিন দুপুরে। সহরের গাড়ী ঘোড়ার ঝন্‌ঝনানি মনে হয় বুঝি বা ঝিঁঝিঁর ডাক।'

'অনাহারে অনিদ্রায় এবার ওরা চোখ বোজে।'

'অবশেষে আসে রাজকীয় তদারক, নয়ত সমাজহিতৈষী সেবা ব্রতী কোন সমিতির অতিকায় চার সিলেণ্ডার লরী। দড়ি বেঁধে সসম্মানে মহাপ্রস্থানের পথে নিয়ে চলে। কচ্চিৎ, কদাচিৎ মাগো, দিদিগো বলে কাঁদে নিরাশ্রয় বেওয়ারিশ ছেলে শত শত হর্মমালা গাঁথা সহরের ফুটপাথে। নগরীর কোলাহলে সে আর্তনাদ মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে কিন্তু আমার বুকে তার প্রতিধ্বনি মাথা কুটে মরে। অজয় এবার তুমি আমায় ভুল বুঝ না, আমার আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।'

কবি এগিয়ে চলে।

আকাশের বাদল ছাপিয়ে যেন তার মনের বাদল চোখের কোণ গড়িয়ে অঝোর ধারায় ঝরতে থাকে। সে এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে ভাবে তন্ময় হয়ে শুধু দুটি পংক্তি কবিতাই আবৃত্তি করতে করতে পথ অতিক্রম করে—

ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনি করেছ
শিকলে বেঁধেছ রুটির মুঠি…

এক সময় ক্লান্ত কবি একটা সেঁতাখালে পড়ে আর উঠতে পারে না।

নিদারুণ বর্ষায় একখানা এক বৈঠার ডিঙি বড় গাঙ থেকে ছোট খালে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিল। বর্ষাক্রান্ত না হলে আর কোথায়ও যাওয়া অসম্ভব।

স্থান কাল ভাল নয়। পুরুষ যাত্রীটি চমকে উঠল। 'কিসের শব্দ মাঝি?'

নৌকার ছইয়ের সুমুখের আচ্ছাদনটা সরাতেই এক ঝলকা আলো পড়ল জলে।

'এ যে মানুষ কত্তা।'

'ধর ধর—শীগগির ওপরে তোল, নায়ের পাটাতনে।'

মহিলা যাত্রীটি ভয়ে, বিস্ময়ে আর্তস্বরে বলে উঠল, 'এ যে কবি! ওগো তুমি এখানে মরতে এলে কি করে?'

গণ্ডগোল ও মহিলাটির চাঞ্চল্যে কেরোসিনের ডিবাটা উলটে গিয়ে নিভে গেল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে সমস্তই ডুবে রইল।

ত্রিশ

কুসুম দেবীপুরে পৌছে আঁচলটা কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে ঘর দুয়ার যুক্ত করতে লাগল। কত যে ঝুল ময়লা জমেছে এখানে ওখানে! কনকপুর যখন আর সে ফিরে যাবে না, তখন দেবীপুরই তাকে গুছিয়ে নিতে হবে। জীবনে এ যে কত বড় বিড়ম্বনা তা আর কারুকে বোঝান যায় না। যে বিষয়ে তোমার মন বসবে না, তাতেই তুমি মন বসাতে বাধ্য হবে, সাধ্য নেই একটু এদিক ওদিক নড়ার।

ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে করতে তার বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল। তবু কি আবর্জনা শেষ হয়। কত কাল ঝাড় পোঁচ হয়নি। এক-জন বিবাহিত পুরুষ মানুষ বিদেশ থেকে এসে বয়স্ক আইবুড়োর মত দুদিন কোন রকমে মাথা গুঁজে থেকে চলে গেছে। সে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বৈষায়িক কাজ কর্ম দুটো একটা করেছে, ভিতরের অবৈষয়িক দিকটায় শুধু জঞ্জালই জমেছে বছরের পর বছর। হিসাব করলে কুসুমের বিয়ে তো কম দিন হয়নি। সে একটি অভিযোগ শূন্য, স্বল্পভাষী লোকের অস্তিত্বের যেন উপলব্ধি পায় সর্বত্র। এখানে পণ্ডিত দাঁড়িয়ে বাতায়ন পথে চেয়ে রয়েছে, ঐ শয্যায় শুয়ে কোনও রকমে রাত কাটিয়েছে। ব্যবস্থার অভাবে দু একদিনের হয়ত আহারই হয়নি তার। যাক সে সব এখন আর ভেবে হবে কি?

কুসুম ঘর আবর্জনা মুক্ত করে বাইরের দিকে চেয়ে দেখল—উঠানে এক হাঁটু জংগল। তার মাথা ঘুরে গেল। দিনের বেলায়ই পোকা মাকড়ের ডাক, রাত্রে না জানি হবে কি! হয়ত শেয়াল এসে উঠবে বারান্দায়। সুযোগ পেলে চাই কি ঘরে ঢুকবে। সে শিউরে ওঠে মাগো বলে। এ তো শ্বশুর বাড়ী নয় যেন শ্মশানপুরী।

একটি পেত্নীর ছানার মত মেয়ে আসে রুগ্ন নয়, অমনি লিকলিকে গড়ন। 'কুসুম মাসী খেয়েছ?'

শ্মশান ভাবতে না ভাবতেই শ্মশানের বাসিন্দার আবির্ভাব! কুসুমের ঘৃণা এবং ভয়তে গা কেমন করে ওঠে যেন।

'মা তোমার জন্য রেঁধেছে। এবেলা আমাদের ওখানে নেমতন্ন তোমার। আমি শুধু মসলা বেটে, জল এনে, কুটনো কুটে দিয়েছি। আর ঝোলটাও আমি রেঁধেছি। মা কেবল নুনটা চেখেছে। ভাত আর ডাল—তা আর শুনে করবে কি, উনান থেকে নামিয়েই মাকে খেতে দিয়েছি। মা আমার বড্ড রোগা স্থতিকার রুগী। গতবার যে খোকা ভাইটি হ'ল...'

মেয়েটির আপাদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করে নিয়ে কুসুম বলল, 'পঞ্চী আমি আজ যাব না, শরীরটা ভাল নেই। কাল দেখা যাবে। আর কাল পর্যন্ত আমিও একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব। এখন তুই যা।'

'সে কি মাসী তুমি খাবে না। কেন আমরা গরীব বলে কি আমাদের ভাতে দোষ করল—না ঝোল রেঁধেছি আলুনি? মাসী আমাদের আর কিছু না থাকলেও নুন বাড়ন্ত হয়নি। কপাল পুড়েছে বলেও এমন কিছু পোড়েনি। পয়সা নেই, কিন্তু তোমার জন্য এত বড় একটা কৈ মাছ ধরে এনেছি পালবাবুদের পুকুর থেকে।'

'চুরি করে এনেছিস তা হলে? এত কাজের মধ্যেও কখন ফুরসৎ পেলি?'

'চাইলে, কাঁদলে কেউ কি দেয়? আর দিলেও কি তাতে পেট ভরে, না ভালটা পাওয়া যায়? সেদিন তো পালবাবুরা মাছ ধরালেন জেলে ডেকে—দিলেন কটা তেতো পুঁটি। তুমি তা মুখেই দিতে পারতে না।'

যদিও বা কিছু অবশিষ্ট ছিল, এবার কুসুমের খাওয়ার লিপ্সা একেবারে বিনষ্ট হল।

'তুই বাড়ী যা পঞ্চী, আমি যাব না।'

'কেন যাবে না বল দিকি? মাছ চুরি করে' এনেছি বলে?' সে হাসল খানিক। 'ওমা দরকার ছিল, অতিথ খাবে, চাইলে দেবে না, আনলাম একটু হুশিয়ার হয়ে, তাতে হল দোষ! আমি তো কারুর ঘরে সিধ দিইনি, সোনা দানাও আনিনি। অজচ্ছর মাছ! টুক করে একটা টোপ ফেললাম বঁড়শিতে গেঁথে, উঠল একটা বড় কই—তা নাকি চুরি!' সে আবার হাসল। 'কুসুম মাসী নিত্য পূজার জন্য যে পালবাবুদের বাগান থেকে ফুল না বলে কয়ে আনি, তা যদি চুরি না হয়—তোমার জন্য মাছ আনলে কি চুরি হতে পারে? কে না জানে অতিথি দেবতা, স্বয়ং নারায়ণ।' শ্মশানের বাসিন্দাটি এবার আর হাসল না। সুর বদলে বলল, 'গরীব বলে আমাদের ঘরে না খাও, সে তোমার রুচি, কিন্তু আমাদের ঠকাবে কি করে?'

কুসুমের সারা শরীর জ্বলে ওঠে।' সাধে তোদের এই অবস্থা—বেরো বলছি, যা এখান থেকে।'

পঞ্চী একটুও না দমে হাসতে হাসতে চলে যায়। যাওয়ার সময় বলে যায়, 'যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর! দুনিয়াটা হল কি!'

এ পঞ্চীর কথা নয়—পঞ্চীর পিতামাতার মুখের কথা। শুনে শুনে ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। পিষ্ট পদদলিত ওদের মত হয়ত আরও শত শত গ্রামের লোকেরও একই কথা। তারা শত চাপে, শত অত্যাচারে যতই ছোট হক না কেন—তাদের কিছুতেই মরতে চায় না মনটা। ভুলতে পারে না দেব-সেবা এবং অতিথি সৎকারের মাংগলিক ও বৃহত্তর দিকটা। এ অনুভূতি একদিন বিশ্ব সভ্যতার অভ্যুত্থানের সংগে সংগে জনতা সমুদ্রেই মুক্তার মত জমে ছিল কিন্তু তা-ও আজ এক চেটিয়া হয়ে গেছে বণিকের তুলা দণ্ডে ঠেকে। চাল, রুটি, মাছ, মাংস—মানুষের যা কিছু আহার্য আজ কনট্রোল। অন্তত সব কিছু কনট্রোল না হলেও বজ্র মুঠির করতল

গত। তাই কৃষকের ধান ঘরে উঠতে না উঠতেই উধাও হয় মিলে, জেলে মাছ ধরতে না ধরতেই চলে আসে সহরের সুসজ্জিত বাজারে। ফলে অতিথির আপ্যায়ণ চলে গ্র্যাণ্ড হোটেলে নয়ত সুরসভাতুল্য কোনও রেঁস্তোরায়। তারপর বিদায়ী অতিথিরা নয়া দিল্লীর মসনদকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ্যামেরিকা অথবা ইংলণ্ডে উড়ো জাহাজে পাড়ি জমায়। পক্ষী কুসুমের কথা বাড়ী গিয়ে বলে, মা বাবার গালমন্দ খেয়ে আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তখনও হয়ত উড়োজাহাজের আমীরী ধোয়া মিলিয়ে যায়নি নভোদিগন্তে।

পক্ষী চলে যেতেই কুসুম হাতের কাজ রাখল। তার উক্তিটা বড় চড়া হয়ে গেছে। আর না বলেও কি উপায়ে আছে! মেয়েটা যা সব বলতে লাগল? যাক্, দেখা হলে আবার না হয় দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়ে দেবে।

কুসুম স্নান করতে গেল। স্নান সেরে পুকুর পারে উঠে দেখল পক্ষী কাঁদছে।

'কিরে তুই যে আবার এখানে? কি হয়েছে, কাঁদছিস কেন? নিশ্চয় কারুকে কিছু বলেছিস, সে মেরেছে?'

'না মাসী কুলগাছে উঠেছিলাম।'

'কেন? যেমন মেয়ে ঠিক তেমনি সাজা হয়েছে। দেখি দেখি কতটা ছড়ে গেছে? উঃ হাঁটুর হাড়টা যেন বেরিয়ে পড়েছে। দস্যি মেয়ে ইচ্ছা করছে তোর দুগালে চড় কষিয়ে দিতে। অসময়ে কুলগাছে উঠেছিল কেন?'

'একটা পেয়ারা পাড়তে।'

'কুল গাছে পেয়ারা?'

'হুঁ।' ঐ পর্যন্ত বলে পক্ষী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকে। 'আমার মা আজ আর রাখবে না।'

চোখের জল! কুৎসিৎ হক, কদাকার হক, তবু তো এক ব্যথিতার নয়নাশ্রু! অন্তর বিগলিত হয়ে যায় সন্তানহীনা কুসুমের। চকিতে মনে পড়ে হেনার কথা। তার যত আবদার, যত দায় শেষ পর্যন্ত কুসুমকেই বহন করতে হত। পিসী আর মাসীতে কি-ই বা পার্থক্য। কুসুমের চোখও ঝাপসা হয়ে আসে। ধীরে ধীরে হেনা এসে মিশে যায় পঞ্চীর অবয়বে।

কুসুম ভিজা আঁচলের জল দিয়ে ওর ক্ষত স্থানটা ধুইয়ে দেয়।

পঞ্চী বলে, 'লাগবে না মাসী, ওর দরকার নেই, আপনি ঘা শুকিয়ে যাবে। আমার কাপড়টা যে ছিঁড়ে গেল।'

'তোর ঘায়ের থেকে কাপড় বেশী হল!'

'হবে না মাসী, মা যে আজ আমায় খুন করে ফেলবে।'

রক্তের চাইতেও অর্থ বড়। অর্থ নইলে বস্ত্র খরিদ করা অসম্ভব। এ অসাম্য বিনিয়ন্ত্রণের কুটিল গরল যে এই বালিকারও মর্মস্পর্শ করেছে! জন্মাবধি সে যে ভাতে কাপড়ে কষ্ট পেয়েছে অবর্ণনীয়। ওর মনের তলায় শুধু জ্বালা। ওর কাছে কেন রক্তের চাইতেও বড় বোধ হবে না একখণ্ড বস্ত্র? ও জানে, ও স্বেচ্ছায় একটা আংগুল কেটে রুধির দিতে পারে, কিন্তু ও কি ইচ্ছা করলেই সংগ্রহ করে আনতে পারে একখানা কাপড় ওদের হাটের সেই মাড়োয়ারী মহাজনের গুদাম থেকে?

কুসুম পঞ্চীকে কোলে তুলতে গেল। পঞ্চী অস্বীকার করল। তার হাঁটুর ব্যথার থেকেও মায়ের ভীতি সমধিক। সে বারংবার কাপড়ের কথাই তুলতে লাগল।

'চল আমি তোকে একখানা শাড়ী আনিয়ে দেব।'

এবার পঞ্চীর যেন অনুভূতি বিপথ থেকে ঠিক পথে ঘুরে এল। তার বেদনা বাড়ল। সে কোলে উঠল কুসুমের।

'মাসী বড্ড টাটাচ্ছে।'

'চল ঘরে চল—একটা ওষুধ লাগিয়ে দেব।'

কোলে উঠে পঞ্চী কুসুমের ঘাড়ের ওপর মাথাটা কাৎ করে রাখল। এখন সে যন্ত্রণা অনুভবের আরও যেন অবকাশ পেয়েছে। তার মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। ব্যথা করছে যথেষ্টই কিন্তু নিরাপত্তারও অদ্ভুত একটা স্বস্তি আছে—যার স্বাদ এই বালিকা আজ বুঝি পেল প্রথম।

কুসুম কবির সহধর্মিণী না হলেও মর্মসংগিণী। যে ব্যথা কবির বুকে ছায়া ফেলে সে ব্যথা কুসুমকেও বিবশ করে। পঞ্চীর রূপ গুণের প্রশ্ন খাটো হয়ে এখানে বড় হয় সে যে মানুষ। এবং শুধু মানুষই নয়, জনতারই একজন।

কুসুম পঞ্চীকে দাওয়ায় নামিয়ে রেখে কয়েকটা কি যেন পাতা থেঁতলে ওর ক্ষত স্থানটায় লাগিয়ে দেয়।

'কেমন লাগছে?'

'ঠাণ্ডা।'

একত্রিশ

'হ্যাঁরে পঞ্চী কুলগাছে পেয়ারা কি করে হয়? তখন তোর কথা তো আমি কিছুই বুঝলাম না।'

'যদি খুব ক্ষিদে পায়, আর বাড়ীতে ভাত না পাও, পালবাবুদের পাঁচিলের ওপাশের পেয়ারা পাড়তে হয় না বলে-কয়ে, তখন পাঁচিলের এপাশের কুলগাছে না উঠে কি উপায় আছে? সাধে কি হয় কুলগাছে পেয়ারা! উঃ আমি তখন চোখে সরষে ফুল দেখছিলাম।'

'কেন? তুই কি এখন পর্যন্ত ভাত খাসনি?'

'না। তোমাকে না নিয়ে যেতে পারলে মা আমায় ভাত খেতে বারণ করেছে।'

'আচ্ছা মা তো! চল দেখি তোকে কি করে খেতে না দিয়ে পারে?'

তবে আমি যাইগো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা ব'লে
বলব আমি 'নাই সে খোকা নাই।'
মাগো যাই॥

বাদলা যখন পড়বে ঝরে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে
ঝরঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জানালা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে—
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে॥

ললিত মধুর কচি কণ্ঠে এ কবিতা কখন পঞ্চী কিংবা তার খোকা ভাইটি আবৃত্তি করেনি। এমন অপূর্ব ছান্দামগ্নী লালিত্য যে পৃথিবীতে আছে তা সমগ্র দেবীপুরের সাধারণ বাসিন্দাদের কাছে আজও অজ্ঞাত, পঞ্চীর মার কাছে তো নিশ্চয়। বিবাহের পরে সে দেবীপুরে পা দিয়েই ঢেঁকিতে উঠেছে। নিত্য দুবেলা ধান ভেনে তবে ভাত রেঁধেছে। একদিন ধান ভানতে সে প্রসব করল পঞ্চীকে। ধরল করাল সুতিকায়। একটু ভাল হতে না হতেই আবার পেটে এল যম। আবার প্রসব, আবার তনুক্ষয়ী সুতিকা। সে পঞ্চী কিংবা তার ভ্রাতা ভগ্নীর কণ্ঠে কবিতার সুকোমল পংক্তি শোনেনি। শুনেছে নিষ্ঠুর চীৎকার। শুন্য নেই, তবু শুন্য দাও। জবাবে পঞ্চীর মা আহা উহু বলে চুমো খেতে পারেনি। করেছে নিষ্ঠুরতম গালমন্দ অথবা প্রহার। সেই অভ্যাসটাই পঞ্চীর মার স্বভাবে

পরিণত হয়ে গেছে। এ তার দোষ নয়, কঠিন রোগেরই বিকার। কিন্তু পঞ্চী মাকে এমন যে শিক্ষিতা মার্জিত রুচি পালবাবুর স্ত্রী তিনিও সুযোগ পেলেই হাসির উপকরণ করেন। 'দেখেছ ওর চালচলন কথাবার্তার কি চমৎকার ঢং! হিঃ হিঃ হিঃ। দিদিগো হিঃ হিঃ হিঃ!' হাসতে হাসতে পানের পিক ফেলে তিনি নির্বিকারচিত্তে নষ্ট করেন তাঁরই পরণের সদ্য ধোয়া সাদা একখানা তাঁতের শাড়ী।

হয়ত পঞ্চীর মা কখন-সখন পালবাবুদের বাড়ী দায় ঠেকে যায়। সে তো অবাক হয়ে থাকে।

পঞ্চীর মা পণ্ডিতের এক প্রতিবেশী জ্ঞাতির স্ত্রী। তাদের অবস্থার কথা আর উল্লেখ না করলেও চলে। তবু পঞ্চীর মা কেন এত পীড়াপীড়ি করছে খাওয়ার জন্য? কুসুমের একটা সন্দেহ হয়। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল—এ তো এক বেলায় পঞ্চীদের ঘরে রান্না হওয়ার কথা নয়।

পঞ্চীকে বসিয়ে রেখে ভিজা কাপড় বদলাতে গেল কুসুম। চুল আঁচড়ে একটা সিঁদূরের ফোঁটা দিল যথানিয়মে। আর্শিতে সে তার অভুক্তশ্রী দেখে চমকে উঠল। এত বড় ও পরিষ্কার আয়নায় সে অনেক দিন মুখ দেখেনি।

চকিতে তার মনে পড়ল কনকপুরের কথা···

চকিতে মনে পড়ল একখানা ক্লিষ্ট ব্যথাদীর্ণ মুখ।

কুসুম যেন সচকিত হল তার পিতার কণ্ঠস্বরে। ব্রজেশ্বর যেন গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে মধু ঢেলে আবৃত্তি করছেন মেঘদূত।

কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।

কুসুম যেন এগিয়ে এসে বসল। ঐ আবৃত্তির কি যে এক মাদকতা আছে তা বলতে পারে না কুসুম। তার সমস্ত বিক্ষিপ্ত মন কেন্দ্রীভূত হয়ে এল ক্রমে। সে যে এখন পর্যন্ত এক ফোঁটা জলও স্পর্শ করেনি তাও

ভুলে গেল। ভুলে গেল পঞ্চীর কথা পর্যন্ত। সে বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল পিতার দিকে। ঐশ্বর্য নেই, সাম্রাজ্য নেই, কিন্তু কত বড় বৈভবের অধিকারী তার পিতা। অথচ এ বাড়ীর কেউ তা তলিয়ে বোঝে না। হাতের পাশের মণিখণ্ডকে তুচ্ছ করে কাচ খণ্ডের মত।

কবিতা পড়লেই কুসুম সব বুঝতে পারে। তবু আজ ব্রজেশ্বর যেন কি আনন্দে অধীর হয়ে দু একটি শ্লোক, দু একটি পংক্তি ব্যাখ্যা করে চলেছেন। একে শুধু ব্যাখ্যা বললেও ঠিক বলা হয় না। কোন দরদী শিল্পী যেন গদ্য কাব্যের পংক্তি রচনা করছেন। মধু ঝরছে স্তরে স্তরে—শব্দের বর্ণালী ঝংকারে।

গভীর রাত্রি যেন। দীপ শিখা এক একবার আকুলি ব্যাকুলি করে। আলো এবং ছায়ার খেলা চলে ব্রজেশ্বরের মুখের ওপর। কুসুমের মনে হয় যেন মহাকবি স্বয়ং তার সুমুখে বসে, পড়ে শোনাচ্ছেন মেঘদূত! মেঘের সংগে সংগে কুসুমও বুঝি ভেসে যাবে অলকায় সহস্র গিরি নদী কান্তার ডিঙিয়ে।

তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বোধরোষ্ঠী
মধ্যেক্ষামা চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্রস্যাৎ যুবতি বিশয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥

যক্ষিণী কি সত্যসত্যই এত সুন্দরী ছিল, না অপূর্ব রূপ লাবণ্যবতী হয়েছে মহা কবির কল্পনায়? কুসুম তো সাধারণ এক গ্রাম্যমেয়ে। সেকি এরূপের একটু কিছুও পায়নি? সে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে ভাবে—নিম্ননাভিঃ, শ্রোণীভারাদলসাগমনা, স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং…আর্শিটার দিকে না চেয়ে কুসুম নিজের দিকেই তাকায় বারবার। আছে নিশ্চয়ই আছে তার অনেক কিছু সুলক্ষণ। কিন্তু সকলই কি তার বৃথা নয়? বৃথা নয় কি তার রূপ যৌবন অশ্রুজল? যক্ষিণী রয়েছে, বিরহ বিধুর যক্ষ কোথায়?

কান্না আছে, সান্ত্বনা কই ? গাঢ় লিপ্সা আছে, অথচ ঘন চুম্বন কই ? এ কাব্য কি মেঘদূতের চেয়েও সকরুণ কাব্য নয় ? এযে এক বিরাট অবিচারের নিষ্ঠুর ব্যংগ কাব্য। তার বুক ভেঙে যেতে চায়। সে পিতার দিকে চেয়ে থাকে অসহায় দৃষ্টি মেলে।

ব্রজেশ্বরও কাব্যপাঠ রেখে দু ফোঁটা অশ্রুবিসর্জন করেন। নিগূঢ় বিশ্লেষণ করলে তিনিও মেয়ের মতই অসহায়।

কুসুম এবার আরও অধীর হয়ে পড়ে। যক্ষিণী, কবি-কল্পনার নায়িকা কতটুকু হা হুতাশ করেছিল, কুসুম অবশ্য তা জানে না। কিন্তু তার মনে হয়, তার বুকের আকাশে যে অসমতল বন্যা চলেছে তার ভার হয়ত সইতেই পারত না মহাকাব্যের সেই নায়িকা।

পঞ্চী ডাকল, 'কুসুম মাসী।'

'এই তো এলাম, তোর জন্যই একটু দেরী হচ্ছে মা।' কুসুম একখানা শাড়ী হাতে বেরিয়ে এল। 'এখন এখানা পরে চল—পরে নতুন একখানা আনিয়ে দেব।' দশহাত শাড়ীখানা সুন্দর গুছিয়ে-গাছিয়ে পরিয়ে দেয় কুসুম পঞ্চীকে। তারপর আবার ওকে কোলে নিয়ে কুসুম বেরিয়ে পড়ে।

কুসমকে দেখামাত্র পঞ্চীর মা সাদর সম্ভাষণ জানাল বেড়ার আবডালে বসেই। মুখ একটু দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। মনে হল সে তার শয্যায়ই বসে রয়েছে পঞ্চীর খোকা ভাইটিকে কোলে নিয়ে।

'পঞ্চী দে দে কুসম বোনকে বসতে দে। ধোয়া পিড়িখানা একটু আঁচল দিয়ে পুছে দে। ওমা, তুই যে কোলে চড়ে! ধিংগি মেয়ের হল হল কি ?'

'কিছু হয়নি ! তুমিই একটু দিলে পার। এখনও কি গায় পোড়া সূতিকের জ্বর আছে নাকি ? আমি থাকতে ও-জ্বর তোমার আর ছাড়বে না।'

'সাধে তোকে উঠতে বসতে ঠ্যাঙাই ! বোন, মুখ শোনো মেয়ের।

ও মুখে ভাতের বদলে ছাই না দিয়ে উপায় আছে?' সহসা সেই কংকালের মত মুখের চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। পঞ্চীর মা একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। 'পঞ্চী, মা তুই এ কাপড় পেলি কোথায়? কে দিলে তোকে? নষ্ট হয়ে যাবে, ছিঁড়ে ফেলবি। শীগ্‌গির খুলে রাখ। তোর পরণের কাপড়খানা কই?'

'দেখেছ দেখেছ মাসী, মার হিংসে!'

কুসুম পঞ্চীর মার দিকে একবার চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। সত্যই তারা কোন্ যুগে বাস করছে! পঞ্চীর মা প্রায় বিবস্ত্রা।

পঞ্চীকে কোল থেকে নামিয়ে কুসুম একটু কি জানি ভাবল। তারপর হন্‌হন্ করে হেঁটে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

কুসুম চলে যেতেই পঞ্চীর মা যেন পাগলিনীর মত করতে লাগল। পঞ্চী যত কথাই বলে তার কানে যায় না। গেলেও পঞ্চীর মা তার অর্থ করে ভিন্ন রকম। রোগে ভুগে ভুগে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রী বোধ হয় শুকিয়ে গিয়েছিল। তার ওপর এ আঘাত একেবারেই অসহ্য। সিংহীর আওতা থেকে কেউ যদি শিকার ছিনিয়ে নেয়, তা হলে ক্ষুধার্তা সিংহী যেমন করে পঞ্চীর মাও ঠিক তেমন করতে লাগল। উপোসী পঞ্চী ভয়ে, লজ্জায় চুপ করে রইল। ছিঃ ছিঃ কুসুম মাসী ওদের কত ছোট ভেবে গেছে। যদি ঘটনা চক্রে ফিরে আসে তবে আরও কত হীন ভাববে! সে যেন শক্তিহীন হয়ে নির্জীবভাবে রইল। তার মা হঠাৎ টান মেরে খুলে নিল পরণের শাড়ীখানা। সে একখানা ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে কেবলই অতি করুণস্বরে বলতে লাগল, 'মা আমায় মেরে ফেল, নইলে তুমি চুপ কর। মা চুপ কর গো।'

কবি-বান্ধবী কুসুম ঘণ্টাখানেক কি দেড় ঘণ্টা বাদে একটা আলো হাতে একা একাই ফিরে আসে। তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। তবে চাঁদের আভাস যেন দেখা যাচ্ছে পূর্ব দিকের উঁচু গাছটার ফাঁকে।

কুসুমের সাড়া পেয়ে পঞ্চী উঠে বসল। তার মা তাড়াতাড়ি শাড়ীখানা তার গায়ের ওপর ফেলে দিল।

'এখনও তোরা প্রদীপ জ্বালিসনি।' কুসুমের মুখ চোখে একটা দিব্য জ্যোতি ভাসছে। সে দুজোড়া শাড়ী হাটখোলা থেকে আনিয়েছে। তার নিজের হাতে টাকা ছিল না। এক বর্গাদারকে পাঠিয়েছিল। সে-ই ধার দিয়েছে। তাই যা কিছু বিলম্ব। দাম অনেক। সে কথা আর কুসুম প্রকাশ করল না।

মা ও মেয়ের মুখে যে মেঘের ঘন ছায়া ছিল, কুসুম সেদিকে আর নজর দিতে পারল না। সে নিজের মনের আনন্দে খেতে চাইল। 'পঞ্চী তুই আমার সংগে বসে খাবি। কই একটু তাড়াতাড়ি কর দিকি।'

অগত্যা পঞ্চীর মাকেও অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। নিরুপায় হয়ে পরতে হয় কোরা শাড়ী। রুগ্ন হলেও নববস্ত্র পরিহিতা পঞ্চীর মাকে লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিতই দেখাচ্ছে। সে পরিবেশনও আপ্যায়ন করতে জানে চমৎকার। এ গুণগুলি তার একটু আগে কোথায় লুকিয়েছিল!

নিমন্ত্রণের পিছনে একটা সজ্ঞান ছলনা ছিল। তা যখন বিনা চেষ্টায় সত্যে রূপান্তরিত হল তখন পঞ্চীর মাও সপ্রতিভ এবং লজ্জিত না হয়ে পারল না।

কুসুম খেয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি পঞ্চীকে সংগে নিয়ে যেতে চাই, রাত্তিরে একা একা থাকব। তোমরা কি ওকে ছেড়ে দিলে অসুবিধা হবে? ভাশুর ঠাকুর কখন আসবেন!'

পঞ্চীর মা আর জবাব দিতে পারে না। এই সামান্য মাত্র অনুরোধ?

পঞ্চী বলে, 'একটু বাদেই বাবা আসবে।' বলতে বলতেই পঞ্চীর পিতার পদ শব্দ শোনা যায়।

ওরা নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় নিঃশব্দে।

আকাশে জ্যোৎস্নার ঢল এসেছে। চতুর্দিক ভেসে যাচ্ছে প্লাবনে।

'ওকি পঞ্চীর মা, তুমি কি আজও ঝগড়া করেছ মেয়ের সংগে?'

কোনও উত্তর না দিয়ে পঞ্চীর মা দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

বত্রিশ

ক্রমে ক্রমে পঞ্চীই কুসুমের নিত্য সংগিনী হয়ে দাঁড়ায়। সময় সময় যখন অতি পরিপক্ক কথা বলে তখন মনে পড়ে হেনাকে। কিন্তু কথার ঝংকারে, দুষ্টু বুদ্ধিতে ঠিক শ্মশানের জীবটিকেই চেনা যায়। তবু পঞ্চী কুসুমের মনের ভিতর নিত্য নতুন দাগ কেটে বসে। চলে যায় একেবারে গভীর প্রদেশ পর্যন্ত।

শালগ্রামশিলা অন্য বাড়ী ছিল। একজন পুরোহিত দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তা কুসুম আবার স্বগৃহে এনে যথাবিহিত প্রতিষ্ঠা করল। সেই উপলক্ষে কিছু খরচও হয়ে গেল কুসুমের।

সেই দেখাদেখি পঞ্চীও এনে প্রতিষ্ঠা করল একটা কুকুর ছানা। ওটার স্বর্গতা মা নাকি এই বাড়ীরই পাহারায় নিযুক্ত ছিল। তারপর এল একটা বিড়াল শাবক। ওটার মাও নাকি এই বাড়ীরই মূষিক খেয়ে মানুষ।

কুসুম হাসল।

পঞ্চী বলল, 'তুমি হেস না মাসী—ওদের যত্ন করো, নইলে শাপ মুন্নি দেবে। অবলা জীব! আমি একটা গরুও আনব ঠিক করেছি।'

শংকিত কণ্ঠে কুসুম প্রশ্ন করে, 'কোত্থেকে?' একটা গরুর দাম তো কম নয়। আবার চুরি করে আনবে নাকি? কিন্তু ওর পক্ষে তো তা

সম্ভব নয়। এ পেয়ারা কিংবা কৈ মাছ নয় যে পঞ্চীর সাহস হবে অনায়াসে সংগ্রহ করতে। 'কোত্থেকে আনবি গরু?'

'একটা শ্রাদ্ধের বাছুর কিনে আনব কোনও অগ্রদানীর কাছ থেকে। গরু একটা না থাকলে কি গেরস্থ বাড়ী বলে মনে হয়! তুমি বেশী না, দুটো টাকা চালিয়ে দিও। কেবল পো-টাক দুধ দিও, আমার খোকা ভাইটি খাবে। দেখ না মার মেজাজ; দুধ খেতে চাইলেই কেবল ভাইটিকে মারে।'

'এতটুকু একটা বাছুরের কি করে দুধ হবে রে পঞ্চী?'

'আনা মাত্র কি হয়। তিন চার বছর পালতে হবে, তবেই না আশা। নইলে একটা বাছুর শুদ্ধ গরুর দাম কত? ওমা সেকি আমরা কিনতে পারি? তা পারেন পালবাবুরা।'

কুসুম পঞ্চীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কতক কথা তার কানে আসে, কতক হয়ত আসে না। কি নেই এ শ্মশানের বাসিন্দাটির! আশা, আকাংখা, মায়া, মমতা এবং কার্যদক্ষতা। সকলই রয়েছে অথচ দীনতার গহ্বরে পড়ে পচে মরছে।

'ওকি তুমি দেখি হাঁ করে রয়েছ। আমার কথা বুঝি ভাল লাগছে না? টাকা তো মাত্তর দুটি। তুমি বড় শক্ত মাসী—মায়ের তো বোন।'

'তোকে যদি একটা বাছুর শুদ্ধ গরু কিনে দিই!'

ভাষা পায় না পঞ্চী। সহজে আত্মহারা হয়ে বলে, 'তা হলে আমি তোমার চাকরানী হয়ে থাকি। খোকা ভাইটাকে কোলে নিয়ে গরুর দড়ি ধরে নিত্যি যাব মাঠে। তাই, তাই, তাই......পঞ্চী হাত তালি দিতে দিতে বলে, 'আমার ইচ্ছা করছে আনন্দে মরে যাই মাসী, মরে যাই।'

'ছিঃ ও কথা কি বলতে আছে!' কুসুম পঞ্চীর চিবুক স্পর্শ করে চুমো খায়।

সংসার করে কুসুম সুখ পায়নি, প্রেমেও তার কখনও মন তৃপ্ত হয়নি—অথচ আজ সামান্য মাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি যে আনন্দ পেল কুসুম! এ আনন্দের জন্ম অবশ্য ব্যথার মৃত্তিকায়, তবু যা সে পেল তাকে অস্বীকার করা চলে না। যার যা নেই, তাকে তা দাও; যার যেটুকু অভাব তা পূর্ণ কর—এই সাম্যের আদর্শের চেয়ে আর বড় আদর্শ কি আছে জগতে? বিলিয়ে দেওয়ার কথা নয়, বণ্টনের কথাই শেষ পর্যন্ত ভাবে কুসুম। ভাবে কবির হৃদয় নিয়ে। জগতটাকে দেখে পরিষ্কার দৃষ্টিতে।

কবিকে কুসুম ছেড়ে এসেছে, কিন্তু মর্মকোষ যে মধুর মত তার ব্যথার রাগিনীতে ভরে রয়েছে! তাই কুসুম যা ভাবে, যা দেখে তা কবির মতই হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদে দূরত্বই মাত্র বেড়েছে, কিন্তু পোড়া মন থেকে পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি।

কুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘরে যায়। সন্ধ্যার পর প্রদীপ জ্বালায় উজ্জ্বল করে। কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে।

'কার কাছে চিঠি লিখছ?'

'তোর মেসোর কাছে।'

'কেন, টাকার জন্য বুঝি? এই না সে দিন টাকা এল তোমার? কুসুম একটু লজ্জিত হয়। সত্যই পণ্ডিতের সংগে সম্পর্কটা তার অদ্ভুত। পঞ্চীর চোখেও তা যেন ধরা পড়ে গেছে।

'টাকা না এলে গরু কিনব কি করে?' কুসুম লিখতে লিখতে বলে, 'টাকা নইলে এমন যে বাপ মার শ্রাদ্ধ তা-ও পণ্ড হয় লো।'

'তা জানি মাসী তবু...'

চিঠি পত্র সময় মত কলকাতা পৌছায়। টাকা আসে অনুমানের চেয়ে কিছু বেশী। লেখা থাকে, হিসেব করে খরচ করো।

গরু কিনতে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। পঞ্চী গরু দেখে সেদিন

আর বাড়ী যাওয়ারই অবকাশ পায় না। কত তার কাজ! দড়ি খুঁটো, ডাবা অনেক কিছুই সংগ্রহ করতে হয়। বাছুরটা আবার ছুটতে ছুটতে পুকুরে গিয়ে না পড়ে। মহা উদ্বেগ।

'মাসী একটু যাও না ওটার পিছু পিছু।'

কুসুম মনে মনে হাসে। হ্যাঁ তার পক্ষেই সম্ভব বটে!

সপ্তাহ খানেক গত হয়ে যায়। কুসুম দুধ অল্পই রাখে—বেশীর ভাগটাই পক্ষীর খোকা ভাইটির জন্য দিয়ে দেয়। মনে মনে ভাবে পক্ষীর মাও একটু থাক—যদি ওর শরীরটা একটু সারে।

এইবার পক্ষী আর ফুলগাছ, পেয়ারা গাছ করতে পারবে না। ওর বন্ধন হয়েছে শক্ত···

কিন্তু কুসুমও তো জড়িয়ে পড়েছ ক্রমান্বয়ে। দেবীপুরের জন্য কি তার মোহ? তবু সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করে চলেছে একটার পর একটা শৃংখল। যদি আবার কোথায়ও চলে যেতে হয় ঐ বিড়াল ছানাটা পর্যন্ত বেড়ির মত জড়িয়ে ধরবে তাকে। কিন্তু কুসুম কোথায় যাবে? জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাকে এইখানেই চিত্ত সমাহিত রেখে থাকতে হবে। কনক-পুরের সংগে তো সে একটা বোঝা পড়া সাংগ করেই এসেছে।

কুসুমের ইচ্ছা মত কিন্তু কিছুই সাংগ হয় না। শেষের থেকে আবার সুরু হয় নতুন কথা। মলিনা পত্র লেখে, কুসুম জবাব দেয়। হেনাও তার মনের কথা পিসীর কাছে লিখে উত্তর আদায় করে নেয়। শুধু কিছু লেখে না কবি। কিন্তু সে কিছু না লিখেও যে ছবি ফেলে তা কুসুমের কাছে অসহনীয়। তবু তাকে বাধ্য হয়ে সহ্য করে থাকতে হয়।

বুড়ো রতন এসে বলে, 'মা বিচালী কোথা রাখব? গোয়াল ঘরের এক পাশে, না বাইরে উঠানে।'

পক্ষী এসে স্থান নির্দ্দিষ্ট করে দেয়। কারণ ও-দায়িত্বের আসল বোঝা ওরই মাথায় চাপান।

কুসুম যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। অন্তত মলিনা কিংবা হেনার পত্র এলে তিন চার দিন তার এমনি কাটে।

'রতনমামা, বাড়ীতে গোঁসাই এল আর দুটো ফুলগাছ আর ক'টা ভাল কলা-চারা এনে দিলে না ? বাড়ীর ফুল, কলা, জমির ধানের আতপ চালের নৈবেদ্য, তবেই না ঠাকুর তুষ্ট হবেন! দুধের মামা অভাব হবে না আর—নিত্য স্নান করতে পা'রবেন ঠাকুর। তুমি কেবল ঐ দুটো জিনিষ জোগাড় করে দাও। আজ বিকেলেই, কি বল ?'

রতন একজন গ্রাম্য মজুর। ত্রিসংসারে তার কেউ নেই। তাই সে সকলের কাছেই সমাদর পায়। তার চাহিদাও অন্যের তুলনায় অনেক কম। প্রয়োজন কম বলেই তার পক্ষে বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভব হয়েছে।

'কেন, মিতা দিয়ে যায়নি ? তাকে তো বলেছিলাম ফুল গাছ আর কলা চারা কটা জোগাড় করে রুয়ে দিয়ে যেতে।'

'কে তোমার মিতা মামা—রোত্তম্ ? ওর কথা বল না—যে কুঁড়ে ?

'ওকে অপবাদ দেওয়া মিছে। হয়ত সময়ই পায়নি। অতগুলো খাইয়ে, একলা খাটিয়ে। আর এ বাড়ীর এই সামান্য কাজে তো পয়সা নেবে না ও।'

'সেই জন্য বুঝি দেরী করবে ? ভাল তো পরের উপকারী !'

কুসুম আর নিস্পৃহ থাকতে পারে না। বলে; 'থাম পক্ষী।'

রতন ও রোত্তমের পাশাপাশি বাস। দুজনেই পণ্ডিতের একটা খেবটের অধীন প্রজা। সমান অংশে ভাগ করে খায় অন্নাসন। রতনের বাপের সংগে রোত্তমের পিতার ধর্মকুটুম্বিতা ছিল। তারই মধুর পরিণতিতে এই অদ্ভুত জমার সৃষ্টি। দু বাড়ীর মাঝখানে একটা

শুধু পাতাবাহারের বেড়া। কিন্তু মনের মাঝখানে এ সামান্য বেড়ার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রতন বলতে রোস্তম অজ্ঞান। রোস্তম বলতে রতন।

রতনের পিতাকে অনেকে বলেছিল, খাল কেটে কুমীর এন না। পরে দেখা গেল যারা এল তারা মানুষের মতই মানুষ। তখন রোস্তমের বয়স কত আর? উনিশ কি কুড়ি। সে অতি সহজেই দখল করে নিল সবায়ের হৃদয়। হিন্দুর শ্মশানে রোস্তম না হলে এখন আর কাঠ চেরবার তেমন শক্তিমান লোক নেই।

রোস্তম খানিকটা জমি বর্গা চাষ করে পণ্ডিতের। সময় মত ফসল কেটে নিজের ঘরেই তোলে। পণ্ডিত যখন বাড়ী আসে তখন হিসাব বুঝিয়ে দেয় কড়ায় গণ্ডায়। তাকে কটাক্ষ করা পঞ্চীর মোটেই শোভা পায় না। সেই জন্যই কুসুম থামতে বলে পঞ্চীকে। যে মুখরা মেয়ে!

বিকেল নাগাদ ফুল গাছ এল। দু' চারটে কুঁড়ি ধরেছে তাতে। শিকড় বোঝাই মাটি। তেমনি কয়েকটা কলা চারাও এসে পৌছাল। তখন তখনই লাগানও হয়ে গেল নির্দিষ্ট স্থানে।

পঞ্চী ভাল করে জল ঢালল। পরের দিন সকালবেলাই ফুল হয়ে ফুটে উঠল বড় বড় কুঁড়িগুলো।

'দেখলে মাসী জিভের তেজ!'

'দাঁড়া কেটে দিচ্ছি ডগাটা বঁটি এনে।'

দুজনেই হাসে।

অবহেলা ও অশ্রদ্ধার সংসার। তবু বাড়ে ক্রমে ক্রমে।

বিড়ালটা কুসুমের কোলে এসে ওঠে।

কুকুরটা লেজ নাড়ায়।

ছোট্ট বাছুরটা অবোধের মত খানিক চেয়ে থেকেই ছুটে পালায় বন বন করে।

আর পঞ্চীর খোকা ভাইটি? বারবার দেখিয়ে দেয় কচি আংগুল দিয়ে গরুর দুধ ভরা ওলানটা—'উয়ো দিদি।'

কুসুম কখনও হর্ষে কখন বিষাদে চেয়ে থাকে। একটা একটা করে অনেকগুলো দিন কেটে যায়।

তেত্রিশ

নিত্য নতুন ঘটনা তেমন কিছু ঘটে না। ইচ্ছায় হক অনিচ্ছায় হক পঞ্চীও দেবীপুরের সংসারের পরিবেশের মধ্যে কুসুম নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। ধীরে ধীরে তার মায়া প'ড়ে আসে সকলের ওপর। সরস, উবর মাটি যেমন বন্ধ্যা থাকতে পারে না, তেমনি শূন্য পড়ে থাকতে পারে না কুসুমের মন। রসাল তরু যদি না-ই জন্মাবার সুযোগ পায়, প্রচুর দূর্বা তো গজাবে।

একদিন সংবাদ পেল কুসুম যে পণ্ডিত বাড়ী আসবে। কেন তার এ বুদ্ধি হল? এসে যদি উপস্থিত হয়, কেমন করে কুসুম তাকে স্বীকৃতি দেবে? অথচ দেবীপুর পৌঁছেই তো তার এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল। সে কিনা মগ্ন হয়ে রয়েছে গরু, বাছুর, কুকুর নিয়ে! সেই টিকি, সেই কদম-ফুলি চুল, কুসুমকে অস্থির করে তোলে।

সে পঞ্চীকে ডেকে খোঁজে পাঠায়।

'যা, হরেন ঠাকুরপোকে জিগ্যেস করে আয় খবরটা সত্যি কিনা? সে কাল নাকি কলকাতা থেকে এসেছে।'

পঞ্চী চলে গেল।

কুসুম লক্ষ রকম চিন্তা নিয়ে দাওয়ায় বসে রইল। যখন ভাবতে ভাবতে তার মাথা অস্থির করে এল, সে গেল রান্না করতে। নিজে

অজ্ঞাতেই সে অনেক খানি কুটনা কুটল। মাছের ঝোলের জন্য মসলা বাটল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এখনও পক্ষীটা আসছে না কেন? মেয়েটা নিতান্তই অবাধ্য। গেছে বুঝি আবার আর একদিকে চলে। কুসুমের জীবনের একটা সমস্যা বহুল পরিস্থিতি। এমন সময় এ রকম কি কেউ করে? পক্ষীটাকে বলে লাভ কি? ও কি করে বুঝবে এর গুরুত্ব? যে নিজে ভুক্তভোগী, বলতে গেলে সেই সব বুঝে উঠতে পারেনি। অথচ কুসুম ভেবেছে কি কম! মাথাটা তার পচে গেল, জীবন হয়ে উঠল দুর্বহ। মনের ভিতর একটা ভীতি নিয়ে কুসুম সময় কাটাতে লাগল।

পক্ষী ফিরে এসে শ্মশানোচিত জীবের মত অংগ ভংগি করে বলল, 'যার জন্যে এত আশা, সে গুড়ে বালি।'

তবে কি পণ্ডিত আসবে না? পক্ষীর অমন মুখখানা ও দুধ দিয়ে ধোয়াতে ইচ্ছা করে কুসুমের।

'হরেন ঠাকুরপোর সংগে দেখা হল?'

'না। অনেকক্ষণ বসে রইলাম—সে যেন কোথায় বেরিয়েছে কিসের খোঁজে।'

'তুই তো বসে থাকারই মেয়ে।'

'সত্যি পিসী উঠানের ওপাশের করবী ফুলগাছটায় চড়ে বসে বসে ফুলের মধু খাচ্ছিলাম।'

'তাও ভাল যে শেওড়া গাছে উঠিসনি—তাহলে হয়ত এবেলা আর দেখাই পেতাম না।' সমস্যা নিরসন হল না। কুসুম অন্যমনস্কভাবে কাজ করে যেতে লাগল।

বাড়তি রান্না হয়েছিল। পক্ষী খেল, রতনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান হল। সন্ধ্যার একটু আগে এল হরেন।

'কি বৌদি পক্ষীকে কেন পাঠিয়েছিলে ডাকতে?'

'ডাকতে পাঠাইনি। একটা খবর জানতে পাঠিয়েছিলাম। বসবে না? বস ঐ চৌকিখানায়। লক্ষ্মী ঠাকুরঝি বলছিল তুমি নাকি কাল কলকাতা থেকে এসেছ?'

হ্যাঁ। কিন্তু দাদার সংগে তো আমার সাক্ষাৎ হয়নি।'

তবে কি ঠাকুরঝি মিথ্যা কথা বলেছে—উনি নাকি আসছেন?'

'হয়ত ঠাট্টা করেছে। দাদা এলে তুমি নিশ্চয়ই চিঠি পেতে।'

সে পত্রে আর দরকার নেই কুসুমের। লোকে ভাবছে কুসুম খুবই উতলা হয়েছে, কিন্তু সে কথা যে কতদূর মিথ্যা একমাত্র সে-ই জানে। বরঞ্চ এখন তার ভয় হয়েছে। পণ্ডিত এলে সে কি করবে?

হরেন চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল যে সে আবার কলকাতা যাচ্ছে শীগ্‌গিরই। তখন নিশ্চয় দেখা করে আসবে। এবার আর ভুল হবে না।

কুসুম লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল। জবাবে হ্যাঁ কিংবা না, কিছুই বলতে পারল না।

দিনগত হয়ে যেতে লাগল আগের মতই একটি একটি করে।

কুসুম কোথায় যেন গিয়েছে—হয়ত গা ধুতে, নয়ত পক্ষীর মার কাছে —রতন এসে ডাকাডাকি করে না পেয়ে একখানা পত্র রেখে গেল বেড়ায় গুঁজে।

কুসুম সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে আর পত্র পেল না। রাত্রের অন্ধকারে আর বাইরের বেড়ায় নজর পড়ল না। চিঠি পেল সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে। সে চোখে মুখে জল না দিয়েই রতনের খোঁজে গেল। বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'রতন, রতন!'

'আজ্ঞে, মা! তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতর এস না।'

'না আমি এখন আর ভিতরে যাব না। তুমি রোত্তমকে সংগে করে আসবে। হাতে শত কাজ থাকলেও তা ফেলে আসবে। আমার বড্ড দরকার, মনে থাকে যেন।'

কুসুম দ্রুতপায়ে বাড়ী ফিরে এল। আবার একবার পত্রখানা পড়ে দেখল। তারপর চোখ বুলিয়ে নিল বাড়ীটার সারা বুকখানার ওপর দিয়ে। নিতান্তই অবহেলার সংসার—তবু মায়া হচ্ছে ছেড়ে যেতে! কুসুমের পিতা অত্যন্ত অসুস্থ!

রোস্তম এসে জিজ্ঞাসা করে, 'মাঠাকরুণ কি করতে হবে?'

'তোমার নাওখানা কি ভাল আছে?'

'কেন থাকবে না? মাঝে মাঝে তো কেরায় বাই। বলতে গেলে আমার নতুন নাও।'

'আমি কনকপুর যাব।'

'কদ্দিন ধরে একটু একটু পানি নিচ্ছে। নাও মেরামত না করে…'

'তবে আর একখানা জোগাড় করে দাও। তুমি না পার অন্য কারুকে বল। বাবা আমার অসুস্থ।'

'না, না আমি পারবনা কেন, খুব পারব। নাও না থাকলেও তোমায় মাথায় করে মাঠাকরণ দিয়ে আসব। অনেক দিন সোয়ারী না উঠলে অমন একটু আধটু চির খায় তক্তা। কিন্তুক মা এই যে যাচ্ছ আবার কবে ফিরবে? কিন্তুক…'

রতনও এসে দাঁড়িয়েছিল। 'কিন্তুক কিন্তুক করছিস কেন তুই? তোর আমার কিন্তুতে কি দুনিয়াটা চলে? যে ইচ্ছা করে এসেছে সে যদি ইচ্ছা করে না ফেরে তোর আমার কি কোনও জোর খাটে? কত তো জোর করলাম, একটাও কি বাঁচল, না ফিরল?'

কুসুম বলল, 'আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব রতন, বাবা একটু সুস্থ হলে আর দেরী করব না। ততদিন তুমি একটু বাড়ী ঘরটা দেখা-শুনা ক'রো।'

'যাওয়ার সময় ও কথা সবাই বলে। মিছেমিছি দুদিনের জন্য এত হৈচৈ না করাই ভাল ছিল। যাক মা, এখন কি করতে হবে তা বল।'

'ঐ তো বললাম, ঘর-দোর তোমার ওপর রইল। আমি যাব আর আসব।'

'চুপ কর মা, পারলে একটু তামাক দাও।'

কুসুম তামাক ও আগুন এনে দিল। রতন সাজতে বসল। এত ভাঙন সে দেখল, তবু কেন জানি, তার বুকের পাটাটা শক্ত হল না।

ধীরে ধীরে রতনকে ধৈর্য ধরতে হয়। সব ব্যবস্থার ভার নিতে হয় তাকে। কুসুমের সংগে রতন ও রোস্তম যাবে। রোস্তম মাঝি, রতন চলনদার। মোট কথা দেবী বিসর্জনের ভার দুটি বন্ধুর ওপর, যারা এতদিন নিঃশব্দে অর্ঘ্য জুগিয়ে নীরবে করেছে পূজা।

পরদিন যখন কুসুম নৌকায় উঠবে, ঠিক সেই সময় সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে সেই ঘাটে এসে নাও ভিড়াল পণ্ডিত।

পণ্ডিতকে দেখামাত্র দ্রুত মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে কুসুম স্বামীর অলক্ষ্যে রতন ও রোস্তমকে কি যেন বলে বাড়ী এসে উঠল।

পণ্ডিত ওপরে উঠল। রতন এসে পায়ের ধুলো নিল। রোস্তম দূর থেকে জানাল আদাব।

সহাস্য মুখে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ তোমরা? আদাব, রোস্তম আদাব ভাই। কি করছ?'

'নাওখানা রদ্দুরে চির খেয়েছিল দু বন্ধুতে ভাবছি সারব।' রতন চোখ ইসারা করে। রোস্তম বোকা বোকা হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত করতে চেষ্টা পায়।

পণ্ডিত বাড়ীর দিকে চেয়ে অবাক। কোথায় গেল জংগল? তার বদলে ফুলগাছ, কলাগাছ, আঙিনায় সবৎসা গরু। কি বিরাট পরিবর্তন! এতো ভাবাই যায় না। এবার পণ্ডিত মনে মনে তৃপ্তি বোধ না করে পারল না। তার অর্থ ব্যয় সার্থক হয়েছে। অবশেষে নীড় বেঁধেছে কুসুম।

একটু পরিপাটি করে শাড়ী পরা, একটু সুন্দর করে সিঁদুরের ফোঁটা কপালে আঁকা—কুসুম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেন আশ্চর্য হয়ে গেল।

'কখন এলে?

'এই তো, একটু আগে।'

'চিঠি পত্র না দিয়ে যে হঠাৎ আবির্ভাব?

'সময় হল না, বিশেষ জরুরী কাজ।'

'শরীরটা ভাল আছে তো?' বলতে বলতে কুসুম এসে প্রণাম করল। 'এখানেই বস। একটু হাওয়া করি।'

'প্রয়োজন নেই। আমি বরঞ্চ বাড়ীর চারদিকটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসি। ঢের কথা আছে। তুমি কোথায়ও যাচ্ছিলে নাকি? কোনও বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে নাকি? পণ্ডিত গায়ের জামা ও পায়ের জুতা খুলে নেমে গেল। কুসুম গেল রান্নার জোগাড়ে।

কুসুমের সংগে পণ্ডিতের দেখা হয়েছে দৈবক্রমে। খালের স্রোতের যে তোড় এতক্ষণ কুসুম থাকত অনেক দূর। কনকপুর ওর যাওয়ার কথা যখন থেকে রাষ্ট্র হয়েছে তখন থেকেই পক্ষী নিখোঁজ। পক্ষী তার খোকা ভাইটির জন্য আজ দুধ নিতে পর্যন্ত আসেনি। ওদের বাড়ী পাঁচবার ওকি মানুষ পাঠাইনি কুসুম!

পেত্নী মেয়ে যেন কোন্ শ্যাওড়া বনে গিয়ে লুকিয়ে রয়েছে! থাক গে, ওর সংগে আর পারা যায় না। কিন্তু কুসুমের মন সেই অবধিই টনটন করছে।

একটুখানি দেখে শুনে, পণ্ডিত স্নান সেরে এসে খেতে বসল। 'আমি তাড়াতাড়ি চিঠি পত্র না দিয়ে কেন এলাম জান? কনকপুর যাব। শুনলে হয়ত বিশ্বাস করবে না, তোমাদের কবি একটা মেঘাচ্ছন্ন প্রতিভা। তাকে কলকাতা নিতে যেতে হবে। তার উপযুক্ত একটা কাজও ঠিক করেছি

কোনো দৈনিক কাগজের আফিসে। সে একটা কবিতা পাঠিয়েছিল আমার কাছে। পড়ে আমি এবং আমার এক সাহিত্য রসিক বন্ধু আশ্চর্য হয়ে গেছি। সে কবিতাটা প্রকাশিত হয়েছে একখানা মাসিক পত্রে। দেখো অল্পদিনের মধ্যে সে বাঙলা সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করবে। কবি যাতে কলকাতা যায় সে বন্দোবস্তের ভার তোমাকে নিতে হবে।' পণ্ডিত মাথা নীচু করে আহার করে যাচ্ছিল। কুসুমের মুখের দিকে তার তাকাবার অবকাশ হয়নি। কুসুম জেগে আছে, না স্বপ্নে কথা শুনছে তা-ও বলা কঠিন। তার হাত কেঁপে খানিকটা ডাল পড়ে গেল মেঝেতে।

কুসুম অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় জিভ কাটল।

পণ্ডিত বলল, 'থাক থাক—আহারান্তে স্নান করে ফেলব'খন। বিধাতা আমাদের কোন গুণই দেননি। যদি একটি গুণবানকেও মানুষের সভায় তুলে ধরতে পারি!'আবার পণ্ডিত আহার করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকি তুমি যে কিছু বলছ না?' পণ্ডিত মুখ তুলে কুসুমের মুখের দিকে তাকাল। তার চোখ মুখ থমথম করছে। সবিস্ময়ে পণ্ডিত প্রশ্ন করল, 'ওকি!'

'বাবা অসুস্থ। কাল পত্র এসেছে—আমিও কনকপুর যাব।'

'কবে যেতে চাও?'

'আজই।'

'ভাল।'

বাঁধা ঘরে একদিনও পণ্ডিত বাস করতে পারল না। কর্তব্যের দায়িত্ব উপলব্ধি করে অসময়েই পণ্ডিতকে রওনা হতে হয় কুসুমের সংগে।

নৌকায় চড়ার পূর্বে কুসুম চিন্তা করে দেখল, যাওয়াটা এখন তার সুনির্দিষ্ট, কিন্তু ফেরাটা অনিশ্চিত। কত রকম বিঘ্ন হতে পারে। সে

রতনকে দিয়ে গরু বাছুর পক্ষীদের বাড়ী পাঠিয়ে দিল। কুসুম না ফেরা পর্যন্ত ওর যাবতীয় স্বত্ব পক্ষীর এবং তার খোকা ভাইটির।

এত বড় যৌতুক পেয়েও কেন জানি অকৃতজ্ঞ পক্ষী এসে আর দেখা করল না।

'পক্ষী কোথায় রতন?'

'সেই যে সকালে না খেয়ে কোথায় বেরিয়েছে—কেউ জানে না।'

শুধু কুসুমের তাড়না, শুধু কুসুমের বাড়াবাড়ি। যার যা স্বভাব তা মরলেও যায় না। পড়ন্ত বেলার উত্তাপে, চলন্ত নায়ে বসে কুসুম যেন একটি প্রেত কন্যার একটানা করুণ সুর শুনতে পেল নদী তটের গাছপালার ভিতরের ঝিঁঝিঁর ডাকে।

সেদিন অত্যন্ত গরম পড়েছিল, বিকাল বেলা মেঘ করে এল এবং রাত্রে ঝড় জলের ভিতর কবির সংগে আকস্মিক সাক্ষাৎ।

চৌত্রিশ

তখনও জল ঝরছে অবিশ্রান্ত ধারায়। কবিকে সযত্নে নৌকার ওপর টেনে তোলা হল। নায়ের ঝাঁপটা টেনে দিয়ে একটা আলো জ্বালতে চেষ্টা করল রোস্তম। দেশলাইটার বারুদ ভিজা। সহজে আগুন জ্বলতে চায় না। কুসুম ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মানুষটা কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে? বেঁচে আছে তো? কুসুম অন্ধকারে আন্দাজে কবির বুকে হাত দিল।

লম্ফ জ্বলল। হ্যারিকেনও একটা জ্বালান হ'ল তাড়াতাড়ি।

কুসুম অনুভব করেছে কবির হৃদ্‌স্পন্দন হচ্ছে। তা হলে মানুষটা জীবিতই আছে। কিছু বিসদৃশ ঠেকলেও কুসুম নিজের গায়ের চাদর-

খানা দ্রুত জড়িয়ে দেয় কবির দেহে। ভিজা কাপড় মুক্ত করে পণ্ডিত তাকে শুকনা ধুতি পরিয়েছে একটু আগে। কুসুম এবার শুইয়ে দেয় তার নিজের শয্যায়। মাথার নীচে টেনে দেয় নিজের বালিশটা।

কিছুক্ষণ পরে বোঝা যায় কবির অত্যন্ত জ্বর হয়েছে। সে প্রলাপ বকছে অবোধ্য।

ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, আকাশের যে অবস্থা তাতে এখনই এ আশ্রয় ত্যাগ করেও যাওয়ার উপায় নেই। কেউ কোনও কথা বলে না। চুপ করে কান পেতে বৃষ্টির শব্দ শোনে। আর মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে ওঠে বিদ্যুৎ ঝলকে। বড় নদীর আস্ফালনের কথা তো ভাবাই যায় না। কানে যে গর্জানি আসে তাতে বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু মানুষ কতক্ষণ আর চুপ করে থাকতে পারে।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করে, 'কি বোঝ কুসুম, জল কখন থামবে ?'

স্বপ্নোত্থিতের মত কুসুম জবাব দেয়, 'আমি স্ত্রীলোক, আমি কি বলতে পারি ! বরং রোস্তমকে জিজ্ঞাসা কর।'

'রোস্তম ?'

'রাত্তিরটা এমনি কাটবে। ভোর নাগাদ খোদার মর্জি হলে পানি থামতে পারে। ঘন বর্ষা অনেকক্ষণ থাকলে দুনিয়াদারি যে পয়মাল হয়ে যাবে। খোদার তা ইচ্ছে নয় কত্তা।'

'কিন্তু কখন কনকপুর পৌছন যাবে, কতক্ষণেই বা চিকিৎসা পত্রের বন্দোবস্ত ?'

'সে-ও খোদার হাত।'

'তা বই কি ! উপায় যখন সাধ্যায়ত্ত নয় তখন ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে থাকাই শ্রেয়।'

আরও দু চারটা কথা হয়। কুসুমও কিছু বলে না। কবি কি করে এখানে এল, তা জেনে লাভ নেই, কিন্তু সকলের মনেই

চরম কৌতূহল জাগ্রত হয়। নিজেরা নানা রকম প্রশ্ন তুলে, নিজেরাই উত্তর যোগাতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত সবটাই রহস্যাবৃত হয়ে থাকে।

রোস্তম বলে, 'মা সব দাওয়াইয়ের মূল দাওয়াই জল-চিকিচ্ছা—ইচ্ছে মত খেতে দাও। দেখো সকাল নাগাত ভাল হয়ে উঠবে। আমাদের অসুখ হলে কি হামেশা ডাক্তার বদ্দি জোটে? কেবল চোঁ চোঁ করে পানি খাই।'

জলে প্রাণদায়িনী। কথাটা একেবারে খণ্ডিত ও কুসুম অস্বীকার করে উড়িয়ে দিতে পারে না।

সেবার নাকি একটা গরুর ভয়ানক জ্বর হয়েছিল, তার জন্যও নাকি ঐ ব্যবস্থা করেই সুফল পেয়েছিল রোস্তম।

এবার উদাহরণটা খুব ভাল লাগে না কুসুমের কাছে। কিন্তু গরীব রোস্তমের আন্তরিকতাটুকু সে উপলব্ধি করে মনে প্রাণে। অসহায় মানুষের এ ছাড়া গত্যন্তরই বা কি আছে!

স্বল্প পরিসর জায়গা। তার ভিতর স্বামী স্ত্রী ব্যতীত একজন ভিন্ন পংক্তির, ভিন্ন জাতির লোক। অপর যে সে পীড়িত। কুসুমের অনেক অসুবিধা হচ্ছে, তবু সে কবির মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। পথশ্রমে কাতর পণ্ডিতের ঝিমুনি এসেছে। রোস্তম মাঝে মাঝে ঢুলছে আর হাই তুলছে। স্থান নেই যে শ্রান্ত বাহু দুখানাও প্রসারিত করে একটু আড় ভেঙে নেবে। বাইরে শোনা যাচ্ছে জল ও ঝাপ্টা বাতাসে গাছ পালার আর্তরোল।

'ছোটদি!'

'কাকে ডাকছ কবি? আমি কে বলত? চিনতে পারছ না?'

চোখ বিস্ফারিত করে কবি।

'আমি কুসুম।'

একটু ব্যংগ হাসি খেলে যায় কবির মুখে। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না সে।

কুসুমের মনটা অকারণে পুড়ে ওঠে। রোগীর ভুল ভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত জেনে শুনেও সে মনের আগুন চাপা দিতে পারে না। সে অবার বলে, 'ভাল করে চেয়ে দেখত আমাকে চিনতে পার কি না? আমি ছোটদি নই কুসুম। পণ্ডিত না থাকলে সে হয়ত নিঃসংকোচে বলেই ফেলত, তোমার কুসুম।

পণ্ডিত চোখ বুজে রয়েছে। কবি একটু হেসে ফের চোখ মেলে কি যেন দেখল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। অতি কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল—

ক্ষুধাকে তোমরা বে আইনি করেছ
শিকলে বেঁধেছ রুটির মুঠি···

উঃ কী নিষ্ঠুর! কী নির্মম!'

বহুজ্ঞানী সনাতন পন্থী পণ্ডিতের তন্দ্রা ভেঙে গেল। দরদী কুসুম কবির মুখে কাছে এগিয়ে এল। তেমন কিছু না বুঝে-সুজে ও একটা বৈঠা শক্ত করে চেপে ধরল রোত্তম। পণ্ডিত থাকার দরুণ নিষ্প্রয়োজন বোধে রতন সংগে আসেনি। সে থাকলে যে কি করত বলা যায় না।

'এই কবিতাই কবি লিখে পাঠিয়েছিল—ক্ষুধার বিস্ফোরণ। সারা সাহিত্যের গতানুগতিক কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি এই একটা কবিতায়ই চমকে উঠেছে। তোমাকে বোঝাতে পারছিনে কুসুম, আমার তো ভাষা নেই। যখন কাল বৈশাখী দেখা দেয়, তখন ঝড়ো কোণে এক বিন্দু কালো মেঘই যথেষ্ট।'

এত কথা এক সংগে কোন দিনই কুসুম স্বামীকে বলতে শোনেনি। সে জানত সে একাই বুঝি কবির প্রতিভার মরমী সমঝদার। কিন্তু না, সব চেয়ে থাকে সে অরসিক ভেবেছিল, সেই তো রসিক শ্রেষ্ঠ! এ

কথা দুঃখের হতে পারে, কিছুটা হিংসারও হতে পারে—তবু আজ শ্রদ্ধা জন্মায় পণ্ডিতের ওপর। কুসুম কবিকে তার অন্তরে রেখে পূজ্য করেছে, আর পণ্ডিত দিতে চাচ্ছে তাকে বিশ্বের দরবারে পূজনীয় করে।

আবার কিছু সময় গত হয়। ভাঁটার টানে খালের জল একটু কমতে না কমতেই পুনরায় জোয়ার আসে। জল ফুলে ওঠে। বর্ষা ক্ষান্ত দেওয়ারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

'এমন করে জল বাড়লে কেমন হবে রোস্তম্ ?'

'ভোলার বন্যার কথা শোনেননি—গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—তেমনি হতে পারে। তবু আমরা তো নায়ে আছি, কিন্তু যারা কূলে আছে, তারা এক ধাক্কাতেই কাবার।'

এমন দুর্যোগের রাতে, এ অবস্থায় বসে কেউ যে মৃত্যুর কথা নিরুদ্বেগে আলোচনা করতে পারে তা পণ্ডিতের জানা ছিল না। সবিস্ময়ে সে রোস্তমের দিকে তাকায়।

রোস্তম একটু হেসে আর ও দু' একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলে। খবরের কাগজে স্থান না পেলেও সেগুলো যে একটুও ছোট ঘটনা নয় তা কুসুম এবং পণ্ডিত বোঝে অনায়াসে। রোস্তম এতগুলো সংকট পাড়ি দিয়ে এসেছে বলেই সে আজ কারুর জন্য, এমন কি নিজের প্রাণটার জন্যও অধীরতা প্রকাশ করছে না।

সুবিশাল স্টীমার রয়েছে, সমুদ্রগামী জাহাজ রয়েছে, সর্বোপরি মানুষের আয়ত্তে রয়েছে বিজ্ঞান। কিন্তু আজ কতটুকু উপকারে আসছে সে সব এই সভ্যতা বর্জিত দেশে? সমস্ত শক্তির চাইতে, মানুষের যাবতীয় আবিষ্কারের চাইতে গরীয়ান তার মনের শক্তি। সেই ভেলাতেই ভর করে পণ্ডিত একটি মানুষকে নিয়ে বসে থাকে। রুগ্ন কবিকে রাখে যেন তার বুকের আচ্ছাদনের তলায়। জল যেমন গড়ায় তেমনি এই

বিভীষিকাময়ী রাত্রির দণ্ড পলগুলি গড়িয়ে যেতে থাকে চিরন্তনী কাল সমুদ্রের দিকে।

কখন যেন বৃষ্টি থামে। ভোর হয়। দেখা যায় রোস্তম বৈঠা ঠেলছে।

ছোটদির সংগেই কবি কোথায়ও গিয়েছিল। কিন্তু ছোটদিই বা গেলেন কোথায়, আর কবিই বা এখানে এল কি করে? স্বামী স্ত্রীতে বহু জল্পনা কল্পনা হয়। ওরা কিছুই স্থির করতে পারে না। তবে এটুকু ওরা বোঝে যে বিশেষ একটা কিছু ঘটেছে, নইলে প্রলাপের ভিতর ছোটদির কথা ও ঐ কবিতা কিছুতেই জড়িত থাকত না।

বৃষ্টি থামার সংগে সংগেই প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি অনেকটা শান্ত শ্রী ধারণ করল। ক্রমশ জল বৃদ্ধির লক্ষণ গেল পালটে। ভাঁটা এল দুবার বেগে। আকাশের মেঘের সংগে হঠাৎ যেন যোগসূত্র ছিন্ন হল নদীজলের।

রোস্তম বলে, 'খোদার মর্জি হয়েছে, এবার নাও সোঁতা খাল থেকে বড় নদীতে বার করতে পারি।'

'ভয় না থাকলে তা-ই কর। রোগী নিয়ে এভাবে আর বসে থাকা যায় না। কতক্ষণে কনকপুর পৌছন সম্ভব?'

'সোঁতের যে তোড় তাতে দুপুরের আগে ভাগেই আশা করি পৌছে যাব। তবে সবই খোদার ইচ্ছা।'

ধর্মপ্রাণ পণ্ডিতেরও আর এতবার ঈশ্বরের কথা শুনতে ভাল লাগে না। লেবু অনেক কচলালে তেতো হয়ে যায়।

কিন্তু রোস্তমের বিশ্বাস জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অবিশ্বাসে জড়ান কোন বস্তু নয়। লেবুও নয় যে বিস্বাদ হয়ে যাবে। তাই তার আশংকাও নেই বারবার নিংরে ওর অন্তর নিহিত সারাংশটা গ্রহণ করতে।

বেলা বাড়ার সংগে সংগে কবির প্রলাপও বৃদ্ধি হয়। 'ছোটদি, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ কয়েক কোটি বছর এগিয়ে এল। মা ছিল শুল্ক দায়িনী।'…

'কি বলছ কবি, কিছুই তো বুঝতে পারছিনে ?'

কবি অত্যন্ত সজ্ঞান ব্যক্তির মত কুসুমকে হাত ইসারায় কাছে ডেকে নিল। ধীরে ধীরে বলল, 'সেই মাকে ওরা বেশ্যা করেছে। বাধ্য করেছে বেশ্যা হতে।'

'কি যে আবোল তাবোল সব বকছ তুমি। চুপ কর কবি। চুপ করে ঘুমাও দেখি।'

পণ্ডিত বুঝল এ কঠিন সান্নিপাতের লক্ষণ। তবু তার কেন যেন মনে হল, এই প্রলাপের অন্তরালে রয়েছে গভীর অর্থের নিবিড় যোগাযোগ।

পয়ত্রিশ

বাড়ী এসে পৌছান মাত্র একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। ছোটদি আসেন নি, অথচ কবি এসেছে। গাঁয়ের লোক চারদিক থেকে ঘাটে এসে জড়ো হয়। যিনি গেলেন জোটের মহল সায়েস্তা করতে অগ্রণী হয়ে তিনিই তো ফিরে এলেন না। রইলেন কোথায় ? প্রজারা তো আটক করেনি ? শংকায়, কৌতূহলে মানুষগুলো যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কেউ বা এসেছে শ্রেফ মজা দেখতে। কুসুম প্রথমেই তার পিতার খোঁজ নেয়। জানতে পারে যে কয়েক দিন ব্রজেশ্বর জ্বরে ভুগে অন্ন পথ্য করেছেন। আপাতত ভালই আছেন।

সকল ঔৎসুক্য যাকে দিয়ে সমাধান হওয়ার কথা, সে-ই কবি নাকি অসুস্থ। কবিকে নাও থেকে কূলে না তোলা পর্যন্ত একটি লোকও এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তাই ভিড়ও ভাঙে না। চারদিকে কেবল স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকার মুখ ও চোখ। খালের এপার ওপার ঠাশাঠাশি।

তিন চার জনে বহু কষ্টে কবিকে ধরে ওপরে তোলা মাত্র অনেকেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মহা উদ্বিগ্ন হয়ে নিকটে এগিয়ে আসে। প্রশ্ন করে নানা রকম।

'আঘাত কি গুরুতর ?'

'জোটের মহলে না যাওয়াই উচিত ছিল—ছোটদি ?'

'আপনারা বুঝি নদীর চরে, চলতি মুখে লাসের মত পেয়েছেন ?'

'উপুড় হয়ে পড়েছিল, না চিৎ হয়ে ভাসছিল ?'

পণ্ডিত এ সব অবান্তর প্রশ্নের কি যে উত্তর দেবে ভেবে উঠতে পারছিল না।

ঘমাক্ত রোস্তম একটা জবাবেই সকলকে ঠাণ্ডা করে দেয়। 'সরেন তো মশাইরা, জায়গা দেন। উপুড় হয়েও ছিল না, আর চিৎ হয়েও ভাসছিল না, একেবারে দুপাটি দাঁত বের করে হাসছিল। সরেন তো মশাইরা জায়গা দেন।'

'তোমার দেখি মিঞা বড় বড় কথা! চোখ রাঙাচ্ছ কাকে ? জোটের মহল, ভিমরুলের বাসা, কে বলেছিল হাত দিতে ? আমাদের পড়শি, যদি মার খেয়ে থাকে, আঘাতটার কথাও শুধবে না ?' একজন তিরিক্ষি মেজাজী প্রৌঢ় এগিয়ে আসে।

'এত যদি মায়া, ভদ্দরলোকের এই হাতখানা ধরেন তো—ওনার বিষম জ্বর, বাড়ী নিয়ে যান আগে।' বলতে বলতে রোস্তম কবির দক্ষিণ হস্তের সম্পূর্ণ ভারই প্রৌঢ়ের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে না'ও সামলাতে চলে যায়।

ক্রুদ্ধ প্রৌঢ় কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকে।

কবিকে নিয়ে যাওয়ার সংগে সংগে ভিড়ও মিলিয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাদে রোস্তম তামাক সাজে পূর্ণ এক কল্কি।

বাড়ী পৌছাবার পূর্বেই পণ্ডিত এবং কুসুম কবি ও ছোটদির জোটের

মহলে রওনা হওয়ার কাহিনীটা শুনে ফেলে। কেবল জানতে পারে না পরবর্তী রহস্যটা।

প্রায় সংগে সংগেই ছোটদির বজরা এসেও চক্রবর্তী বাড়ীর ঘাটে লাগে। কিন্তু কে তাকাবে ছোটদির মুখের দিকে! তবু কথাটা ছড়িয়ে পড়ে ঢিল-খাওয়া মৌমাছির মত।

কুসুম একবার মাত্র নিজের বাড়ীতে দেখা দিয়ে পিতার কুশল জিজ্ঞাসা করে, সেই যে গিয়ে অজয়ের শিয়রে বসল আর অন্য দিকে কান দেওয়ার তার অবকাশ হল না। মলিনার চেয়েও তার দায়িত্বই যেন বেশী।

নীরব কর্মা মলিনাও যেন স্বস্তি অনুভব করে। বোঝাটানা তাকেই সাজে যে একান্ত মনে গুরুভার বইতে পারে। এ দৈহিক বা মানসিক সামর্থ্যের প্রতিযোগিতা নয়—মলিনা বিনম্র হয়ে থাকে অর্থাভাবের কৃত্রিম চাপে। স্বামীর জীবন মরণ দ্বন্দ্বেও স্ত্রীকে এমনি রইতে হয় দূরে সরে যদি তার মুক্ত হস্তে পয়সা খরচ করবার ক্ষমতা না থাকে।

ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে? নিকটে যে দু একজন মূর্খ বৈদ্য রয়েছে সে যমগুলোকে কুসুমের ডাকতে সাহস হয় না। পাশকরা ডাক্তার আনতে গেলে তো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপার! অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা এসেও পৌছায়, ভিজিটের টাকাও চতুর্গুণ আদায় করে, কিন্তু ততক্ষণ রোগীর নাড়া কফের ঘরে।

অনেক লোক এসেছে, অনেক লোক চলে গেছে—কিন্তু একটি লোক যে কখন এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির ডান হাতখানি ধরে তা কুসুমও লক্ষ্য করেনি। তার অংগুলির প্রকোষ্ঠে কবির জীবন তরংগায়িত হচ্ছে। কফ, পিত্ত বায়ুর নাড়ী যুদ্ধ করছে বহিরাগত জীবাণুর সংগে।

হাত দেখছে গাংগুলী। সচেতন শিল্পী উপলব্ধি করছে ভবিষ্যৎ। তার মুখখানা আশাদীপ্ত হয়ে ওঠে।

হেনা এসে জড়িয়ে ধরে, গাংগুলী কাকা, বাবা বাঁচবে তো?' মায়ার পুত্তলি সকলের অজ্ঞাতে, পিতার প্রিয়তম বন্ধুকে ডেকে এনেছে।

'নিশ্চয়।'

'তবে তুমিই ওষুধ দাও।'

হেনার কণ্ঠস্বরে কবি যেন হাত তুলল। যেন বলতে চায়, ওরে অবোধ চুপ কর, ধৈর্য ধর।

শিল্পীকে কেউ লক্ষ্য করেনি—কারণ বোধ হয় তার পরণের সেই গামছাখানা। বয়স্ক ছেলেটা হয়ত কাপড়খানা পরে বেরিয়েছে, কিন্তু হেনার ডাকে গাংগুলী আর বস্ত্রের জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি। যে ভাবে ছিল সেইভাবেই চলে এসেছে।

শিল্পী বলল, 'কুসুম আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই। যতক্ষণ ডাক্তার কবিরাজ সংগ্রহ না হচ্ছে ততক্ষণ আমিই চিকিৎসা করি। কবির জন্য আমারও একটা দায়িত্ব রয়েছে। তার স্ত্রীর কি মত?'

'এক্ষেত্রে আমার মতামতের কি বিশেষ কোনও কারণ থাকতে পারে? যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের চেয়ে কি আমার জ্ঞান বেশী —না অভিজ্ঞতা বেশী?'

হেনা বলে, 'কাকা আর দেরী কর না, তুমিই ওষুধ দাও।'

অভয়ের চিকিৎসার ভার নিয়ে গাংগুলী বাড়ী ফেরে।

ওষুধ পত্র গুছিয়ে নিয়ে একটু বাদেই ফের উপস্থিত হয়। কিছু কবিরাজী, কিছু ডাক্তারী, কিছু মুষ্টিযোগের সমন্বয়ে কবির চিকিৎসা চলে। গাংগুলীর প্রতিভা শুধু শিল্প কর্মেই আবদ্ধ ছিল না। সে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল চিকিৎসা শাস্ত্রেও। বহু নিঃস্ব, অসহায়ের জীবন মরণ প্রশ্নের তাকে বাধ্য হয়ে উত্তর দিতে হয়েছে

ঐ গামছাখানা পরে। মানবতার আকর্ষণে সে চিকিৎসক হয়েছে—তাই তার তালিকা হয়েছে বনৌষধির—স্বল্পমূল্য, কখনও বা অনায়াস লভ্য।

'ছোটদি একটা জলদ গম্ভীর বাদ্য শুনছেন—?' 'কবি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে থাকে।' শুনতে পাচ্ছেন না গানের গমক? আমি স্পষ্ট শুনছি, ব্রজদাসকে কারা যেন অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করেছে রক্ত চন্দনে।… দাঁড়াও দাঁড়াও থামো থামো। আমিও যাব তোমাদের সংগে।' কবি উঠতে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে। 'দাস এখনও তো লেখা হল না তোমার জীবনী। আমি কি নিয়ে যাব সভা মণ্ডপে?'

কবি চুপ করে। কবির অন্তর বেদনার অংশীদার হ'য়ে গাংগুলী, কুসুম, মলিনা বসে থাকে। হেনা থাকে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে।

সংবাদ পেয়ে রসুল, ডালিমজান এবং পাখীর মা এসেছিল কবিকে দেখতে। তারা থাকে চৌকাঠের ওপাশে স্থির হয়ে। কিছু বলার নেই কারুর কিন্তু ব্যথার ভারে যেন ভেঙে পড়তে চায় ওদের মনের মানদণ্ড-গুলো।

গাংগুলী অনেক চিন্তা করে ওষুধ দেয় একমাত্রা।

কবি আবার যেন কি ভুল বকে। ব্রজদাসের বিষয় বলেই ধারণা হয় সকলের। এবার কথার চেয়ে উত্তেজনাটা প্রবল। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ভিতরে চলে আসে নিজেদের অজ্ঞাতে।

কবি সকলের মুখের দিকে তাকায়। কাতর চোখে খোঁজে যেন কাকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয় বালিশটার এক পাশে।

গাংগুলীর ওষুধে ক্রিয়া হয় কিছু সময়ের মধ্যে।

কবির যেন ঘুম এল। যে যার বাড়ী ফিরে গেল কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে।

কিন্তু পরদিন আবার এল। এমনি ভাবে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। ঊর্ধ্বমুখী রোগ নিম্নমুখী হয়নি—স্থিতিশীল হয়ে আছে। এই না কি যথেষ্ট

শুভ লক্ষণ। পণ্ডিত গাংগুলীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। কুসুম জানিয়েছে অপরিসীম শ্রদ্ধা। মলিনা কিছু জানাতে পারে নি। সে কেবল খেটেছে মেয়েকে নিয়ে। একটু যে কাঁদবে সে সময়ও তার জোটেনি।

কুসুমের সংগে পণ্ডিতের দৈবক্রমে দেখা হয় বাড়ী এসে কুসুম আর কতটুকু সময় দাঁড়ায়!

'এভাবে আমার আর দেরী করে লাভ কি। অতিরিক্ত দু-দুটো দিন ছুটি নিলাম। একটু সুস্থ সবল হলে পত্র লিখো, এসে তোমাদের নিয়ে যাব। সে ছাড়া টাকা পয়সারও দরকার। আমি আগামী কালই যেতে চাই।'

'যদি ভাল মনে কর, তাই যেও, আমি তবে চলি।'

রাত প্রায় প্রহরখানেক অতীত হয়েছে। পণ্ডিত খেয়ে দেয়ে শুতে এসেছিল। কুসুমের সংগে নিরালায় দেখা। আলোটা উজ্জ্বল করে দিয়ে পণ্ডিত বলে, 'এই কদিন সময় হয়নি, কাল তো চলেই যাব—এ জিনিষগুলো এনেছিলাম, যদি তুমি একটু দেখতে।'

'কি? তাড়াতাড়ি দেখাও।'

স্যাটকেশ খুলে কতগুলি মূল্যবান অলংকার বের করে পণ্ডিত।

'এ বাজারে এত সোনা কোথায় পেলে?'

'মার গায়ের গয়নাগুলো ভেঙে তোমার জন্য তৈরী করিয়াছি।'

'এত সোনা ঘরে ছিল!'

'এগুলো যখন গড়ান হয়েছিল তখন বাজার অত্যন্ত সস্তা ছিল কিনা। আর দু এক দিনে তো সংগ্রহ হয়নি, হয়েছে বহুদিন বসে।'

ডায়মণ্ড কাটা নতুন অলংকারগুলো ঝলমল করে উঠল কুসুম হাত দিতেই। তার মর্ম যেন ঝিকমিকিয়ে উঠল কিসের জ্বালায়।

'তুমি একটু প'রে দেখলে সুখী হতাম।'

'বহুদিনের সঞ্চয় দিয়ে বুঝি একদিনেই বাধ্য করতে এসেছ? সে হয় না। আমার গয়না পরার এখন সময় নয়। রেখে দাও, পরে দেখা যাবে।' কুসুম চলে গেল।

পণ্ডিত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্মিত মুখে ধীরে ধীরে বলল, 'তাই দেখো।'

ছত্রিশ

সবে সকাল হয়েছে। গাংগুলী ব্যস্ত সমস্তভাবে কি যেন গোছাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছ এত সকালে? মালতী প্রশ্ন করল।

'ওষুধ। ভাল করে খলে মেড়ে নিয়ে যেতে হবে। কবি মৃত্যুশয্যায়। কদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি চলছে।'

. . 'যম বলছ কাকে? মরণের সে মধুর মূর্তি তুমি তো। কখনও কল্পনা করে দেখনি! যে মজেনি, সে অভাগা তো কিছুই বোঝেনি। আমি তার পায়ের ধ্বনি শুনতে পাই।

মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

'চুপ কর মধুমালতী। বলতে পার খলখানা কোথায়?'

'খল দিয়ে হবে কি, কবিকে শান্তিতে মরতে দাও।'

'পুস্যিগুলি পুষবে কে?' একটু বিরক্ত হয়ে খলেরা খোঁজে যায় গাংগুলী। পাগলের ওপর ততক্ষণই সহানুভূতি থাকে, যতক্ষণ সে মাত্রা রেখে চলে। এই সংকটময় মুহূর্তে কিনা—মরণরে তুঁহু মত শ্যাম সমান। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি এসে শিল্পীরও স্বপ্নবিহ্বলতা অতিরিক্ত বিকৃত স্বাদ মনে হয়। শিল্পী আর কোনও কথা না বলে খলখানা এনে ওষুধ মিশাতে থাকে।

মধুমালতী এসে স্বামীর হাত চেপে ধরে। সে ভাব বিগলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে—

"অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ ?

'হাত ছাড় মধুমালতী—এখন ও পাগলামি শোনার সময় নেই। রোগী এখন-তখন।'

মধুমালতী হাত ছাড়ে না। আবৃত্তিও বন্ধ করে না। তার চোখ বুঝি ছলছলিয়ে এসেছে। সে মনে মনে দেখছে মৃত্যুর অনিন্দ্য সুন্দর এক রূপ।

ওগো মরণ হে মোর মরণ…'

গাংগুলী জোর করে হাত টেনে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। সে মনে মনে বিরক্ত হয়েছে অত্যন্ত। কাব্যের সময়ই বটে! অনেকখানি পথ অতিক্রম করেও সে যেন ভাব-গভীর কণ্ঠ শুনতে পায় স্ত্রীর। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। এ উন্মাদ নিয়ে সে করবে কি! গভীর নৈরাশ্যে তার অন্তর ভরে যায়। যদিও সে বাস্তব ধর্মী শিল্পী কিন্তু অজয়ের মত সে বিশ্লেষণ করে সব কিছু তলিয়ে বুঝতে পারে না। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষ যে সম্পূর্ণ সজ্ঞান হতে পারে না, অন্তত এ তথ্যটা আজও তার কাছে পরিপূর্ণ ভাস্বর নয়। তাই অন্ধকার জন্মে নৈরাশ্যের। সে গাছ পালার দিকে তাকায়। চেয়ে দেখে লতা পাতা পুষ্প গুচ্ছের দিকে। মনটা সামান্য কিছু হাল্কা হয় তার। এ যেন কতকটা শাস্ত্রীয় ঔষধ। আসল একটি দ্রব্য যখন দুষ্প্রাপ্য, তখন তার অভাবে অন্য একটা দিয়েই তালিকা হয় পূর্ণ—তাতে রোগী না-ই বা বাচুক কিম্বা বেঁচে থেকে মরুক! তা না হলে জীবনকে বাদ দিয়ে,

সংগ্রামকে বাদ দিয়ে, ঘাসের কবিতা, গাছের কবিতা, শূন্য মার্গ—একেবারে ষোল আনা ফাঁপা আকাশের কবিতা কি এত জন্মাতে পারে! হায়রে এত ঘাসের পূজারী প্রকৃতি পাগল মনীষার আবির্ভাব, কিন্তু তবু কেন যেন পৃথিবীর ঘোচে না সামান্য দারিদ্র্যের দণ্ডভার! শিল্পী-ঘরণী মধুমালতীর চিকিৎসার দায়িত্ব কেউ তো নিতে চায় না স্কন্ধে। ছন্দহীন সংসার, ছন্দহীন জীবন, তাই নিয়ে অসহায় গাংগুলী গাছ গুল্মের দিকে চেয়ে পথ চলে। শান্তি নেই, শক্তি নেই মদ খেয়ে ব্যথা ভোলে।

পূরো দুটি সপ্তাহের চেষ্টা, যত্ন ও শুশ্রূষার পর কবির জ্বর বিরাম ঘটে। সংগে সংগে বিকারও কেটে যায়।

'তোমার পুনর্জন্ম হল। কুসুম মন্তব্য করে।

পরিশ্রান্ত মলিনা স্মিত মুখে চেয়ে থাকে বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

গাংগুলী ক্রমান্বয়ে ওষুধের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসে। জোর দেয় পথ্যাপথ্যের ওপর।

'এখন দুধ ঘি মাখন যতটা সইয়ে সইয়ে দেওয়া যায়। এ অসুখে শরীর যেমন তাড়াতাড়ি ভাঙে, সারেও আবার তেমনি তাড়াতাড়ি—কিন্তু খেতে দেওয়া চাই।'

পণ্ডিত টাকা পাঠায়। কোন অসুবিধা হয় না!

গাংগুলী মাঝে মাছে দু একদিন বন্ধ দিয়ে আর আসে না। হেনা ছুটে যায়। 'বাবা তোমায় ডেকেছে? তুমি যাবে না?'

'দরকার নেই।' সংসারী কর্মরত গাংগুলী হেনার মুখের দিকে তাকায়। 'আচ্ছা যাব 'খন সন্ধ্যার পর। সময় থাকতে এই ক্ষেতের বেড়াটা দিয়ে নি। আমার লংকা গাছগুলো গরুতে খেয়ে সাবাড় করেছে।' সামান্য ক'টি লংকা গাছ। উজাড় করেছে গরু ছাগলে এই কটি দিনের অসাবধানে। মূল্য এর কিছুই নয়, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে

সম্বৎসরের। তরিতরকারী মাছ মাংসের অভাবে প্রায়ই পণ্ডতি কিম্বা তুপ্ত ভাত খেতে হয় ঐ লংকার সাহায্যে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে জোটে পাকা, নয়ত আধা পোক্ত। আর ভাগ্য মন্দ হলে কেবল জোটে কচি কুসির গন্ধ। অভাবের সংসারে উপাদেয় না হলেও একেবারে মন্দ নয়। খতিয়ে দেখলে গাংগুলীর ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। তবে লাভের আনন্দে সে এ লোকসান ভুলেছে।

গাংগুলীর মত বহুদর্শী চিকিৎসক ও তার সন্তানকে বাঁচাতে পারেনি—নিরাময় করতে পারেনি তার প্রিয়তমা পত্নীকে। আপশোষের কথাই বটে! এ ব্যাধি শাস্ত্রীয় নিদান পুরানের বাইরে, একেবারে রাষ্ট্রীয়। তাই থোড় কলা কচুর পথ্য পাঁচনে কাজ হয়নি। বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গেছে শিশু ভোলানাথ। সন্তানহারা মা উন্মাদিনী।

গাংগুলীর হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সে সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে নিভে আসে জগতের যত আলো।

সে কপালের ঘাম মুছে হাতের কাটারীখানা ধরে রাখে। বড় ছেলের খোঁজ নেয়। সে এখনও কাজ থেকে ফেরে নি। গাংগুলী ঘাটে যায়। অন্ধকারে স্নান সেরে, গা হাত মুছে গামছা খানা পরে বাড়ী আসে। প্রদীপ জ্বালায়, বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করে। রান্নার ভাবনা নেই। বড় ছেলে এলে সুবিধে মত ব্যবস্থা হবে।

মধুমালতী কবিতা আওড়াতে আওড়াতে এগিয়ে আসে—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী-মৃগ-সম।
ফাল্গুন-রাতে-দক্ষিণ-বায়ে
কোথা দিশে খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

কিছু খেতে দিতে পার. গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে।

‘গলা নয়, বুকটাই শুকিয়ে গেছে—পেটটাও নিশ্চয় খালি। তুমি এ অবস্থায়ও কবিতা আবৃত্তি করছ? বুঝতে পারছ না যে তোমার কত খিধে পেয়েছে?’

‘তবে খেতে দাও?’

রান্না ঘরে কিছু ভাত ছিল। শিশুর জন্য যেমন কিছু সঞ্চয় রাখে মা, এ প্রায় তেমনি। গাংগুলী আলো নিয়ে রান্না ঘরে প্রবেশ করে। ভাত জলে ভিজিয়ে কিছু নুন ও লংকার সাহায্যে স্ত্রীকে খেতে দেবে।

সে আহাম্মক হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

নিশ্চয় চক্রবর্তী বাড়ীর সেই অত্যাচারী শাদা হুলোটা এসে খেয়ে গেছে। আর কত সতর্ক থাকা যায়!

তখুনি ছেলে এল। মধুমালতীকে বান্না করে খাইয়ে তবে গাংগুলী বেরিয়ে গেল।

কবির পাশে গিয়ে গাংগুলী অনেকক্ষণ বসে রইল। কবির একটি হাত গাংগুলীর করতলে। নাড়ী দেখছিল, সেইভাবেই রয়ে গেল। কবি চেষ্টা করল না সরিয়ে নিতে। রাত প্রায় দ্বিপ্রহর হতে চলেছে, গাংগুলীর ওঠার নাম নেই। কোনও কথারও আদান প্রদান হল না। যে বাঁচল তার কৃতজ্ঞতা জানাবার ব্যাকুলতা নেই, যে বাঁচল তারও ধন্যবাদ নেবার আগ্রহ নেই। দুজনে একেবারে নীরব। সময় কেটে যাচ্ছে নিঃশব্দে। চাঁদ উঠতে উঠতে অনেকটা উঠেছে; বাতাস ঠাণ্ডা হতে হতে অনেকটা শীতল হয়েছে? ওদের দু বন্ধুর হৃদয়ের উত্তাপ যেন কমেনি। তাই ভাষা ফুটছে না কারুর মুখে। হেনা এসেছে, মলিনা চলে গেছে, কুসুমেরও দৃষ্টিতে এ দৃশ্য এড়ায়নি। কিন্তু কেউ ভংগ করেনি ওদের নীরবতা! এমন কি আজ বাদ হয়ে গেল কবির পথ্যের নির্ঘণ্ট।

অবশেষে শৃগাল ডাকল দ্বিপ্রহর রাত্রের।

ধীরে ধীরে শিল্পী উঠে চলে গেল। কবি ঘুমুচ্ছে।

সকাল বেলা কুসুম এল—বিকাল বেলা এল। কবি দুটো একটা কথা বলল অনেক বিরাম দিয়ে। মলিনাও সময় সময় যোগ দিল ওদের সংগে। সপ্তাহ মধ্যে যে যার কথা সম্যক ব্যক্ত করল এবং শুনল। এখন কবির উত্তরের অপেক্ষা, সে যাবে কিনা কলকাতা। তার জবাব পেলেই কুসুম পত্র লিখতে পারে পণ্ডিতকে। টাকার সংগে সংগে সে নিশ্চয় সশরীরে এসে উপস্থিত হবে।

'এখানে থেকে কি লাভ, আমাকে যেতেই হবে কলকাতা তবু একটু ভাবতে দাও কুসুম। পৈত্রিক বাসস্থান!'

কুসুম এবং হেনা ভাবে চিন্তার কি আছে? কুসুম বলে, অত দ্বিধাদ্বন্দ্ব করলে সুযোগ নষ্ট হয় বই আর কিছু ফল হয় না।'

হেনার সুকুমার প্রাণ বলে, এইবে ওর আর বুঝি রেলগাড়ী চড়া হল না। সিঁড়ি বেয়ে স্টীমারেও তো উঠে দেখল না কোন দিন। বাবা ওর ভাল না। সে চলে যায় ঘর ছেড়ে।

মলিনা সমস্তই শোনে—কিন্তু কিছু মন্তব্য করে না।

সাঁইত্রিশ

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে অজয়ের বেশী লাগে না। তার মনে হয় সে যেন পূর্বের চাইতেও সুন্দর স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। তরুণ রক্ত ফেটে পড়তে চাইছে হাতের তালু দিয়ে। আয়নায় নিজের কান্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়!

মেয়ে বলে, 'বাবা তোমার মুখের রঙ দেখলে হিংসে হয়।'

'কেনরে?'

'বলতে পারিনে—তুমি যে কি সুন্দর হয়েছ! তোমার মত আমার যদি অসুখ করত।'

'ছি: ও কথা বলে না।' মলিনা এসে পাশে দাঁড়ায় তৃপ্তিতে তারও মুখ উজ্জ্বল। 'এ সময় কুসুম ঠাকুরঝি এসে না পড়লে যে আমি কি করতাম।'

কবি সকলের কাছেই উপকৃত। কুসুম, গাংগুলী, নিজের স্ত্রী এমন কি মেয়ের কাছে পর্যন্ত। কিন্তু সে সবার চাইতে বেশী যেন দায়াবদ্ধ হয়ে পড়ে অন্তরীক্ষে বসে যে এই মধু-মন্থনের টাকা জোগায়। অর্থাৎ বাসুকী নাগের কথাই ভাবে কবি—অমৃত মন্থনে যার হাড়ের জোড়া খুলে যেতে চাইছে দোটানায়। ধন্য, ধন্য পণ্ডিত, তবু তুমি নীরবে হাসছ!

'বাবা কলকাতা চলো না!'

'নিশ্চয় যাব মা। এমন শুভানুধ্যায়ীর কথা রাখব না?'

'কার কথা বলছ বাবা?'

'পণ্ডিতের।'

কুসুমের মত হেনাও মুখ বাঁকায়। যেন পিসীর একটি দ্বিতীয় সংস্করণ।

সেদিন ঐখানেই যবনিকা পড়ে।

প্রলয়ের পরে নতুন পৃথিবীতে যেন প্রথম সূর্যোদয়। কবি কি কলকাতা না গিয়ে পারে? তার কবিতা নাকি বিপুল সমাদর লাভ করেছে। কনকপুরে বসে তো একথা ভাবাই যায় না। উপলব্ধিই করা যায় না এর মাধুর্য। আজ কলকাতা, কাল বাঙলা, পরশু সারা ভারতে তার নাম ছড়িয়ে পড়তে পারে। চাইকি এমন একদিন আসা সম্ভব যখন জগন্নাথ রুচির কবি স্থান পাচ্ছে জগৎ সভাতে। দুরাশা, কুয়াশা—যশের উগ্র পিপাসায় কবির চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যৌবনের প্রারম্ভে সে যে স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্নই বুঝি সার্থক হতে চলেছে। মোহাচ্ছন্নের মত একা একা রঙিন জাল বুনে চলে। বেশী কথা বলে না, কিন্তু তার মুখে আভা খেলে।

কুসুম তা বুঝতে পারে। 'কি হাসছ যে?'

'তোমার বাড়ী আর আমার বাড়ী কত দূর হবে? বাড়ী না কুসুম কলকাতার বাসা।'

'কেন এক বাসায় কি জায়গা কুলুবে না? আর দূরে দূরে না-ই বা থাকলাম।'

কলকাতায় ও-টা একটা সমস্যা, ইচ্ছা করলেই আর কাছাকাছি থাকা যায় না। বাড়ী ঘর সেখানে সুবিধা মত পাওয়াই কঠিন। আমি বহুদিন বাস করে এসেছি তো।

'কিছুই কঠিন নয় কবি। কঠিন শুধু তোমার মত পাওয়া। এত কাল দেখেও কি তোমাকে চিনতে পারলাম? আজ তুমি সমস্ত জগৎ কাল পত্র দিয়ে দেব—দেখো, পণ্ডিত তেমনি বাড়ী সংগ্রহ না করেই পারবে না।'

'তা জানি, পণ্ডিতের তুলনা মেলা ভার—তুমি পরম সৌভাগ্যবতী!

তবু এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অগ্রণী না হওয়াই ভাল—অনেক ঝুঁকি আছে।'

মোলায়েম হলেও কুসুম শ্লেষটুকু বুঝে চুপ করে রইল। ভাবল, এই সামান্য কারণেই হয়ত কবি এই যাবতীয় উদ্যম, আয়োজন তাসের ঘরের মত ঠেলে ভেঙে দিতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি সে কুসুমকে ভালবাসে না, পণ্ডিতকেও শ্রদ্ধা করে না, নিজের খেয়ালেই চলে। 'আচ্ছা তোমার কথাই রইবে, এখন বল দেখি তুমি কলকাতা যাবে কিনা এবং কবে নাগাদ যেতে চাও?'

'যত শীঘ্র সম্ভব।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ। জানই তো এখানে আমার আয় বলতে কিছু রইল না—ওদের খাওয়ার কি? আর আমার দেরী করা সাজে না। এমন সুযোগও জীবনে দুবার আসবে না? তবে যে ক দিন সময় নিলাম সে আমার দুর্বলতা আমার স্নায়ু পরমায়ুতে জড়িয়ে গেছে কনকপুরের মাটি। আমি এখনও ভাবতেই পারিনে যে এই বাড়ী ঘর গাছ পালা-মানুষগুলো ছেড়ে চলে যাব। কুসুম, বড় কঠিন বাঁধন।'

'তবু তো ভবিষ্যৎ দেখতে হবে। তোমার ক্ষেত্র দিগন্তব্যাপ্ত, কেন রইবে এ সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ?'

'নিশ্চয় কুসুম নিশ্চয়। বৃহত্তর, মহত্তর জগতের আমন্ত্রণ এসেছে—আমার মত ক্ষুদ্রের সেবা চাইছে, আমি কি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি? দুর্বলতাকে আমি কিছুতেই মাথা তুলতে দেব না। তুমি পত্র লিখে দাও কালই জরুরী বলে।'

কবি আগামী দিনের উজ্জ্বল রঙের আবেশে আবার বিহ্বল হয়ে থাকে। অবহেলিত শিল্পী স্বকীয় গৌরবই অর্জন করবে।

কবি অনেক কথা ভাবে, সুবিপুল ধরিত্রীর কথা কত সভ্যতা, কত

জনপদ, কত কীর্তি কাহিনী যে ছড়িয়ে রয়েছে ! সমুদ্র মেখলা ধরিত্রীব ছবি সে কবিতার চোখে দেখে। তার ডাকে এসেছে, সে কি সাড়া না দিয়ে পারে ? কিন্তু কনকপুরের স্মৃতি কাটার মত বিঁধতে থাকে। মাঝে মাঝে বেশ যেন একটু টন্‌টন্ করে ওঠে। সে নিজের উন্নতির সংসারের জন্য এ মোহ ত্যাগ করবে। চরম ব্যর্থতার জন্য সে আর ডালা সাজাবে না। ব্যক্তির স্বার্থ ব্যতীত বৃহতের স্বার্থ কিছুতেই সার্থক হয় না।

কুসুমের গা ঘেঁষে চলে হেনা। 'আচ্ছা পিসী কলকাতা সহর দেখলে তো ভয় পাব না ? বাপ দাদার বয়সেওতো দেখিনি। তুমি দেখেছ ? কালীগঞ্জের থেকে কত বড ?

'তোর বাবার বয়সে দেখিস নি, মানে ? তোর বাবা তো কলকাতা থেকেই পড়ত।'

'রেখে দাও ওসব কথা—অনেকদিন আগের গল্প মিথ্যাও তো হতে পারে। আচ্ছা বলত কালীগঞ্জের চেয়ে কত বড় ?'

'দেখছি তুই আমার মাথা খারাপ করে ছাডবি। আমি কি করে জানব ? আমি কি কখনো গেছি ? তোর পিসে এলে জিজ্ঞাসা করিস।'

'আচ্ছা, সে হবে'খন। কিন্তু পিসি, তুমি বড্ড ভুল করেছ। দেবীপুর না গিয়ে কলকাতা গেলে ভাল করতে। সব তো জানা চাই ! পিসের কি আবার চোখ আছে ? তুমি নাকি একবার—বলব পিসী, বলব—তুমি নাকি একবার টিকি কেটে দিয়েছিলে পিসে মশাইর ?'

'বেহায়া মেয়ে দূর হ এখান থেকে দূর হ।'

'তুমি রাগ করলে আর বলব না। এখন না হয় যাচ্ছি, কিন্তু আবার আসব দুপুর বেলা।

'না।'

ও দ্বিপ্রহরের তর সয়না। আবার আসে। পিসীর গায়ের গন্ধের মত মিশে থাকে।

পঞ্চীর অনেক আলা-বালা হেনাতে আছে। শুধু কুসুম দেখতে পায় না পঞ্চীর কৃশ নেড়া ভাইটিকে।

কুসুমের পত্রের টেলিগ্রামের মত এমনই তীব্রতা যে পণ্ডিত স্বয়ং এসে হাজির হয়।

আনন্দ ও কৌতূহলে ব্রজেশ্বর প্রশ্ন করেন, 'এই গেলে আবার কি মনে করে এত শীগগির ফিরলে? নিশ্চয় কিছু সুসংবাদ আছে তা পরে শুনব'খন—এখন স্নানাহার করে সুস্থ হয়ে নাও।'

কুসুম এসে লজ্জিত পণ্ডিতকে উদ্ধার করে। 'বাবা আমি কলকাতা যাচ্ছি—আমাকে নিতে এসেছে।'

'উত্তম, শুনে বড় সুখী হলাম। বিধিলিপি মা কেউ খণ্ডাতে পারে না। যে কদিন ভোগ ছিল, তা এবার শেষ হয়েছে। আশীর্বাদ করি তোমাদের এ মিলন অক্ষয় হক। যা আর পাগলামী করিসনে—স্বামী যে দেবতা মা।'

ঈষৎ সলজ্জ হাসিতে কুসুমের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। সে পিতাকে ও স্বামীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে।

ব্রজেশ্বরের এ আনন্দের একমাত্র অংশীদার হতে পারতেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু তিনি নিতান্তই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তাই ব্রজেশ্বর অন্তরালে গিয়ে একাকী ব'সে থাকেন। তাঁর এইমাত্র আহার শেষ হয়েছে, অথচ নিত্যকার মত মধ্যাহ্নের সুপ্তি জড়তা আসছে না।

'চিঠি পেয়ে বুঝি আর দেরী করনি?'

'না। তুমি যে আজ কলকাতা যেতে চাইছ এ আমার গভীর আনন্দের কথা—কিন্তু কবিকে যে নিয়ে যেতে পারছি এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কবির আগের লেখাগুলো এবার যে আমার সংগে দিয়েছিলে, সেগুলোও পড়ে দেখলাম—চমৎকার! তবে শেষের কবিতাটায় রয়েছে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ।'

পণ্ডিতের মুখে কবির প্রশংসা শুনে কুসুমের চিত্ত যেন বিগলিত হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে কবির যতই গুণ থাক না কেন, অপর কেউ হলে সহ্য করতে পারত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতের প্রশংসা অকুণ্ঠ।

'সাধারণ একটি মানুষ, কি সাধনায় এমন অনন্য সাধারণ গুণের অধিকারী হল?' তুমি তো নিজে কবি নও, কিন্তু কি করে কবিকে চিনলে?'

'কেউ গান গায়, কেউ কান পেতে শোনে—কেউ কালির অক্ষরে লেখে, কেউ তা চোখের জলে পড়ে—কেউ বা মৃদংগ বাজায়, কেউ মনে মনে নাচে—এরা সবাই কবি। কবি ছাড়া কি, কুসুম, কেউ কবিতা বুঝতে পারে? তুমি কবি, আমি কবি, জগৎ পারাবারের তীরে একটি শিশু পর্যন্ত কবি।'

'তা হলে অজয়ের সংগে তোমার আমার তফাৎ?'

'যে লোকোত্তর প্রতিভা যুগে যুগে প্রেমের বন্যায় মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অথবা অক্ষম, অচেতনের মনে জ্বালাতে পারে দাবাগ্নি সেই আসল কবি। অজয়ের ভিতর দেখা যাচ্ছে নব-চেতনার সহস্র স্ফুলিংগ। আমি যথাসর্বস্ব পণ করেও তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। ভগবানের ইচ্ছায় আমি নানাভাবে খেটে একা যা রোজগার করি তাতে একটি লোকের মোটা ভাত, মোটা কাপড় চলে যাবে। অজয় যদি আয় না-ও করতে পারে সে জন্ত আমি ভাবিনে। ছেলে নেই, মেয়ে নেই, আমি সঞ্চয় করে করব কি?'

এমনি সেদিন দেবীপুরে বসে অনেক কথা বলেছিল পণ্ডিত, আজ বলল তার চেয়েও বেশী। তার কাছে এ মুখরতা কল্পনার অতীত। এমনি করে কি সে তার জীবনের ব্যর্থতা আরও জানাবে? কি করে সইবে কুসুম? এ কঠিন প্রশ্নের কে মীমাংসা করে দেবে? প্রতিভাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে, কবিকে সম্মান করে, কিন্তু উপলক্ষ্যের বুকের হুতাশন

কে নিভাবে ? কুসুম অস্থিরতা অনুভব করে। সে পণ্ডিতকে বসতে বলে তার স্নানের জিনিষ গুছিয়ে আনতে যায়।

'পণ্ডিত মনে মনে বলে, তোমার প্রেমে যে বৃহৎ প্রেমের সন্ধান পেলাম তার জন্য আমি অশেষভাবে ঋণী।'

আটত্রিশ

এ কদিনের মধ্যেই যেন ছোটদির চেহারা ঝলসে গেছে। মুখে চোখে পড়েছে বয়সের ছাপ। রাত্রিতে ঝড় হলে সকাল বেলা যেমন তার চিহ্ন দেখা যায়, তেমনি গভীর দাগ পড়েছে জয়ন্তীর মুখে। তিনি ক্লান্ত—কতদূর ক্লান্ত তা তাঁর কণ্ঠস্বরেই ধরা পড়ে।

'রক্ষিত গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ ছোটদি, জেনে এলাম।'

'কি জানলে ?'

'কবি সত্য সত্যই দেশ ছাড়ছে, কলকাতা যাচ্ছে।'

ছোটদির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবু তিনি বললেন, 'এতদূর আস্পর্দা ! কলকাতা গিয়ে খাবে কি ?'

'সে জন্য আমরা মাথা ঘামাবো কেন ? দুদিন বাদে তো টেরই পাবে। এমন সুখের চাকরি আর জুটবে না কোথাও। পায় ধূলো কাদা না লাগিয়ে পয়সা। সেরেস্তায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আয়।'

এ সব মন্তব্য অন্য কোন দিন হলে হয়ত ছোটদির ভাল লাগত। তাঁর কেবলই মনে পড়তে লাগল বজরার ঘটনা—ধ্যানমগ্ন কবির অদ্ভুত বিশ্লেষণ : মা ছিল স্তন্যদায়িনী। তারপর চির দুঃখিনী মা যুগে যুগে স্তরে স্তরে ভাঙতে ভাঙতে কোথায় এসে যে আজ ঠেকেছে তা-ও মনে

পড়ল। এতদিন যিনি পরের কথা, পরের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন—তিনি আজ উদ্বেল হলেন নিজের কথা ভেবে। কে তাঁর এ দুর্জয় ক্ষতি কে পূর্ণ করবে? কে তাঁর ডুবন্ত ভেলা ভাসিয়ে তুলবে জলে?

জনার্দনের স্ত্রীকে ডেকে জয়ন্তী বললেন 'দাদা তো এল না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি নে—আজই কাশী যাব।'

জনার্দনের স্ত্রী এতটা বিস্মিত হয়ে গেলেন যে তিনি শুধু ছোটদির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

'তোমাদের ষ্টেটের আমি কিছু নেব না। কেবলমাত্র শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজিউর প্রণামীর টাকা ক'টি, যা দূরে ধরা রয়েছে তাই নেব। আর দুখানা কাপড়।'

অনেক ঠকে ঠকে ছোটদি অবশেষে কাশীর টিকিট কিনলেন। আটচলা, নাটমন্দির, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজিউ যেন হালকা হয়ে গেল একজনের অভাবে।

ছোটদি গেলেন, কবিও যাবে—তারই তোড়জোড় চলছে। কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে কনকপুরে ছোট বড় সকলেরই বাড়ীতে। ছোটদির বিদায় নেওয়ার বেলা, বাড়ীর দাস দাসী আত্মীয় স্বজন ছাড়া বড় একটা কারুকে দেখা গেল না। কিন্তু কবিকে নিবৃত্ত করতে এল গ্রামের প্রায় সবাই। বোরখা পরা রসুলের স্ত্রী ও ডালিম জান পর্যন্ত। বিশেষ কোনও যুক্তি নেই, সবিশেষ হয়ে উঠেছে এই গ্রাম্য জনতার মমতা। কবির দেওয়ার মত দৌলত নেই, দেখাবার মত কোনও সামগ্রী নেই; তবু যারা এসেছে তারা এসেছে ভালবাসার নিষেধটিকে নিয়ে এগিয়ে। ওরা যেন প্রেমে পড়েছে এই অস্বচ্ছল মধ্যবিত্ত লোকটির।

কবির উত্তর শুনে কেউ কিছু বলতে পারে না। বিদায় নেয় ভারাক্রান্ত মনে। কেবল গাংগুলী ওঠে না। সে বলে, 'যেতে চাইছ যাও কবি, তোমার ভবিষ্যতের পথে কাঁটা হব না। কিন্তু মনে রেখো

আমরা পড়ে রইলাম জংগলে। সময় হলে আমাদের কথা স্মরণ ক'রো। আলোতে গিয়ে অন্ধকারের কথা কি তোমার মনে থাকবে?'

'তুমি আমার জীবন দিয়েছ, তোমার কথা কি ভুলতে পারি? আমি জানি সহরকে একদিন এই জংগলের সংগে সন্ধি করতে হবে—নইলে পরগাছা সভ্যতা বাঁচবে না। জানো তো ভাই আমি যাচ্ছি কত দায় ঠেকে। আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমাদের কথাই লিখতে পারি।'

গাংগুলী মনে মনে আশীর্বাদ করল। মুখ দিয়ে অবশ্য তার কোনও কথা ফুটল না।

দুয়ার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল একটি লোক। এবার সে আর থাকতে পারল না। অত্যন্ত বিচলিত হয়েই বুঝি স্থান ত্যাগ করল। তার জীবনাধিক স্ত্রীকে একদিন বাঁচিয়েছিল কবি। তস্করের অভিনব ঋণ পরিশোধ একদিন মহৎ কাজে লেগেছিল।

পরের দিন রওনা হওয়ার দিন ধার্য হয়।

বাড়ী ঘর দেখা শুনার ভার দেওয়া হয় এক দূর সম্পর্কের কুটুম্বের ওপর। জমি খেতের তো বালাই নেই, তা অপরের কুক্ষগত।

কুসুম সকালবেলা এসেই কবিকে তাড়া দেয়। 'খেয়াল আছে তো—আজ চারটায় কিন্তু স্টীমার ধরতে হবে।'

'পিসী এত গয়না পেলে কোথায়?'

'বুক টাটাচ্ছে নাকি? আয় এদিকে।' কুসুম একজোড়া কুমারী মাকড়ি হেনাকে পরিয়ে দেয়।

'এখন তো ঠাণ্ডা হয়েছে বুকটা। যা তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয় চট করে।'

'বৌ এই হার ছড়া গলায় দাও—কলকাতা গিয়ে না হয় খুলে দিও। সারা রাস্তা গলাটা খালি থাকবে কেন? কুণ্ঠার কিছু নেই, আমি তো তোমাকে একেবারে দান করছি নে।'

মলিনা হার ছড়া গলায় পরে। কবি হাসিমুখে কুসুমের দিকে তাকায়। অমনি যেন পণ্ডিতের দেওয়া যাবতীয় স্বর্ণালংকার পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ করে। যে দিয়েছে, সে সারারাত তৃপ্তিতে চেয়ে দেখেছে—কিন্তু তবু কোথায় যেন সুপ্ত ছিল অপূর্ণতার বীজ। দিতে চাইলেই কেউ দিতে পারে না—আর নিতে চাইলেই কেউ নিতে পারে না—দেওয়া-নেওয়ার পূর্ণতার ভিতর চাই উভয় হৃদয়ের মরমী সেতু-সংযোগ।

'কুসুম আমি একটু গ্রামটা ঘুরে দেখে আসি, আজই তো শেষ। আর কবে ফিরব কে জানে!'

'তাড়াতাড়ি এস কিন্তু।'

'আচ্ছা! তুমি ভেব না।'

ঘরে মলিনাও ছিল না, হেনাও নেই। কুসুম জবাব দিল, 'ভাবিনে বলেই বেঁচে আছি, ভাবলে কি আর রক্ষা ছিল! তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে পল্‌তের অবস্থা চিন্তা করবো না—ঝড়ো গাঙ পার হয়ে এসে খেয়া-মাঝির কথা ভাব না। তুমি কবি, বিশ্ব-প্রেমিক—পণ্ডিত অন্তত তাই বলে, কিন্তু আমি মূর্খা নারী কি করে তা স্বীকার করি বলত?'

'কে তোমাকে স্বীকৃতি দিতে বলে? আমি তা কিছুতেই বলব না। চৈতন্য বুদ্ধের দেশে আমাকে তা বললে, আর কিছু নয় কুসুম, ব্যংগ করা হয়।'

'ক্ষুণ্ণ হলে নাকি? পণ্ডিত তোমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তাই সে সরল মনে যা ভাবে তাই বলে। বুদ্ধ চৈতন্য তুমি হতে না পার, খ্রীষ্টের কথাও তুলব না, তবু তুমি বড়, তুমি জয় করেছ কনকপুরের চিত্ত। বলত, তোমাকে কি জন্মান্ধও স্বীকার না করে থাকতে পারে?'

'এই কিন্তু ঠকলে। নিজে ফাঁদ পেতে নিজেই পা দিলে। কবি হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

কুসুম ভাবে মানুষটার ওপর যে কত জুলুম চালিয়েছে আজীবন!

এমন একটা মহৎ হৃদয়কে অতি আপনার মত পেয়ে সত্যই শ্রদ্ধা করতে পারেনি কোনও দিন। হয়ত তেমন করে চিনতেই পারত না, যদি না পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করত এ ভাবে। গুণী শুধু নিজের গুণেই ভাস্বর হয় না, তাকে উপলব্ধি করার মত মানুষ লাগে। জংলা ফুল কেবল প্রস্ফুটিত হয়ে সৌরভ ছড়ালেই আর তার জীবন চরিতার্থ হয় না, কেউ চয়ন করে, আঘ্রাণ করে, কারোতা খোঁপায় পরা চাই। এবার সে নিশ্চয় কবরী বাঁধবে?

'কি কি সংগে নেব ঠাকুর ঝি?'

'যা যা দরকারী—যা যা দামী।'

'দরকারী তো অনেক জিনিষই, কিন্তু দামী কোনটা? এই তো কখানা ফুটো কাটা বাসন পত্র—আর ঐতো রাজসিক শয্যা!'

'তবু ভাই হাতের পাঁচ ছাড়া যায় না।'

সেই জন্যই দুজনে যুক্তি করে জিনিষ পত্র গোছায়। ধোয়া কাচা ধবধবে নেকড়া খানাও তুচ্ছ করে না। দু একখানা ডালা-কুলোও বাঁধে—যা অন্তত সংগে নেওয়া চলে। নতুন বিদেশে গিয়ে উঠবে তো!

হাতে কাজ করে কুসুম কিন্তু তার মনটা পথের দিকে পড়ে থাকে। এতক্ষণে ফিরলেও তো ফিরতে পারত।

'ওকি ঠাকুর ঝি, এই কাঁথাখানা বাঁধলে না? হেনার এই জামাটা?'

'ভুল হয়ে গেছে ভাই। আমি চটপট গুছিয়ে নিচ্ছি।'

কুসুম লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি ওগুলো হাতে তুলে নেয়! পাট করে ঠিকঠাক মত বেঁধে ফেলে। তার জন্য আবার খুলতে হয় বিছানাটা। উৎপাতই বটে। হিমসিম খেয়ে যায় কুসুম।

কিন্তু এখনও কেন ফেরে না? সময়ের সাক্ষী বেলা—তা তো কম বাড়েনি। আসবে। এখনি আসবে। এক কবি দেশত্যাগী হচ্ছে, সে চোখ ভরে, বুক জুড়িয়ে দেখে আসুক লতা পাতা, স্নিগ্ধ শ্যামলতা। বলে

বলে আসুক মনের কথা গাঁয়ের সবায়ের কাছে। বিদায় নিয়ে আসুক জগন্নাথ মুচির কাছে থেকে পর্যন্ত। কুসুমের স্নেহ বিগলিত অশরীরী আত্মা যেন কবির পিছনে পিছনে দুয়ারে দুয়ারে কর জোড় করে এগিয়ে চলে।

বেলা আরও বাড়ে। কিন্তু কবি ফেরে না। কুসুম অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

মলিনা আর জিজ্ঞাসা না করে পারে না, 'ঠাকুরঝি হল কি ?'

উনচল্লিশ

একটা প্রকাণ্ড বোল্‌তার চাকের ক্রুদ্ধধ্বনি যেন। না, না, মেঘের গমগমানি ? উহুঁ, মানুষের হট্টগোল—

'বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে এত লোক যাচ্ছে কোথায় ? থাম্‌তো বৌ, দেখি ব্যাপারটা কি ? এ যে ছেলে বুড়ো সবাই ছুটে চলেছে।' কুসুমের পাশে এসে মলিনাও বাতায়নে দাঁড়ায়।

'হেনাকে জিজ্ঞাসা করব নাকি ঠাকুর ঝি ? হেনা, ও হেনা— কোথায় গেলি মা ?'

হেনার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

জানালা থেকে পরিষ্কার দেখা গেল হাল-জোয়াল ছেড়ে চাষীরাও ছুটছে। ব্যাপার কি ? চক্রবর্তী বাড়ীর দিক থেকে যখন গোলমালটা শোনা যাচ্ছে তখন কুসুমের সন্দেহ হল যে কেউ হয়ত আগুন দিয়েছে তার ধানের গোলায়। তাঁর তো শত্রুর অভাব নেই। কিন্তু দিন দুপুরে একি সম্ভব ? ধোঁয়া কোথায়—ঘন, কালো কুণ্ডলী পাকান ?

'কি হয়েছে নিধু? কেন ছুটছ এমন করে?'

নিধু জবাবই দেয় না। সে কুসুমের প্রশ্ন যে শুনবে এমন তার মনের অবস্থাও নয় যেন। সে মহা উৎসাহে ছুটে চলে।

এবার দু একজন বৌ ঝিকেও দেখা যায়। কিন্তু কারুব কাছ থেকেই সঠিক কিছু সংবাদ আদায় করা যায় না। কেউ বলে গান হচ্ছে, কেউ বলে কীর্তন, কেউ বলে রাখাল ছেলেদের যাত্রা।

কুসুম ও মলিনার আর যা-ই হক আজ যাত্রা দেখার সময়ও নেই উৎসাহও নেই। তবু তারা বাতায়ন ছাড়তে পারে না।

'এখনও যে এল না ঠাকুরঝি, হয়ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে।'

'সে আশ্চর্য নয় ভাই।' কুসুম উঁচুগলায় ডেকে জিজ্ঞাসা করে 'ওরে, কে যায়? নীলু নাকি রে? ওদিকে যে অত লোক যাচ্ছে, কি হয়েছে জানিস?'

'কেন, জান না? কবি ঠাকুর নাকি পাগল হয়েছে!'

জানবে না কেন কুসুম, জানবে না কেন মলিনা। তারা তো কবিকে দিয়েই একটা কিছু আশংকা করছিল। নইলে এতক্ষণ তাদের কি প্রয়োজন ছিল বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাকার? কিন্তু কবি তো উন্মাদ হয়নি। তার যা হয়েছে কুসুম যেন তা স্পষ্ট বুঝল নিমেষে। ঘর দোর খোলা ফেলে ওরাও দুজনে তখন তখনি বেরিয়ে পড়ল।

কবির ভাব বিগলিত রূপ কুসুম দেখেছে। দেখেছে তার আকুতি বিহ্বল উন্মাদনা। একটা আলো, আলো দিতে পার—সে কণ্ঠও কুসুম ভোলেনি। ভাবুকের প্রেমিকের যা—ও সে শোনেনি বা দেখেনি তা-ও ভেসে উঠল কল্পনায়। কবি নিশ্চয় আত্ম বিস্মৃত হয়ে ভাবমগ্ন এক অলৌকিক স্তরে চলে গেছে।

নিশ্চয় কোনও কঠিন আঘাত পেয়েছে। কিন্তু কোন পাপিষ্ঠ দিয়েছে এমন সদ্য রোগ-মুক্তকে মর্মঘাতী আঘাত?

খালপার লোকে লোকারণ্য। ওরা আর অধিক দূর প্রবেশ করতে পারল না। বোধ হয় কনকপুরের রান্নাবান্না আজ বন্ধ হয়ে গেছে। হাল লাঙল তো একখানাও দেখা যাচ্ছে না খালের ওপারের মাঠে। এমন অভাবনীয় জনতার জোয়ার কেউ দেখেনি কস্মিন কালে।

কবি চীৎকার করে কবি গানের পদ রচনা করে গাইছে। গাছের সামিয়ানার নীচে সে সাময়িক আসর জমিয়ে নিয়েছে। তার মুখ চোখের ভাবই অভাবনীয়। দেশের সব চেয়ে যে ওস্তাদ গাইয়ে সুবল হালদার, সে কয়েকটি রাখাল বালককে সংগে নিয়ে ধূয়া ধরেছে। গান জমেছে চমৎকার!

জনতার ভিতর কেউ জানে না এর উৎপত্তির হেতু, কিম্বা আবির্ভাবের শুভ লগ্ন। তাদের কানে এসেছে স্বতোৎসারিত গানের ধারা। তারা যে যেখানে এসে থেমেছে সেই খানেই মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। গাংগুলীর সংগে হেনাকে দেখা গেল একটা গাছের তলে। তাদের পাশে পণ্ডিতও রয়েছে দাঁড়িয়ে।

সুবলের সংগে মদন ও মেহের আলী এসে যোগ দিল হালের গরু ছেড়ে দিয়ে। কনকপুর উতরোল হয়ে গেছে।

কবি দরাজ গলায় গাইছে—

এ কেচ্ছা নয়, পুরান নয়, শনির পাচালি।
বাপ সমতুল মনিবের কাণ্ড শোন বলি॥
ভাবে ভাবে ত্নচার কথা করি আলাপন।
কুসুমপুরের ইতি কথা শোন দিয়া মন॥
ধোপার মেয়ে রূপবতী পাখী তাহার নাম।
চলন বলন শান্ত ধীর গড়নটি ছিমছাম॥
হাসে খেলে কাজ করে, বুদ্ধিমতী অতি।
পিতা মাতার দক্ষিণ হস্ত মেয়ে গুণবতী॥

সুবল প্রভৃতির সংগে দর্শকরা কয়েকজনে ধূয়া ধরে—আহা বেশ বেশ…

পণ্ডিত জীবনে কখনও কবি গান শোনে নি। সে সহজ সরল কথার সংগে সুরের এবং তালের এমন যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটতে পারে তা জানত না। জানত না যে এমন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা রয়েছে লোক-গীতিকা! যাদুঘরের ফসিলের মত সে এগুলোকে দেখেছে বহু সংকলনে কিংবা সংগ্রহ গ্রন্থে। কিন্তু আজ সে রক্ত মাংসের দেহ পূর্ণ রসে যেন উপলব্ধি করে। গানের সংগে সংগে যেন ঝংকার দিয়ে ওঠে তার মনের সেতারখানা। সে অভিভূত হয়ে থাকে।

ধূয়ার রেস শেষ হতে না হতে নানাবিধ উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি শোনা যায়। তা থামতে না থামতে অনেকখানি এগিয়ে যায় গান। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কবি ছড়া রচনা করছে, তবু ঘামে যেন স্নান করে উঠেছে!

কামে অংগ জর জর মনিব পাতেন ফাঁদ।
ভয়ে ভয়ে সেই ফাঁদেতে পা দেয় পূর্ণমাসীর চাঁদ॥

সুবলের দল অতি সকরুণ স্বরে ধূয়া টানে—

আহা রাহু গেরাস করে—

দর্শকরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। কেউ কেউ দাঁতে দাঁতে ঘষে। জনার্দনের চরিত্র কারুর কাছে অজ্ঞাত নয়।

কবি হঠাৎ গানের বন্ধন থেকে কেবলমাত্র পদ্যের উদ্দাম স্রোতে ভেসে চলে। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, তার নিঠুর ব্যঞ্জনা এমনভাবে কবির মনকে আলোড়িত করে যে সে আর অপেক্ষা করতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে নব নব রচনা, নব নব উন্মেষ—পলকে পলকে প্রতিভার দীপ্তি। সে সকাতরে করজোড় করে বলে যে, এত যদি তোমরা আঘাত পেয়ে থাক, প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত হও—দেখে এস পাখিকে। এই

মাত্র আমি দেখে এলাম, চক্রবর্তী তাকে একেবারে শেষ করে নিয়ে এসেছেন দেশে। হাত পা ফোলা, রক্তহীন একটা জীবন্ত শব। ভাই সব একবার দেখে এস গরীবের মেয়েটাকে।

আবার কবি গানের মাধ্যমে তার হৃদয়ের ব্যথা উৎসাবিত করে দেয়। নতুন তাজা রক্ত ফেটে পড়তে চায় মুখমণ্ডলে। এই কি সেই কলেজে পড়া কবি? কোথায় তার সৌখিন কৃষ্টি? কোথায় তার তুলার-শয্যায়-রাখা এক একটি বাছা বাছা কথার আংগুর ফল? পণ্ডিত আবিষ্ট হয়ে দু'পা এগিয়ে আসে।

কবি তার সমস্ত চেতনাও উপলব্ধি ঢেলে বিভোর হয়ে গাইতে থাকে—

মিথ্যা আর্জি, মিথ্যা ডিগ্রী, নারীর ওপর অত্যাচার।
সর্বংসহা বসুন্ধরা বলেরে ভাই সইতে নারি আর॥
জমি গেল জায়া গেল, নিলাম হল ভদ্রাসন।
(হায়রে) চেয়ে কি দেখবে যত কাপুরুষ সন্তানগণ॥

সুবলের দল এবার ব্যংগ স্বরে ধুয়া টানে—কবিই স্মারকের কাজ করে—কেন বাপ সমতুল মনিব তো?···সংগে সংগে রাখালদের পাঁচন-বাড়ি দিয়ে তাল রক্ষিত হয়। মানুষগুলো ভিতরে ভিতরে ফুঁসে ওঠে।

পণ্ডিত ভাবে একি নাটকীয় পরিবর্তন? ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনি করেছ—কবিতা থেকে একেবারে লোকসংগীতের তোরণে পদার্পণ! এতো ভাবাই যায় না, এতো ধারণাই করা যায় না! এ প্রতিভা যে কত বড় প্রতিভা, কতখানি যে এর ব্যাপ্তি তা পরিমাপই করা দুঃসাধ্য। কত বড় হৃদয় বেদনায় যে কবির এ নব অভ্যুত্থান ঘটেছে, তা চিন্তা করে পণ্ডিত অধীর হয়ে পড়ে। দু একটা গানের কলি তার শুনতে ভুল হয়ে যায়। তার রসিক চিত্ত সমুদ্রের মত উদ্বেল হয়েছে।

ভিন্ন ভাবে ভিন্ন তালে ঘুরে এসে আবার গান ধরে কবি। হাতের

পেশী ঘন ঘন ফুলে ওঠে। চোখ দুটো দিয়ে ঠিকরে বের হতে চায় আগুন। সে দৃপ্ত তেজে গেয়ে ওঠে—

মনিবটা রক্তচোষা

রক্ষিতটা সর্বনাশা

(এস) এদের মেরে ঘুচাব জঞ্জাল।

এবার ধুয়াটাও বদলায়—

ও ভাই আজ প্রভাতে এল নতুন কাল—

গান থামা মাত্র জনতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা সচেতন উচ্ছ্বাসের ঢেউ বয়ে যায়। শ্রান্ত কবিকে এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে গাংগুলী।

পণ্ডিত ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে তাকে মাল্যভূষিত করে। 'তুমি কনকপুরে নবযুগের উদ্গাতা। হে বহুধা প্রতিভা, নমস্কার!'

কবি সংকুচিত হয়ে হাত জোড় করে। মুখ দিয়ে কিছু বলার মত তখন তার ক্ষমতা নেই।

হেনা মহা গৌরবে পিতার হাত ধরে চলে।

কুসুম ও মলিনা অনেক দেরীতে এসে পৌঁছেছিল। তারা দেখে যে ভিড় ভেঙে যাচ্ছে। মানুষের অসম্ভব চাপ পড়েছে সংকীর্ণ পথে। তারা আগেভাগে বাড়ী ফিরে আসে। পথে তারা কোথাও দাঁড়ায় না।

কবি প্রায় বেলা শেষ করে বাড়ী এসে ওঠে। সংগে তার হেনা, গাংগুলী ও পণ্ডিত। মাঝ পথে সে ফুলের মালা একটি মেয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছে। হেনার হিংসা হয়েছে কিন্তু কিছু বলেনি সে।

সকলেই পরিশ্রান্ত, সকলেই ক্ষুধার্ত। কিন্তু কবির ভিতর দিয়ে তখনও যেন উত্তেজনার উষ্ণ প্রস্রবণ চলেছে, সে কোনও ভূমিকা না করে, বাড়ী পৌঁছেই বলে 'যাক সবাই উপস্থিত আছ ভালই হয়েছে। আমার কলকাতা যাওয়া হবে না গাংগুলী।'

চল্লিশ

'কেন, কেন, কেন ?' এক সংগে প্রশ্ন হয় অনেকগুলি।

কুসুমের মাথার ভিতর যেন একটা চর্‌কী বাজী ঘুরপাক খেয়ে যায়। সে টলতে টলতে স্থির হয়। বিকৃত স্বরে সে প্রশ্ন করে 'এ খামখেয়ালীপনার অর্থ কি ? শেষ মুহূর্তে তুমি কি ভরা-ডুবি করতে চাও ?'

কাকে ভরা গাঙে ডুবিয়ে দেবে কবি ? নিজেকে ? তাতে কুসুমের কি ? ক্ষতিবৃদ্ধি তো কবিরই ! কথাগুলো অস্বাভাবিক অর্থবহ। কানে বাজে সকলের। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। আবেগ যখন হৃদয় ভেঙে বেরিয়ে আসে তার কাতরতাই আলাদা—তার আকুতিই অনন্যরূপ।

'কনকপুর আমাকে ছাড়বে না। যে দেশে জন্মেছি, সেখানের মৃত্তিকা বলছে, এদেশের মহাশ্মশানেই তোমাকে লীন হয়ে যেতে হবে। তোমার বহু কর্তব্য আছে। তোমার নিজের চাইতে যে তোমার কর্তব্য অনেক বড়। তুমি যেতে চাইলেই তো আর যাওয়া হয় না। এর আমি জবাব দেব কি ! তাই তো স্থির করেছি আপাতত আমার যাত্রা স্থগিত থাক।'

'তুমি চিরদিনই ভাবপ্রবণ। কাঁচের বাসনের মত তোমার প্রাণ। একটু উত্তাপ লাগল কি অমনি চিড় খেল। না—তোমাকে যেতেই হবে। এমন করে নিজের পায় নিজে কুড়ুল মারার তোমার কোনও অধিকার নেই।'

'আমি আর যা-ই হই—একেবারে নাবালক নই। অনেক বিচার বিবেচনা করেই আমাকে এ পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। আমার কিছুতেই কলিকাতা যাওয়া হতে পারে না।'

'তুমি নাবালক না হতে পারো, কিন্তু সাবালকত্বেরও কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তোমার কাজে। আমার কথার তুমি কি এই পর্যন্তই গুরুত্ব দিলে? আমি কি তোমার ঠাট্টার পাত্রী?' কুসুম ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল। যা বলার নয় তাই বলে যেতে লাগল। 'ওকি তুমি হাসছ যে? এ অবস্থায় কারুর হাসি পায়? কেউ কি হাসতে পারে? একজন বিদেশী ভিন্ন জাতের ভিন্ন গোত্রের লোককে আমার পরিচয়ে খাটিয়ে, ভুগিয়ে, খরচান্ত করে, তুমি কিনা দিব্যি হাসছ! সাধে তোমার অন্ন জোটে না!'

পণ্ডিত বলে, 'চুপ কর কুসুম চুপ কর। আমি তো এ কথা ভাবছি নে এবং কবিও তো হাসছে না। তোমার বিষম ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, তা-ই যা দেখছ ভুল দেখছ।'

'হাসছে না! তুমি সদাশিব মানুষ, তুমি জানবে কি করে! মনে মনে হাসছে। এক জনকে ফাঁসি কাঠে তুলে দিয়ে সে-ই হাসতে পারে যে জহ্লাদ! ছাড়, আমি আর এখানে এক মুহূর্তও দাঁড়াব না। উঃ তোমার টাকা পয়সা পরিশ্রম সব পণ্ড হল শেষ কালে।'

কুসুম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—কিন্তু অনেক দূরে যেতে পারল না। পিছন থেকে বাধা পড়ল।

কবি ডাকল, 'কুসুম! যেও না, শোন।'

কিছুই সে শুনবে না। নিষ্ফলা লগ্নে আর তো ব্রত উদ্‌যাপন হয় না। তবু তাকে থামতে হয় মন্ত্রমুগ্ধা সর্পিনীর মত।

'আমি কেন মতের পরিবর্তন করেছি জানো?'

সকাল বেলা কবি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর কোথায়ও যায়নি—খাল পার ধরে এগিয়ে গেছে গাঁয়ের ভিতর। দুপারে গাছের তোরণ, মাঝখানে খালের কুলুকুলুধ্বনি। আকাশে নবমীর চাঁদ না থাকলেও সূর্য কিরণ তীক্ষ্ণ নয়। এ পথ দিয়ে সুস্থ মনে হাঁটলেই কবির মনে হয়

—এ বুঝি বা স্বপ্নপুরী। পল্লবে ফুলে লতায় পাতায় শুধু কানাকানি হয় বাতাসের সংগে—কখনও উদাস কখনও দেখা যায় তার আচমকা উচ্ছ্বাস।

কবির শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজিউর মন্দিরের কথা মনে পড়ে না। তার দেখতে ইচ্ছা করে ছোট ছোট মঠ বা পঞ্চরত্নগুলি—গ্রাম্য সাধারণের বাড়ীর পাশের নিজস্ব পারিবারিক শ্মশান-স্মৃতি। শিকড়ে বাকড়ে যেন মমতায় জড়িয়ে ধরেছে। ভেঙে মুছে যাবে, তবু যেন টেনে রাখতে চাইছে। এ কোনও বীরের উন্মত্ত হত্যা লুণ্ঠনের বিরাট বিজয় চিহ্ন নয়, কোনও বহু পত্নীক শাহান শা অর্থ বিলাসী সম্রাটের সৌখিন প্রেমের একনিষ্ঠতার জালিয়াতিও নয়। অতি ছোট, পুত্র পৌত্রাদির একান্তই মারমী উচ্ছ্বাস—তাই ভাল লাগে কবির।

'কত দূর আর যেতে পারলাম আমি! এই শ্যামা ধোপার বাড়ী পর্যন্ত জনার্দনের পানসি এসে ভিড়ল পাখীদের ঘাটে। পাখীর কথা সমস্তই বোধ হয় শুনেছ কুসুম। যদি না-ও শুনে থাকে আমার কথায় বুঝবে। চক্রবর্তী তাকে একেবারে পানের ছিবড়ে করে নিয়ে এসেছেন দেশে। তার গায় রক্তের চিহ্ন নেই। কোনও রকমে তুলে নিয়ে গেল তার বাপ ও মা এসে। বলত এ অবস্থায় আমি কি করে এদের ছেড়ে পালাই? তুমি তো অবুঝ নও, তুমিই একটা জবাব দাও?'

'এদের জন্য তুমি কি করবে? এমন তোমার কি শক্তি আছে যে এ ব্যাধি তুমি সমাজ থেকে মুছে ফেলবে? এ গ্লানি তো আজকের নয়। যেখানেই অর্থ, সেখানেই বিষ—এ তো অনেকটা সহনীয় ও স্বীকৃত সত্য।'

পণ্ডিত হঠাৎ মাথা নেড়ে বলে, 'না না। মানুষ তা কখনই স্বীকার করে নেয় নি—সে এখনও দানবের সংগে এঁটে উঠতে পারেনি এই পর্যন্তই বলা চলে। প্রকৃতির রীতি নয়, অন্যায়কে মেনে নাওয়া।'

'তা কবি কি করবে?'

'সে জবাব সে-ই দেবে, আমি কি বলব কুসুম!'

কবি বলে, 'শক্তি আমাকে অর্জন করতেই হবে। যদি প্রতিভা ব'লে কিছু আমাতে থেকে থাকে তা মানব কল্যাণই ব্যয় করতে হবে। এমন ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যার কোনও পরিমাপ নেই। পাখীর বিষয়ই আমি কেবল ভাবছিনে—ভাবছি পাখীর মত অজস্রের কথা, যাদের তালিকা থেকে তুমি আমিও বাদ পড়িনে।'

'তুমি এখন কি করতে চাও? সময় নষ্ট না করে ব'লে ফেল, আমরা বিদায় হই।'

'আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি, মুকুন্দ দাসের মত কবিয়াল হব। তার উদাত্ত কণ্ঠ...'

রাগের মাথায় কুসুম বাধা দিল, 'গলা নেই, তেমন তোমার তো তাল জ্ঞানও নেই একেবারে। হবে কি করে বলত?'

'জানি নে। তবে ভগবানের ওপরও ভরসা করিনে। কিছু আশা রাখি গণ-চেতনার ওপর।'

'তোমার আহার্য জোগাবে তারা, যারা এক বেলা খায় কি না খায়? আশ্চর্য হলাম কবি তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে। তোমার স্ত্রী কন্যার ভার নেবে কে?'

'ঐ তো বললাম জানিনে, শুধু আশা রাখি।'

'এ তো সর্বনাশা আশা, ভয়ংকর দুঃসাহস। ভাবলে মাথা ঝিমঝিম করে।'

'কিছু নিরাপদে আছে, কিছু স্বস্তিতে রয়েছ—তাই তুমি আমার সংকল্পের মর্যাদা বুঝছ না। মাথার ওপর এক হাত জলও যা, এগার হাতও তাই। মরব তো ঠিকই। কিন্তু মরার আগে উদ্যত ফনা তুলে ছোবল মেরে যেতে চাচ্ছি। আমি ভাল গান না জানি—গান বেঁধে গায়কের

গলা দিয়ে গেয়ে যাব। আমি তাল না জানি জনতার ভিতর থেকে তালিম আবিষ্কার করে তাল দিয়ে যাব—সমের ঘরে টোকা। বুঝলে কুসুম সমের ঘরে।'

পণ্ডিত মাথা নাড়ায় কবির বাক্য বিন্যাসের তালে তালে। গাংগুলীও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে তার বিশেষ তাৎপর্য। বিগলিত অর্থ নয়, নির্গলিত রহস্য।

'সমাজ বিপ্লবী কবিয়াল গুরু মুকুন্দ দাসের কথা মনে পড়ে আমার —কানে আসে তার কম্বু কণ্ঠ। সেই গেরুয়া আলখাল্লা পরা জনহিত ব্রতী সন্ন্যাসীর সাবলীল ভংগি ভেসে ওঠে চোখের সুমুখে। বহু স্থানে তার আসর মুগ্ধ করা গান শুনেছি। উদ্ধত জনতার মন সে বাঁকিয়ে এনেছে কণ্ঠের বৃশ্চিক কশাঘাতে। তেমনি একটা চারণ কবির দল গড়ব আমি। গায়ক বাদকের অভাব হবে না। লেখক তো রয়েছি নিজে।' কবি একটু থেমে ফের উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে, 'বহুবার আমি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছি. সৌখিন শপথ ও গ্রহণ করেছি যথেষ্ট। এবার কর্তব্যের দায়িত্ব নিয়ে নামতে চাই সরোজামিনে। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, পরগনা হতে পরগনায়, তারপর এক দেশ থেকে ভিন্ন দেশে গণজাগৃতির বাণী বহন করে যাব। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় দুঃখ নেই, সংসার যদি ভেসে যায় তার জন্যও টলব না। আজ আমাকে পাখী বড় দাগা দিয়েছে।'

হেনা কুসুমের কাছে এগিয়ে আসে। এ ভিড ও গভীর কথার মধ্যে পিতার কাছে যেতে সাহস পায় না। নীরব ভাষিণী মার কাছে গিয়েও বুঝি মন ভরবে না। তাই পিসীর অঞ্চল আশ্রয় করে বলে 'বাবা মরবে কেন পিসী, আমিই মরব। তুমি আর ঝগড়া ক'রো না। আমরা না-ই গেলাম কলকাতা।'

কুসুমের প্রাণটা হুহু করে ওঠে। সে হেনাকে নিয়ে তখনকার

মত অদৃশ্য হয় কবির সুমুখ থেকে। হেনাকে গোটা কয়েক চুমো খায়। ওর গালের ওপর গড়িয়ে আসা লোনা জল কুসুম মুছে নেয় সযত্নে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কুসুম দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। হেনাকে সান্ত্বনা দেয় নানাভাবে। নানাবিধ মিষ্টি কথা বলে মৃদু স্বরে। কিন্তু তার কান পাতা থাকে। কবি কি বলে তা শোনা যায় না স্পষ্ট, শুধু গুঞ্জরণ ভেসে আসে :

এই নিঃস্ব নিঃসম্বল লোকটির কি অদ্ভুত মানসিক শক্তি! যেন দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় প্রতিটি বাক্য উচ্চারণে। এই কি প্রতিভা? এই কি শিল্পী মনের কারুকর্ম? এরই কি সন্ধান পেয়েছে পণ্ডিত? সাধারণের মধ্যে অনন্য?

তাই হয়ত কসুম বুঝে ও বুঝতে পারছে না। হীরার ওজন যাচাই করতে চাইছে মুদিখানার কাঁটা-পাল্লায়! আপন স্বার্থ স্বার্থই নয় যে আসল স্বার্থ বোঝে। ব্যক্তি কেন্দ্রিক কুসুম ভাবতেই চাইছে না যে কবির নিজের সত্বা হারিয়ে গেছে দশের সমুদ্রে।

তবু কুসুম ভাবে।

সেদিন স্থগিত থাকে যাত্রা।

একচল্লিশ

পরদিন সকাল বেলা যথারীতি পণ্ডিত আসে, গাংগুলীও উপস্থিত হয়। বৈঠক বসে সমস্যা বহুল। আরও দু একজনকে দেখা যায়।

কুসুম আসে সালংকারা, সদ্য স্নাতা। তার্কিক কুসুম আজ যেন ধ্যান গম্ভীরা। একটা রাত্রি গত হয়েছে না তো একটা যুগ কেটে গেছে যেন।

কবি ভাবে, এ-ও তো এক লাঞ্ছিতা মাতৃমূর্তি!

গাংগুলী জিজ্ঞাসা করে, 'যা স্থির করেছ, তাই তো করবে, না কলকাতা যাবে ?'

'ও প্রশ্ন আর ওঠে না। যাওয়ার প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। বরঞ্চ অন্যান্য সমস্যার কথা চিন্তা কর—বিনা পয়সায় কি করে দল গড়া যায়। দল গড়তে হবে জোরাল।'

কুসুম বলে 'একেবারে এমনি তো কিছু হয় না। সামাজিক রাজনৈতিক, বৈপ্লবিক—যে কোনও কাজের পিছনেই চাই অর্থের, শ্রমের এবং ত্যাগের আহুতি। শ্রম ও ত্যাগের কোনও মাহাত্ম্য আমাতে নেই। তবে গোড়াতেই আমি কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাই—তাকি তোমরা নেবে ?'

কবি গাংগুলীর মুখের দিকে তাকায়।

'বুঝেছি সংকোচে পড়েছ। হয়ত না-ই করে বসবে দ্বিধায়। তাই এই আমি খুলে রাখছি আমার গয়না-পত্রগুলো। দশের কাজে আমি ইচ্ছে করে বিলিয়ে দিলাম—তোমরা অনুগ্রহ করে না ব'ল না—এই আমার অনুরোধ।'

পণ্ডিত এগিয়ে আসে। 'হে চারণ কবি আমার গ্রামের ধানজমিগুলোও রইল তোমার ভোগদখলে। তুমি এবং গাংগুলী প্রয়োজন মত ভাগ করে ভোগ কর।'

কুসুম বলে, 'ধান প্রচুর হয়, কিছুটা পক্ষীদের দিও। ওরাই দেবীপুরের বাড়ী ঘর পূজা পার্বণের দায়িত্ব নেবে।'

কুসুম উঠল। পণ্ডিত নিষ্ক্রান্ত হ'ল তার পিছনে পিছনে।

গাংগুলী বলল 'আমার গলা নেই, ভাষা নেই—অর্থ নেই। আমার শরীরও ভেঙে পড়েছে নানা উৎপাতে। তাই কবি আমি এ মহাব্রতের কি ভার নেব ? না আমি রইব অস্পৃশ্যের মত দূরে পড়ে ?'

'ক্ষোভ কর না শিল্পী। তুমি অপাংক্তেয় হতে পার না। অশরীরী

ভাব, ভাষা, কঠিন ব্যংগকে তুমি রূপ দেবে। ছবি এঁকে তুলে ধরবে মানুষের চোখের সুমুখে। আজ সবাই পিশাচের বর্বর স্বরূপটাই দেখতে চায়। দেখতে চায় মানুষের প্রাণের উক্তিগুলি লেখা রয়েছে প্লাকার্ডে পোষ্টারে। অক্ষম পুংগ, সর্বহারা স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেরই কিছু না কিছু করণীয় আছে এ সংগ্রামে। তুমি ভাবছ কেন ভাই?'

গাংগুলী হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরে যায়। এ সুমহান দায়িত্ব সে নিশ্চয় পালন করবে। সে অপূর্ব উদ্দীপনা বোধ করে আনন্দের গুরু বেদনায়।

রাত জেগে সুস্থ মনে নাটক লিখছে কবি। আকাশে চাঁদ উঠেছে ত্রয়োদশীর। জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ভিতর। দীপাধারে উজ্জ্বল শিখা, বাইরে চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রকৃতি।

আজ যেন প্রতিভার শুভতম এক বিকাশ রজনী। শকুন্তলা, কিম্বা মেঘদূত নয়—অযুত জনতার মর্মকাহিনী লিখছে বিংশ শতকের এক কবি। গান-বিপ্লবকে ঝড়ো কোন থেকে ডেকে আনছে সেই কলমে, যে কলম দিয়ে এতদিন লিখেছে মিথ্যার অংক। ক্রীতদাস বিদ্রোহ করেছে—তাই শব্দ সম্ভার হয়েছে অগ্নি স্ফুলিংগে পূর্ণ।

কবির অবচেতন মনের তলা থেকে ব্রজদাস নাটকের নায়ক হয়েছে। শায়কের মত তীক্ষ্ণ জ্যোতি ছড়াচ্ছে পাখী, রসুল প্রভৃতি। দেখা যাচ্ছে শাণিত কুঠার।

ব্রজদাসকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কবি এতদিনে তার অজ্ঞাতেই সে প্রতিশ্রুতি পালিত হতে চলেছে। রাত জেগে নাটক লিখছে কবি—অংগীকার পালন করছে স্মিতমুখে নীরবে।

'কে? কার পদশব্দ?'

'আমি কুসুম?'

‘তুমি যাওনি ?’

'না, দিন নেই। আর তুমি তো হুকুমও দাওনি, কি লিখছ ?’

‘একখানা নাটক—শেষ হয়ে গেল। আজ আমি অন্তত আংশিক ঋণ-মুক্ত ব্রজদাসের কাছ থেকে। কিন্তু তুমি যে অসময়ে ?’

‘এখন আমি কি করব ?’

কবি কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখল। বসতে বলল কুসুমকে। হেনা ও মলিনা এ ঘরে ছিল না। তারা অন্যত্র সুপ্ত।

‘আমি কি করেছি কুসুম ?’

‘তুমি সর্বত্যাগী ভোলানাথ। তোমার সংগে কি আমার তুলনা সাজে ? আমি এক রক্ত মাংসের নারী।

‘না—আমি সর্বত্যাগী নই। অথচ কর্তব্যের জন্যই আমাকে সমস্ত ত্যাগ করতে হয়েছে। কঠিন হতে হয়েছে—পাষাণ হতে হয়েছে। তবু কুসুম আমি সুখী। যদি আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী হই, তবে জেনো আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলবে—তুমিও সুখী হবে পণ্ডিতকে নিয়ে। তা ছাড়া আমরা যে কঠিন ব্রত নিয়েছি তাকেই এখন প্রধান্য দিতে হবে। মানুষ যদি না বাঁচে তবে তার কামনা বাসনা বাঁচবে কি করে? সেই ধ্বংস রোধ করার একটা বড় কেন্দ্র হবে কলকাতা। আপদে বিপদে আমর আশ্রয় নেব তোমার বাসায়। আজ আর একার কথা না ভেবে বহুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দাও। হুকুম চাইছ, আমি বলছি, তুমি পণ্ডিতের সংগে যাও।’ কুসুমের মাথায় কবি হাত বুলাতে বুলাতে স্নেহভরা কণ্ঠে বলে, ‘যাও কুসুম সুখ পাবে। হয়ত আমার কথায় আজ কাব্যের ঝংকার নেই, কিন্তু দায়িত্বের ও কর্তব্যের মধুরস আছে—যা বয়সের এবং কালের অতীত কি করবে—স্মিত মুখে জবাব দিয়ে যাও কুসুম ?’

‘আমি কলকাতা যাব।’

বেয়াল্লিশ

কুসুম চলে গেছে। তারপর প্রায় সম্পূর্ণ দুটো মাসই কেটে গেছে, কিন্তু নাটক জমছে না। প্রথম প্রথম মহলার সময় যে অভাবনীয় জনসমাগম হয়েছে, উদ্দীপনা দেখা গেছে গ্রামের ভিতর—এখন আর তা দেখা যায় না। সব যেন ঝিমিয়ে পড়তে চাইছে। দু এক রাত্রি অভিনয় হয়েছে, কিন্তু বড় নিষ্প্রাণ।

কুসুম চলে গেছে!···

সে তো কিছু সংগে নিয়ে যায় নি। স্বর্ণ, অর্থ এমন কি তার মনের অপূর্ণ বাসনাখানাও কবির হাতে সঁপে দিয়ে গেছে—দিয়ে গেছে তারই ইচ্ছামত পূর্ণ করতে, রঙ্ দিতে তারই কল্পনায়।

দুজনার গান, দুজনার প্রাণ, দুজনার মান অভিমান যদি সহস্রের বুকে মিশিয়ে দিতে চায়, তাই দিক কবি! দুর্বিনীতা মেয়ে সব সঁপে দিয়ে গেছে। দিয়ে গেছে যেন ব্রতের প্রদীপখানি কবির হাতে তুলে।

কবি সংকল্প নিয়েছে, কুসুমকেও বুঝি বা ভুলেছে কিন্তু সিদ্ধির দুয়ারে কেন পৌছাতে পারছে না? এ তো বিষম লজ্জার বিষয়। এত মেঘাড়ম্বর, যদি এক ফোঁটাও জল না পড়ে!

'স্নান করতে যাও, দুপুর গড়িয়ে গেছে—মেঘে মেঘে বেলা বোঝা যাচ্ছে না।'

'মেঘ! কি বলছ মলিনা, মেঘের সঞ্চার হয়েছে? সর্বনাশ, এ তো ভাবতেই পারছিনে আমি।'

কবি বাইরের দিকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। সত্যই মেঘের স্নিগ্ধচ্ছায়া পড়েছে আকাশে, অংগনে, প্রান্তরে। গাছপালার শ্যামলতা আরও যেন মনমুগ্ধকর হয়েছে। বেঙের দল ডেকে উঠেছে উল্লাসে। কিন্তু কবির এ বায়ুরোগ কেন? অনেকটা যেন জলাতংকের মত।

'আষাঢ় মাস কি আসবে না ? আজ যে মাসের সাত দিন।' মলিনা বল্‌ল, 'কিছুর তো হিসেব রাখবে না। অভ্যেসই নেই কোন কালে। তবু একখানা পাকা খাতা ছিল, আমি এতদিন নিশ্চিন্তই ছিলাম। তাও পাঠিয়ে দিলে কলকাতা। চল চল স্নান করতে যাবে।' মলিনা এসে স্বামীর হাত ধরে।

'তুমি পরিহাস করছ মলিনা ?'

এ মলিনার পরিহাস নয়। সামান্য উচ্ছ্বাস মাত্র।

স্বভাব থেকে জন্মেনি। এসেছে স্বাচ্ছন্দের অনুকূল প্রবাহে হৃদয়ের উপকূল প্লাবিত করে। সে ঠিক বোঝে না, ঠিক বোঝাতেও পারবে না। তাই চুপ করে থাকে। সে শাক, শুক্ত করে ধীরে ধীরে বসে কত যে আজ রেঁধেছে তন্ময় হয়ে !

'আষাঢ় এল, গানের দল তো ভেঙে দিতে হবে কিন্তু কাজ কিছু এগুল না। হিসেবে গানের বছর একটা গত হল বৃথাই।'

'তোমাকে তো কেউ জবাবদিহি করছে না। চেষ্টা যত্নে যদি ফল লাভ না হয়ে থাকে তার জন্য কি তুমি দায়ী ?' গাংগুলী দাওয়ায় উঠে বসল। মলিনা ভিতরে সরে গেল।

'নিশ্চয়।'

'সে কেমন ?'

'আমার আন্তরিকতায় ত্রুটি আছে, আমার কাজে গলদ আছে। এ সমস্তই আমাকে সংশোধন করতে হবে। নইলে কৃতকার্য হওয়া এত সহজ নয়। কিন্তু একটা বছর তো পিছিয়ে গেলাম।'

গাংগুলীও লজ্জা বোধ করল। তারও তো দায়িত্ব কম নয়। কুসুমের দেওয়া গয়না বেচা টাকায় আপাতত উভয়েরই সংসার চলছে। ধানের মরসুমের যথেষ্ট দেরী আছে। তার পূর্বেই মান না যায়। গাংগুলীর কণ্ঠের দুয়ারে যেন এতদিনের ভুক্ত অন্নগুলো ঠেলে উঠতে লাগল।

'কি করা যায় কবি ?'

'আজ সন্ধ্যার পর যারা সত্যই সহানুভূতিশীল তাদের একত্র কর—ডেকে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমাদের কর্তব্য কি ? আরব্ধ কর্ম তো অর্ধ সমাপ্ত রেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। তুমি খবর দেবে না আমি যাব ?'

'আমিই যাব কবি। আমার তো পাখীকে দেখতে যেতে হবে, তখন না হয় গ্রামটা চক্কোর দিয়ে আসব।'

'ভাল কথা, পাখী কেমন আছে ?'

'সেরে উঠছে। ভয়ংকর রক্তশূন্যতা, নিতান্ত ভাগ্যের জোরেই বেঁচেছে।'

'আর তোমার চেষ্টা, যত্ন, ওষুধের বুঝি কোনও মূল্য নেই—এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই শিল্পী।'

'কোথায় বৈঠক হবে ?' গাংগুলী জিজ্ঞাসা করল।

'কেন আমার বাড়ীতে।'

গাংগুলী উঠল। কবি স্নান করতে গেল। খেতে বসল নিতান্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে। মলিনা ধীরে ধীরে সমস্ত পরিবেশন করল অত্যন্ত পরিপাটি করে। বাটির অভাব সে পূর্ণ করেছিল অন্য বাড়ীর থেকে চেয়ে এনে। যতক্ষণ কবি আহার করল মলিনা রইল উদ্গ্রীব হয়ে। শুধু গুটি দুই কথা, একটুখানি বিস্ময়—কিছুই বলল না বা প্রকাশ করল না তার স্বামী। কবি উঠে গেল। মলিনা একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করে আহার করতে বসল। বিধাতা এক একজনকে এমন দায়িত্বের নিরেট বোঝা দিয়ে পাঠান যে সে এক তিলও সময় পায় না অন্য কিছু ভাবতে। সারাজীবনই কবির এইভাবে কাটল। বাকীটাও হয়ত এমনি কাটবে। তবে এ গৌরব সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বিধাতা দেন লক্ষ জনের ভিতর এক জনকে এ গুরুভার বইতে। মলিনা আহার শেষ করে

হৃষ্টচিত্তে। সে প্রেম নয়, জানতে চেয়েছিল ব্যঞ্জনের স্বাদ—এখন কি যেন কি এক বৃহত্তর ব্যঞ্জনার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তার সারা দেহ মনে।

সন্ধ্যার একটু পরই গাংগুলীকে দেখা গেল হাস্যমুখে। কবিকে দেখা গেল সামান্য কিছু পান ও তামাকের আয়োজন করে বসেছে। কুসুমদের বাড়ী থেকে চেয়ে এনেছে একটা শতছিদ্র সতরঞ্চি। একটা ভাঙা লণ্ঠন পরিষ্কার করে জ্বালান হয়েছে। সেটা মেঝেতে নেই। দড়ির সাহায্যে ঝুলান হয়েছে নিশানী আলোর মত।

গাংগুলীর পিছু পিছু শুধু একটি লোকই এসে হাজির হল—যে প্রতিজ্ঞা মত দৃঢ় এবং ঋজু। ঠিক তেমনটি রসুলের গঠন ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু কবির কাছে আজ সেইরূপ নিয়েই আবির্ভূত হল সে।

'তামাক খাও, পান খাও রসুল। আর কারুকে দেখলে?'

'না।'

গাংগুলী বলল, 'আসবে। সবে তো সন্ধ্যে। সারাদিন খেটে-খুটে একটু বিশ্রাম না করে, কিছু না খেয়ে কি কেউ আসতে পারে?

'তা বই কি, তা বই কি—রসুল তামাক খাও।'

কলকি?' রসুল জিজ্ঞাসা করল, 'কলকিটা কোথা গো?'

একখানি শীর্ণ সুন্দর হাত প্রায়ান্ধকার বারান্দার থেকে কলকিটা খুঁজে দেয়।

'কে, মা লক্ষ্মী? কাঁচা চোখ!' রসুল হাসে। সংগে সংগে শুভ্র দুপাটি দাঁত বের করে হেনাও হাসে ক্ষণপ্রভার মত! তারপর অত্যন্ত গম্ভীর মূর্তি ধারণ করে, যেন একটা শাদা প্যাঁচা।

বেশী কথাবার্তা হয় না। রসুলও গাংগুলী পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বসে থাকে। ক্রমেই লণ্ঠনটা ধোঁয়ায় কালিতে মলিন হয়ে ওঠে।

কবিরা পড়শি গৃহস্থের বুঝি খাওয়া দাওয়া সাংগ হল। দু এক টুকরা মেঘ হাওয়ায় উড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টি পড়ল ঝির ঝির করে।

'রসুল তামাক খাও।'

কোন কাজ নেই। রসুল আবার তামাক সাজল। গাংগুলী কিম্বা কবি তামাক খায় না। সে টেনে-টুনে ভাল করে খেয়ে কল্‌কিটা একপ্রান্তে রেখে দিল। অসাবধানতার দরুণ হেনার গায় গরম কল্‌কিটা আর একটু হলেই বুঝি ঠেকত। হেনা সরে বসে ফিক করে হাসল। আবার প্যাচার মত গম্ভীর হল নিমেষে।

'এটা আষাঢ় মাস—না রসুল?'

'হ্যাঁ কবি ঠাকুর।'

'তামাক খাও।'

'এই মাত্তর তো খেলাম।'

'ও— পান খাও।'

'আমি তো খাইনে।'

'তা বটে!'

লণ্ঠনটা এখন আর নামিয়ে পরিষ্কার না করলে চলে না। এমন এক ভাবে আর বসেও থাকা যায় না। গাংগুলী বুঝি ঝিমিয়ে পড়েছে। শৃগাল ডেকে উঠল দ্বিতীয় প্রহরের। কবি সচকিত হয়ে বলল, 'রসুল তামাক খাও।'

বিরক্ত না হয়ে রসুল পুনরায় কলকিটা তুলে নিল। ধীরে ধীরে তামাক সেজে, চোখ বুজে টানতে লাগল।

'আর বোধহয় কেউ আসবে না।' তন্দ্রা ভেঙে গাংগুলী উঠে বসল। 'কিন্তু আমি তো প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী ভাল করেই বলে এসেছি। হয়ত ভয় পাচ্ছে।'

'কি, ভয় পাচ্ছে? আসবে না?' হঠাৎ যেন মনে হল কবি জলে

উঠল সর্পিল বিদ্যুৎ লেখার মত। হেনা অবাক হয়ে গেল, গাংগুলী স্তম্ভিত হয়ে রইল, রসুলের হাত থেকে পড়ে গেল কল্‌কিটা। দুয়ারের পাশ থেকে মলিনা স্বামীর এ বীর্যবান রূপ আজ প্রথম প্রত্যক্ষ করল।

'তোমরা একটু বস। দেখি কে না এসে পারে! বিছানা থেকে টেনে আনব—আসবে না!'

কবি একটা উৎক্ষিপ্ত উল্কা পিণ্ডের মত অন্ধকারে একা বেরিয়ে গেল। রসুল শক্ত হয়ে বসল। গাংগুলীর কপাল ঘেমে উঠেছে ইতিমধ্যে।

মলিনা শংকায় চোখ বুজে রইল। বর্ষার জংলা পথ—জন্তু জানোয়ারের কথা না হয় বাদে দেওয়াই গেল, বিষাক্ত সাপও তো থাকতে পারে।

হেনা বলল, 'মা, বাবাকে ডাকব।'

'না। পেছন থেকে বাধা দিতে নেই।'

তেতাল্লিশ

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কুড়ি পঁচিশ জন মানুষ নিয়ে কবি ফিরে এল। হাঁটু পর্যন্ত জল কাদা নিয়েই কবি দাওয়ায় উঠল। বাকি সবাই এল হাত পা ধুয়ে পুকুর ঘাট থেকে।

কবি অভিনন্দন বা আপ্যায়ণ জানাবার কথা ভুলে গেল। কারুকে পান তামাক পর্যন্ত খেতে বলল না।

'তোমরা কি মনে করেছ? এ কি আমার একার কাজ, না একার দায়িত্ব? তোমরা দিব্যি নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুবে, আর আমি মরব কিনা ছুটোছুটি করে—এ আমি কিছুতেই পারব না, তাতে দল থাক, আর যাক।' উত্তেজনার আতিশয্যে তার যুক্তির রজ্জু শিথিল হয়ে যায়। সে বলে, 'জীবনে অনেক লাঞ্ছনা এবং অপমান পেয়েছি ও সয়েছি

তোমরা আর আমার এমন কি ক্ষতি করতে পারবে? কিন্তু জেনে রেখো, এবার দল না জমলে সুখ হবে না কারুর যাদের বন্ধু ভাবলাম, তারাই জোট হয়ে আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিলে।'

লণ্ঠনের শিখায় কালি জমেছে। কারুর মুখ দেখে চেনার উপায় নেই। শুধু কণ্ঠস্বরই ভরসা! কবির ভিতরের অভিমান ঠেলে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে শিল্পী তা বুঝল। সেই উচ্ছ্বাসের মুখে কোনও যুক্তি দাঁড়িয়ে দানা বাঁধতে পারবে না। তাই সে কবিকে বাধা দেওয়ার ছলে চুপ করে স্থির হতে বলল। যাদের কাজ তাদের ভূমিকাটা কি তা তো ওভাবে উপলব্ধি করান যাবে না। 'কবি একটু সবুর কর ভাই—ওদের পান তামাক খেতে দাও।'

'ভাল বললে গাংগুলী। ওদের কি আমি পান তামাক খেতে নিমন্ত্রণ করে এনেছি? একি নাচের আসর, না গানের মজলিস, না আমার ছেলের বিয়ে? পান তামাক মিঠাই মণ্ডা দেওয়ার জন্য তো ওদের ডাকা হয়নি।'

আগন্তুক মানুষগুলো হতবাক হয়ে গেল। গাংগুলীও নীরব হয়ে রইল। এ তির্যক উক্তির শূল যেন তাকেও বিদ্ধ করেছে। কবির কি বুদ্ধিভ্রংশ হল? সে যে গড়তে গিয়ে ভাঙনটাই এগিয়ে আনছে অজ্ঞাতে।

'দেখ এদের কাণ্ডজ্ঞানের বহর। যার সব চেয়ে আগে আশা উচিত সেই পাথীর বাবাই অনুপস্থিত। ভেবেছে ঝড়ের সংগে আপোষ করে বসত করবে ভাঙা ঘরে। তা হয় না, খুঁটির গোড়া শক্ত করা চাই। যমের সংগে মানুষের আপোষ নেই। যুদ্ধ করেই বাঁচতে হবে।'

এমন সময় দপ্ করে উঠে লণ্ঠনটা নিভে গেল। যাও কিছু দেখা যাচ্ছিল, এবার গভীর অন্ধকার। তিরস্কৃত অভিযুক্ত মানুষগুলো বোকার মত বসে রইল।

'কবি ঠাকুর আলো কই, আঁধারে বসে কি চুরির পরামর্শ হচ্ছে ?'

গাংগুলী ধীরে ধীরে বলল, 'কার গলা ? পাখার বাপ শ্যামাধোপার না ? এইরে সব বুঝি শুনে ফেলেছে !'

'ভয় করছ কেন গাংগুলী ? দেরী করে কাজ পণ্ড করবে আর দুটো কথাও শুনবে না ।'

শ্যামাধোপা এগিয়ে এল। অন্ধকারে পা পিছলে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। ভাগ্যে চৌকাঠটা ছিল হাতের কাছে। সে অসম্ভব রকম হাঁপাতে লাগল। পাখীটা বাড়ী আসার পর এবার তার হাঁপানীটা নতুন সৃষ্টি হয়েছে।

'বলবে না কেন মন্দ নিশ্চয় বলবে। যার কপাল খারাপ তার ঘরের ঢেঁকিটাও হয় কুমীর।'

উপমাটা খুব জুত সই হক আর নাই হক, ব্যথাটা কিন্তু প্রকাশ পেল। কারণ এর পিছনের গল্পটা সকলের জানা ছিল। কবে কোন বেঙমা বেঙমীর যুগে যেন কোন দরিদ্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্তা একটি বৌ তার ছোট্ট শিশুটিকে ঢেঁকির জিম্মায় রেখে ঘাটে গিয়েছিল। ঘরে ফিরে দেখে, যে ঢেঁকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শিশুর নিরাপত্তার সেই কুমীর হয়ে খেয়ে গাংগের দিকে যাচ্ছে সরসর করে।

সর্বত্র কেরোসিন তেলের বিষম অভাব—একটা সরষে তেলের প্রদীপ এল।

কবি এবং উপস্থিত সবাই বুঝল, হ্যাঁ, একমাত্র বিশ্বাসী প্রাচীন ঢেকি কুমীর হলেই ভুক্ত শিশুর পিতা মাতার এমন চেহারা হতে পারে।

'মাপ কর শ্যামাদাস আমি বুঝতে পারি নি।'

'হাটে গিয়েছিলাম, বন্যার উজানে বৈঠা মেরে এক হাত এগুই তো তিন হাত পিছোই। দেরী হয়ে গেছে—আমারই তো দোষ, তোমরা বসে আছ, আমাকেই ক্ষমা কর সব্বাই। ঢেঁকিতে আমার সন্তান

খেয়েছে আমি কি না এসে পারি !' শ্যামাদাস ফুঁপিয়ে ওঠার আগে আবার হাঁপিয়ে ওঠে। মিনিটখানেক ধরে চলে বেদম কাশি।

একটু সুস্থ হলে রসুল সর্বসন্তাপহরা কল্‌কিটি অতি যত্নে তার সুমুখে ধরে, ধোপার পো একটু তামাক ইচ্ছা করেন।'

শ্যামাদাস তামাক খেতে মনোযোগী হয়। এক ঝাপ্‌টা ইলশেগুড়ি উড়িয়ে নিয়ে আসে বন্যার বাতাসে বারান্দায়। শ্বেত পেচকটি ঠায় বসে আছে। সে ত্বরায় ডানা মেলে প্রদীপ সামলায়।

'আমার উদ্দেশ্য কি তোমরা হয়ত বুঝেছ। এ কিন্তু সখের যাত্রা, টপ্পা কিংবা কীর্তন গান নয়। মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে সমস্ত অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে হবে। ফাঁস করে দিতে হবে ঢেঁকির কুকীর্তি। যে ঢেঁকিতে ব্রজদাসের সংসার ভাঙে, বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে তার মেয়ের ওপর জুলুম করে, যে ঢেঁকিতে মানুষের জমি জমা ভদ্রাসন গিলে খায় তার বিরুদ্ধে লড়াই।'

নিধুরাম একটু গোঁয়ার গোছের মানুষ। সে মাথাটা নেড়ে মন্তব্য করে, 'আমরা তো তাই চাই কবি। বুদ্ধির ঢেঁকির শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে চাই। উঃ কী বজ্জাত! গান গেয়ে কি হবে, চল একেবারে গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনি। আমি নিয়ম মত খাজনা আদায় দিচ্ছি, আমার ভাইয়ের বকেয়ার জন্য নিলামে তুলেছে আমারও জমি—বলে কিনা এজমালী সম্পত্তি! এজমালী তো বুঝলাম, তবে আমাকে ঠকালি কেন? চল আজ এই রাত্তিরে—' নিধুরাম একেবারে প্রস্তুত। সে একখানা নতুন গামছা কাঁধের ওপর থেকে নিয়ে মোচড়াতে থাকে মহা আক্রোশে।

কবি সবিস্ময়ে ভাবে, এ তো ব্রজদাসের মতই আর একটি মূর্ত বিপ্লব। হয়ত তার চেয়েও ধারালো। এর মধ্যে বৈষ্ণবীর কর্দম নেই। শুধু ধার, শুধু ইসারার অপেক্ষা। আসরে নেমে খুব ভাল করে

গান এখনও গাওয়া হয়নি, তার ভিতরই এত সাড়া! 'সাবাস নিধুরাম। সাবাস! কিন্তু মানুষ জড়ো করতে হবে। একা একা লাফিয়ে পড়লে তো হবে না। তাই প্রথম চাই গানের মহলা, তারপর বাঁড়ী বাড়ী অভিনয়, তারপর যা ইচ্ছা হয় এক জোট হয়ে কেন কর না! মনে রেখ, একটা সূতো দিয়ে কখনও হাতী বাঁধা যায় না মিছিমিছি জল ঘুলিয়ে নাম হাসিয়ে লাভ নেই।'

'ঠিক বলেছ, ঠিক কবি। আমরা সবাই মিলে আগে গানের দলটা ... করে চালু করব।' সকলে উল্লাসে কলরব করে ওঠে।

প্রদীপটা উজ্জ্বল করে দেওয়া হয়। এই মানুষগুলোর অনেকের অক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত নেই। তবু এরা নানা তত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়ে। বৈষয়িক প্রজ্ঞা ঝলমল করতে থাকে এদের রোদে পোড়া তামাটে মুখে ও চওড়া কপালে। কারুর ললাটে দেখা যায় গভীর কুঞ্চন। নানা জাতির মানুষ, কবির চোখে এক জাতিতে পরিণত হয়। নানা পেশার মানুষ এক নেশাতে অধীর হয়ে ওঠে। ওরা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়। গানের পটভূমি থেকে সর্বাত্মক সংগ্রামে।

স্থির হয় এবার নায়ক নায়িকা এবং গায়ক বাদক যত দূর সম্ভব গ্রামের ভিতর থেকে বেছে বার করতে হবে। নইলে টাকা পয়সা ব্যয় করে বিদেশ থেকে লোক আনা যাবে না। তাদের ভিতর যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে সর্বনাশ অনিবার্য।

দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তিনটি লোকের অভাব হচ্ছে। নায়ক, নায়িকার ও একটি ছোট্ট মেয়ের। সমস্যা আবার জটিল হয়ে উঠল। যদি এই সময় ব্রজদাস থাকত। সে গান জানত। তাকে দিয়ে নায়কের পাঠটা নিশ্চয় চমৎকার উতরে যেত। তারপর নায়িকা—সে একটা কিছু ব্যবস্থা হতই।

রাত্রি অধিক হয়েছে। যে যার উঠে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে

পড়ল। আবার আগামী কল্য এদের দিকে হিংস্র দংষ্ট্রা মেলে রয়েছে। সকলেই তো রোজ আনে রোজ খায়।

'তোমরা তো বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছ, এদিকে যে সব বানচাল হয়ে গেল।' কবি ধরা গলায় বলে, 'কি করবে গাংগুলী? ঢেউ নেই, তুফান নেই তবুও কি নৌকা পারে ডুবিয়ে দিতে হবে?'

যারা যারা শ্রান্তির শেষ সীমায় এসে পৌছেছে, তারাও আবার বসে পড়ে। দারিদ্র্যে এবং দৈন্যে যাদের হাড়ের রস পর্যন্ত শুষে নিয়েছে, তাদের মনও রসাপ্লুত হয়ে ওঠে কবির আকুতিতে। অক্ষম আত্মীয় যেমন কোনও মৃত্যু-পথ-যাত্রী বান্ধবের দিকে তাকায়, তেমনিভাবে ওরা কবির দিকে তাকাতে থাকে। ছলছল করে শ্যামাদাসের চোখ জোড়া।

দোর গোড়ায় শব্দ হয়। মায়ের দেহের নির্যাসের মতই হেনা মলিনার অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে। যেন মূর্তিমতী সহানুভূতি। কখন যে শ্বেত প্যাঁচা উঠে ঘরে গিয়েছিল, কখন যে মার সংগে ফিসফাস করে কথা বলেছিল, তা কেউ বুঝতে পারে নি। হেনা পিতার গলা জড়িয়ে ধরে আবদার করে, 'আমি ছোট্ট মেয়েটার পাঠ বলব বাবা। তুমি বারণ করতে পারবে না।'

এ আবদার কি রোধ করা যায়? কবি মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে।

শুভ কার্য যখন চরম হয়ে ওঠে তখন কতকগুলি অদ্ভুত যোগাযোগ অচিন্তনীয় ভাবে সংঘটিত হয়। উঠানের ওপর কাদার ছপ্‌ছপানি শোনা যায়—বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সকলে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ভিতরে ভিতরে খানিকটা ভয়ও পায়। জমিদার বাড়ীর লোক নাকি? হ্যাঁ, রক্ষিতাই তো অমনি ভাবে হাঁটে। তেমনিই তো গঠন। তেমনিই তো লম্বা চওড়া। আবার ঐ শনি কেন এখানে?

চেনা ভিতরে চলে যায়। অন্যান্য সকলের মুখে রূঢ় ছাপ পড়ে। কবি একঠা সুকঠোর আপ্যায়ণের ভংগিতে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়।

ছায়াটা ক্রমশ নিকটবর্তী হয়ে আসে। মানুষ না ভূত ?

চুলগুলো তৈলাভাবে ঘন বাবড়ি? দাড়ি গোফ নৈমিস্যাবণ্য। চিনলেও কি সহজে চেনা যায় !

মানুষটা আর একটু কাছে এলেই কবি লাফিয়ে পড়ে। সকলে উল্লাসে হৈচৈ করে ওঠে, 'এই যে আমাদের দাস কেমন করে এলে ভাই ?'

নিধু একেবারে কোমরটা জড়িয়ে ধরে দাসকে বারান্দায় তুলে আনে।

প্রমাণাভাবে ব্রজ খালাস পেয়েছে।

এদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে মলিনা লক্ষ্য করে না। পাশের ঘরের একটি ঘুমন্ত বৌকে ঠেলা দিয়ে তুলে আনে। সামান্য কিছু মিষ্টি ঘরে ছিল। তা বার করে দেয় একখানা রেকাবীতে। সকলে একটু একটু মুখে দেয়। অবশেষে হুলুধ্বনি শোনা যায় দশ ঝাঁক। নৈশ স্তব্ধতা ভংগ করে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে দিগন্তরে।

চুয়াল্লিশ

চক্রবর্তী চমকে ওঠেন। এ কি ? তাঁর যে কান বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কি মোকদ্দমায় জিতল নাকি ? তিনি শয্যায় উঠে বসলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া এ তল্লাটে কি কেউ জিততে পারে মামলায় ? কার এত বুদ্ধি আছে বা পয়সার জোর রয়েছে ? তিনি কারুর নাম স্মরণই করতে পারেন না।

তবে কি কারুর শুভ যোগাযোগ হল, না কোনও বিশেষ কল্যাণ

হয়েছে ? কেউ কি ব্যবসা বাণিজ্য করে লাভ করেছে প্রচুর ? না জমি ক্ষেত খরিদ করেছে জলের দরে ? ছোটদি নেই। থাকলে জনার্দনের এত আশংকা করতে হত না। তিনি শুয়ে শুয়ে নিবৃত্ত করতে পারতেন এ উৎকণ্ঠা। বাপ বেঁচে থাকতেই জয়ন্তী দড়ো হয়ে উঠেছিলেন, এখন হয়েছিলেন একেবারে পাকা। সংসার, মামলা-মোকদ্দমা, এমন কি আদালত ফৌজাদারী পর্যন্ত তিনিই চালাতেন। এমন নিঃস্বার্থ মমতাময়ী ললনা তাঁর চোখে আর দ্বিতীয়টি পড়ে নি। ছোটদি চলে যাওয়ায় তাঁর এত বড় ক্ষতি হয়েছে যা পূর্ণ হবে না কোনদিন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-জিউর মন্দিরে কি এখন দেবতা আছে ? থাকলে সে লোক সমারোহ কোথায় ? মানুষই দেবতা—সেই দেবতা চলে গেছে ভক্তের সংগে সংগে। পড়ে রয়েছে পাথরের কংকাল। সে জাগ্রত বিগ্রহ আর নেই। তাই এত অবিচার, অনাচার।

এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কবি। উঃ এত বড় বিশ্বাসহন্তা আছে ? এত দিন যাঁর নুন খেয়েছে, তার গৃহেই আগুন দিতে উদ্যত। দুটো পাওয়ালা জীবকে সাধে বিশ্বাস করতেন না ছোটদি !

'রক্ষিত, রক্ষিত !'

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। সকলেই সুষুপ্ত। প্রকৃতি পর্যন্ত তন্দ্রাতুর। বনে জংগলে জোনাকী ওড়ে কি ওড়ে না। কীট পতংগ আহার অন্বেষণ করে কি করে না। বর্ষার বেঙগুলো ডেকে ডেকে একটু চুপ করেছে। এ সময় যত বিশ্বস্ত কর্মচারীই হক না কেন, রক্ষিতের পক্ষে কি উত্তর দেওয়া সম্ভব ?

জনার্দন উঠে ধীরে ধীরে দ্বার মুক্ত করলেন। বর্ষার দমকা হাওয়া সহসা ঘরে ঢুকে সব লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে দুয়ার সশব্দে বন্ধ করে দিল। নিভে গেল সারারাত্রের পরিশ্রান্ত আলোটা।

চক্রবর্তী ভয় পেলেন। দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলেন, 'বিশ্বাসঘাতক।'

বাইরে একটা দীর্ঘাকৃতি ছায়া না?

জীবনে তিনি অসংখ্য গর্হিত কাজ করেছেন, কিন্তু এবারেরটা তাঁকে অত্যন্ত সংকুচিত ও ভীত করে ফেলেছে যেন। একে জয়ন্তী নেই, দ্বিতীয়ত কবির নব জাগরণ। তৃতীয়ত কোনও ফয়সলাই হল না জোটের মঙ্গলের। চারদিক থেকে মেঘ এসে যেন এক স্থানে জমছে—ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ।

'রক্ষিত! রক্ষিত!'

অনেক ডাকাডাকি ও হাঁকাহাঁকির পর রক্ষিত এসে উপস্থিত হয়।

'এখনও চোখ রগড়াচ্ছ, হুলুধ্বনি শোননি?'

,না।'

'তা শুনবে কেন? ছোটদি নেই, এখন তোমাদের কানের কাছে শাঁখ বাজালেও শুনবে না। ত্রাস না থাকবে কি পেয়াদা, পাইক, নায়েব, গোমস্তা কেবল মিষ্টি কথায় কাজ করে? হুলুধ্বনি শুনলাম গোনা দশ ঝাঁক, কারণটা জেনে এস।'

'কোন দিক থেকে শব্দটা এল?'

'তা আমি জানব কি করে? অনুসন্ধান করে জেনে এস। একটি মানুষের অভাবে তোমাদের বুদ্ধি বিদ্যা কি ভোঁতা হয়ে গেছে? তোমরা যদি সময় মত সংবাদ দিতে তবে কি সেদিন কবি, কবিগান গেয়ে আমাকে এত হাল্কা করতে পারত দশ জনের সামনে?'

'লোকজন সংগ্রহ করে যেতে যেতেই তো গান গেল ভেঙে।'

'হু!'

'আগে থেকে তো কেউ তৈরী ছিল না। লেঠেলদের—'

'কেন ডাকতে হবে? কেন সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয় না?'

'সে তো দোষ হয়েছে। কিন্তু আচমকা যদি কিছু ঘটে···

'যদি কিছু ঘটে—হু!'

এ যদিরই জিনিষ বটে! তাঁরই বুকের ওপর দাঁড়িয়ে, তাঁরই এক্তিয়ারের প্রজা হয়ে তাঁকেই আঘাত। অস্পষ্ট অন্ধকারে বোঝা যায় না যে জনার্দনের ভিতরে এবং বাহিরে কতখানি আক্রোশ জমা হয়েছে, জমা হয়েছে কতখানি ঘৃণা রক্ষিতের ওপর। সব বিশ্বাসঘাতক।

সেদিনের সেই কবি গানের অদ্ভুত সাফল্য, জনার্দনের কানে হাস্য পরিহাসে, পরস্পরের আলোচনায় বায়ু আন্দোলনে এসে পৌঁছেছে। তিনি ভিতরে খাক হয়ে গেছেন পুড়ে, বাইরে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি কূটনীতিবিৎ, তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে এই পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু রক্ষিতের অকর্মণ্যতা দেখে আর সামলাতে পারলেন না।

'তুমি আর দাঁড়িয়ে থেক না—যাও আমার সুমুখ থেকে। খবর নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।'

ভোরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে পূবদিকে। দিনটা কিন্তু অত্যন্ত মেঘলা। ঘরের ভিতর এখনও বেশ অন্ধকার।

জনতা, ক্ষুধা—এই বার্তাই একদিন শুনিয়েছিলেন ছোটদি। এই কি বিপ্লবের সূচনা? কাকে জিজ্ঞাসা করবেন জনার্দন? মণ্ডপের বারান্দাটা তো শূন্য। এই মুহূর্তে কি ছুটে কাশী যাওয়া যায় না। খুঁজে তন্নতন্ন করে ফিরিয়ে আনা যায় না জয়ন্তীকে? না তা অসম্ভব। পাবার মধ্যে পারা যায় কেবল মণ্ডপের বারান্দায় মাথাটাই ঠুকতে। তাতেও তো কিছু হবে না। যেখানে মানুষ আসে না, সেখানে তো দেবতাও থাকে না।

দেবতার ওপরও কি ষোল আনা নির্ভর আছে জনার্দনের—খাঁটি, নির্জলা বিশ্বাস? তাঁর বাপ দাদার আমলের কথা চিন্তা করেন। তবে এত দলিল দস্তাবেজের কি প্রয়োজন ছিল?

শক্তিই আমাদের মূলাধার—ছোটদির গীতাভাষ্য মনে পড়ে। ছোটলোকের জোট অতি ভংগুর—জনার্দন সোজা হয়ে দাঁড়ান। এ একতা তাঁকে ভাঙতেই হবে।

জনার্দন বাইরে বার হন।

একজন বৃদ্ধ এসে তাঁকে সেলাম করে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আমিই জনার্দন চক্রবর্তী, কি আর্জি আছে বল।'

সে আবার সেলাম করে। 'অনেক দিন দেখেনি হুজুর—প্রায় তিনমাস, হুজুরের চেহারাটা বড্ড কাহিল কাহিল ঠেকছে।'

জনার্দন বিরক্ত হয়ে তাকে কাছারীর সময় আর্জি পেশ করতে বলেন। যত সব গুপ্তচর, বিশ্বাসঘাতক!

বংশ পরাম্পরায় দান ধ্যান, পূজা আচ্চা, দরিদ্রের সেবা, অতিথি সৎকার—জগতের যা কিছু কল্যাণ কর্ম সমস্তই তাঁরা করে এসেছেন। সপ্তগ্রাম যে কতবার নিমন্ত্রন করে খাইয়েছেন, দিয়েছেন কত পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার! কিন্তু কি লাভ হয়েছে? কে না ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করেছে সে দিনের গান শুনে?

দুনিয়াটাই বেইমান। আজ আর কারুর ওপরই তিনি নির্ভর করতে পারছেন না। মনে হয় পৃথিবীটা এমন জায়গা দিয়ে ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে—যার এক প্রান্তে একা বিপন্ন জনার্দন, অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাসছে আর সবাই—পাকাচ্ছে জঘন্য জোট।

ঘাটলা বাঁধান পুকুরের দিকেই তিনি পা বাড়ান। চাকর সংগে সংগে ঘটি গামছা নিয়ে যায়। এ পুকুরের জল সাধারণের ব্যবহার নিষিদ্ধ না হলেও অন্দরের দিকে বলে লোক সমাগম নির্দিষ্ট। উপস্থিত একটি মানুষও নেই। স্বচ্ছ কালো জলে মুখের ছায়া পড়তেই তিনি চমকে ওঠেন।

চাকরটা এগিয়ে আসে। সাপ-খোপ নাকি? জল-ঢোঁড়া ঘাটে থাকা অসম্ভব নয়।

'কি দেখছিস্ হাঁ করে? যা ছুটে গিয়ে আরশীটা নিয়ে আয়।'

'বন্দুকটা?'

'না হারামজাদা, আয়না একখানা।' যতক্ষণ চাকরটা না ফেরে জনার্দন যদৃচ্ছা বকতে থাকেন।

'এই যে আরশীটা।'

জনার্দন এই দু মাস আড়াই মাসে যে মুখ মণ্ডল ভাল করে দেখেননি তাই দেখেন সপ্রতিভ অন্তরে।

'ডাক্ বুড়োকে—এই নে আরশীটা।'

অপরিচিতকে অন্দরের পথ দিয়ে এই ঘাটে! রেওয়াজ না থাকলেও ভৃত্যের মুখ দিয়ে জিজ্ঞাসা ব্যঞ্জক আবার একটি শব্দ বার হয়, 'কেন?'

'শূলে দেবে তোদের সব্বাই কে।'

চাকর চলে যায়। বৃদ্ধকে নিয়ে ফিরে আসে।

'কি আর্জি?'

'আমি রহিম প্যাদার বাপ—আপনার গোলামের গোলাম। রহিমের জ্বর, আমি এসেছি খবর দিতে। কাল রাত্তিরে ব্রজদাস খালাস পেয়ে বাড়ী এসেছে।

'আচ্ছা তুমি যাও।'

'সেলাম হুজুর। বুড়ো চলে গেল।

'আমার হাতখানা ধর তো। ঘাট্টা বড় পিছল।'

এমন সময় রক্ষিত এল।

'আমি সমস্তই শুনেছি রক্ষিত। তুমি একটু বাদে আমার সংগে সাক্ষাৎ করো।' মনিবের কণ্ঠ নিতান্ত শ্রান্ত।

ছেচল্লিশ

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—তিনটা মাস গত হলেই আবার আরম্ভ হবে গানের বৎসর। এর মধ্যে মহলা দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। কিছু জিনিষ পত্র সাজ সরঞ্জামও খরিদ করা একান্ত প্রয়োজন। পোষাক লাগবে, তীর তলোয়ার একটা কল্কীর পর্যন্ত দরকার। কবি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায়—একটা সংসার গোছাতে যা যা প্রয়োজন, তার চেয়ে যে অনেক বেশী প্রয়োজন একটা দল গড়তে।

'এত টাকা কোথায় গাংগুলী ?'

'শুধু কবিগান গাইবে নাকি? তাতে এত আনুসংগিকের বালাই নেই।'

'বুঝলাম। কিন্তু তার আবেদনও সীমাবদ্ধ। বেশী দিন লোকের ভাল লাগবে না। আর কবিগানের সংমিশ্রণে যে নাটক অভিনীত হবে, সে নাটক লোক সংগীতে স্থায়ী আসন লাভ করবে। ব্রজদাস ও পাখীর কথা গেয়ে যাওয়া, আর তাদের রক্ত মাংসে খাড়া করা এক নয়।'

'তা ঠিক। তবু আমি বলতে বাধ্য হব সেদিন তুমি যেমনটি জমিয়ে ছিলে, তেমন গান আমি কেন অনেকেই আজ পর্যন্ত শোনেনি। পণ্ডিত তো শত মুখে প্রশংসা করে গেছে।'

'তার চেয়েও যে কত ভাল গান জমবে যখন ব্রজদাস ডাকবে তার যশোদাকে, নিধু লাফিয়ে পড়বে গামছা নিয়ে। মহলার সময়ই বুঝতে পারবে।'

'তা হবে হয়ত। কিন্তু এখনই ছেলে মেয়েরা গাইতে সুরু করেছে—

মনিবটা রক্ত চোষে
রক্ষিতাটা সর্বনাশা
এদের মেরে ঘোচাব জঞ্জাল।'

'বল কি গাংগুলী, নিজের কানে শুনেছ তো ?' কবি প্রাণের নিভৃত কন্দরে একটা অনুরণন অনুভব করে। 'দেখবে, ব্রজদাস যখন গাইবে, তখন আগুন জ্বলবে দাউ দাউ করে।'

'এই বর্ষার ভিতর কোথায় মহলা হবে স্থির করেছ ?'

'কেন, এখন আর ভাবনা কি, দাসের বাড়ী।'

গোপনে গোপনে তাঁতি বস্ত্র জোগায়, ধোপা ধোপ দিয়ে দেয়। বর্শা বল্লম প্রস্তুত হয় বাঁশের বাঁখারী চেঁচে। তারপর যা কিনতে হয় তা সামান্যই। প্রত্যেকটি উদ্যম সাফল্য লাভ করে, প্রতিটি কথায় ওরা সাড়া পায়—তাই ওদের উৎসাহ বেড়ে চলে ক্রমে ক্রমে।

'এখন যে একখানা বড় নৌকার প্রয়োজন ?'

নৌকা নইলে একগ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যাবে কি করে এতগুলো মানুষ ?'

'সবাই মিলে চেষ্টা করলে ও-ও হয়ে যাবে। তুমি ভেব না কবি। চন্দ্রকান্ত তাঁতির মত কিপটে যখন কাপড় দিয়েছে, তখন কি একখানা নায়ের জন্য ভাবি !'

'তুমি পাগল। কে দেবে একখানা নৌকা ? এ তো কাপড় নয় যে মাত্র পঞ্চাশটাকা দাম ! নাও একখানা কম সে কম আড়াই শ টাকা।'

'ওর জন্য চিন্তা করিনে, চিন্তা করি একটা কথা, নাটক তো মহলা দিতে যাচ্ছ নায়িকা সাজবে কে ? পাত্রী নেই, অথচ বিয়ের সব ঠিক ঠাক।'

'সত্যি কথা। নৌকা দুদিন পরে হলেও চলবে, কিন্তু—

সেদিন দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে কবি অনেক বিষয় ভাবে। এত প্রতিবন্ধক গোড়াতেই, না জানি গান জমলে কত বিঘ্ন উপস্থিত হবে। উত্তুংগ পর্বত ডিঙিয়ে তবে কিনা সিদ্ধির স্বর্ণ-তোরণে ! এর পর রক্ত

স্মরণও অসম্ভব নয়। জীবনের জয় পরাজয় কোনদিন অনায়াসে নির্ণীত হয়নি।

'আচ্ছা বলতে পার মলিনা, পাখী কি গান জানে?'

'ছোট বেলা তো রাধিকা সাজত। গান গেয়ে পূজাপার্বণে পরবা আদায় করত। বড়ই সুন্দরী দেখাত। মেয়েটা খুবই চালাক চতুর।'

আর বিশ্রাম নয়। কবি উঠল।

পথে রক্ষিতের সংগে দেখা। 'কবি যা করছ, তা কি ভাল করছ? এই দল-টল—'

'কেন খারাপ করলাম কি? গানের দল কে না করে, কবে না ছিল কনকপুরে?'

'কেষ্টলীলা, ঢপ, যাত্রায় তো আপত্তি নেই কারুর। ঈশ্বর লীলায় বাধা দেবেন কেন ব্রাহ্মণ মনিব? কিন্তু এ তো তা নয়। তুমি তো সবই জান।'

কয়েকজন লোক একত্র হয়ে এগিয়ে এল। একজন কালা কেবল মাথা নাড়াল রক্ষিতের সপক্ষে। বাকি সবাই চেয়ে রইল কবির মুখের দিকে।

'জানি বলেই তো আজ লজ্জা, সরম ত্যাগ করে নেমেছি। এ কেষ্টলীলা না হতে পারে, কিন্তু রাজলীলা তো! রাজা ঈশ্বর তুল্য। তাঁর লীলা কীর্তনও মানুষের ধর্ম। আশা করি এর পর আর তুমি আমাদের বাধা দেবে না।'

'মুখ-চোরা মানুষ খুব তো কথা শিখেছ।'

'শেখায় কে রক্ষিত—ধাক্কা মারলেই ধাক্কা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়, জান না?'

'এর ফল কিন্তু অতি বিষময়। কেউটে সাপের লেজ দিয়ে কান খোঁচাচ্ছ।'

'কার পক্ষে বিষময় ? কে কেউটে সাপকে বিরক্ত করছে ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে রক্ষিত বলে, 'এই দেখ টিপ সই দিয়েছে নিধু সুবল প্রভৃতি, যে, তোমার সংগে মিশলেই ডিগ্রীজারী দেব বিনা ওজর আপত্তিতে। তারপর নিলাম, ভিটায় ঘুঘু চড়বে।'

'নিধু দিয়েছে টিপ ? দিক। তবু জেনো, এ বন্যা থামবে না।

উত্তেজিত কবি বাড়ীর দিকে ফিরল। রক্ষিত গেল গজগজ করতে করতে। 'কেউটের লেজ দেখেছ, ফণা দেখনি।'

কবি সোজা বাড়ী না ফিরে, বনপথ ঘুরে চলল।

বাধা, বাধা ! তরংগ এসে শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে। ছোট থেকে ক্রমে বড়। ভাল লাগছে পাহাড়ের মত বুক পেতে রুখতে।

জয় হয়নি তবু স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। তূর্য ধ্বনি শোনা যাচ্ছে নিঠুর। তবু কে যেন প্রাণের গহনে বসে বলছে—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল সমুখে। হে সৈনিক ও মরণ নয়, অভিনন্দন। অন্ধকার ভেদ করে আলোর ক্রন্দন আসে যুগে যুগে।

কবি ভাবল, একবার নিধুর বাড়ী যাবে, কিন্তু যেয়ে লাভ হবে কি ? যদি কারুর আস্ফালন কৃত্রিম হয়, তা কি খাঁটি করা যাবে ? সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু এর মধ্যেই মানুষ চেনা যাচ্ছে না ঘরের বারান্দার। গাছ পালার ছায়ায় বেশ খানিকটা অন্ধকার হয়েছে।

'উঠি গো মা কবি তো এলেন না।'

'এই যে আমি এসেছি। কে মলিনা ?'

'সেই তুমি বেরিয়ে যাবার পর থেকেই পাখী এসে বসে আছে, সেরে উঠে দেখা করতে এসেছে।'

'ও কেন কষ্ট করে এল, আমিই তো যেতাম। গিয়েছিলামও প্রায়, পথে বাধা জঞ্জাল রক্ষিত। কেমন, শরীরে বল পাচ্ছিস তো ?'

মলিনা প্রদীপ নিয়ে এল—যাবে তুলসীতলা—একটু দাঁড়াল।

সলজ্জ হাসি হাসল পাখী। চেহারা শুধু ভাল হয়নি, অনন্য হয়েছে। ভাংলাপাখা জংগলে এসেই নিরাময় হয়ে গেছে। ওষুধে এখানে ক্রিয়ার চাইতে গতি বৃদ্ধি করেছে।

মলিনা প্রদীপটা নিয়ে উঠানে নামার আগে পাখা একটা প্রণাম করে কবিকে।

'ওকিরে, ওকি?'

পাখী কিছু মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। সে মৌখিক বিদায় পর্যন্ত না নিয়ে তরতর করে চলে যায়।

'মেয়েটার কি হল বলত?'

'জানব কি করে?'

রাত্রে নিধুর সংগে ব্রজদাসের বাড়ী দেখা। সুবলের সংগেও— আরও অনেকের সংগে।

কবি জিজ্ঞাসা করে, 'কি নিধু, বাদুড়ের মত একবার পশুর দিকে আবার পাখীর দিকে উড়ে বেড়াবে নাকি?'

'আপনার কি মনে হয়?'

'তোমরা এখানেও আসছ টিপও দিচ্ছ, আমার আবার কি মনে হবে, জগতটাই কি এমনি?'

টিপ্, টিপ্ দিয়েছি কোন কাগজে, কি কালিতে? আমরা কি জমি ক্ষেত কবালা দিয়ে দেশ ছেড়ে যাচ্ছি যে টিপ দেব?

সুবল জিজ্ঞাসা করে, 'কোন শালা বলে? রক্ষিতটা নিশ্চয়। দল ভাঙতে চাইছে। এখন আর আমরা ভয় করিনে। ক জনের ঘরে আগুন দেবে, ক জনকে মিথ্যে মামলায় জড়াবে? আমাদের জোট ভাঙা ওর মত দশটা রক্ষিতেরও কম্ম নয়। আজ মহলা হবে না? সে একটু থেমে সুর করে গান ধরে—

ঠাকুর বাড়ীর কুকুর রে
ছাল নাই তোর বাঘা নাম
সিংহের গালে চাটা দেবার আশা রে ॥
কয়েকজন সহাস্যে ধুয়া ধরে,
বলি হায়রে, কঁজোর হয়েছে চিৎ হয়ে
শোয়ার নেশা রে ॥

মাঝে মাঝেই পাখী আসে। দিনের বেলা মহলা হলে তো কথাই নেই, রাত্রি কালে আসে মাকে সংগে করে। সংসারে তার মন বসে না। পূর্বের জংলা বুদ্ধিও এখন আর তার নেই। চঞ্চলা প্রকৃতি একেবারে তার বদলে গেছে। কবি লক্ষ্য করে পাখীর পরিবর্তন। কবি কোন প্রস্তাব করে না।

একটা পক্ষ অতীত হয়। তারপর পূর্ণ একটা মাস।

পাখী মাঝে মাঝে গুণগুণ করে, সময় সময় ভুল ধরে। বিমর্ষ হয় যখন ব্রজদাসের পাঠ নায়িকার অভাবে জমে না। ও অধরোষ্ঠ দংশন করে।

কিছুই কবির নজর এড়ায় না। তবু কবি প্রস্তাব করে না। শুধু অপেক্ষা করে।

একদিন পাখীই যশোদা হয়ে আসরে নামে। পালা জমে অভাবনীয়।

সাতচল্লিশ

অবশেষে রৌদ্র স্নাত, নির্মেঘ আশ্বিন মাস এসে পড়ে! গাইয়েদের মনে আর আনন্দ ধরে না। মহলার পর মহলা চলে। গানও বাজের ঝংকারে দূর গ্রামগুলো পর্যন্ত অনুরণিত। যারা মহলা শোনেনি তারা অভিনয় রজনীর জন্য উৎগ্রীব। নতুন কিছু শুনবে, নতুন কিছু জানবে। সকলে মনে প্রাণে দাঁড়ায় এসে কবির স্বপক্ষে। কবি সুর দিয়েছে, ভাষা দিয়েছে ওদের মনের জ্বালাকে। পথও নাকি নির্দেশ করে দিচ্ছে নির্বাণের। ওরা কবির কাছে যাক্ কি না যাক্, সংঘ গড়ে ঘরে বসে, মনে মনে নাম লেখায় একটা খাতায়।

জনার্দন যৌবনের মধ্যাহ্নে থেকে যেন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন। এত বড় দাম্ভিক সামন্ত, যতই কেন অবিশ্বাস করুন না রক্ষিতের হাতেই তুলে দিয়েছেন বিশ্বাসের চাবি কাঠি। ব্রজদাসের আবির্ভাবে তাঁর যেন বুক ভেঙে গেছে। তিনি আর চিন্তা করতে রাজী নন—তিনি হুঁকো ছেড়ে ফরশি ধরেছেন।

গুড়ুক, গুড়ুক…

'রক্ষিত কি মনে কর?'

'কিছুই না। চোখ রাঙিয়েই ওদের ভড়কে দিয়েছি।'

'মহলা তো থামছে না।'

'কিন্তু অভিনয় আর হচ্ছে না। ঘরে বসে কতলোক তো মহা-রাজাধিরাজকেও গালাগালি করে? কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেই কি তার পিছন পিছন ছুটতে হবে? টিপ সইর কৌশলটা মন্দ হয়নি, কি বলেন?'

'তা বটে! কিন্তু ওরা তো কুকুর নয় রক্ষিত।'

'মানুষও নয়। সে চক্ষে ছোটদি কখনও দেখেননি, আপনার বাবা কখনও দেখেননি, আপনি উদ্বেগ বোধ করেছেন কেন?' আমি ওদের বিষ দাঁত এক্ষুণি তুলে ফেলতে পারি, অন্তত সে বুদ্ধি জন্মেছে আপনাদের ষ্টেটের নুন খেয়ে খেয়ে। আপনার পিতা ছিলেন মহাশয় ব্যক্তি, ছোটদি ছিলেন মেয়ে চাণক্য। তাঁদের কাছে থেকে আমি কি কিছু শিখিনি, এমনি এমনি চুল পেকেছে?'

'না, না তা হবে কেন—তুমি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। ওরে কে আছিস?'

'হুজুর?'

'যা কাগজ কলম আনতে বল অশ্বিনীকে—সনদের সরঞ্জাম।'

কাগজ এল কলম এল, সংগে সংগে একখানা বড় কাঁসার থালাও এল ঝকঝকে।

'বাটি কোথায় দুটো—পান এবং চন্দনের বাটি? সদর ডিহির নায়েবী, সেই অনুপাতে বাটি এনো।'

বাটিও এল দুটি বড় বড়।

'এখন সনদ লেখ অশ্বিনী। একখানা গিনি দিতে বল খাজাঞ্চিকে। পুরুত ঠাকুরকে ডাকতে পাঠাও।'

অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করল, 'ঢাকিঢুলি?'

'না, তার প্রয়োজন নেই; বাদ্য এবং উৎসবের সময় নেই। জরুরী ব্যাপার, অকাল বোধন। দিন এলে আনন্দ করা যাবে।'

অল্প সময়ের মধ্যেই পুরুত ঠাকুর এলেন শালগ্রামশিলা নিয়ে। অন্যান্য সব কিছু প্রস্তুত হল। সমস্তই সংক্ষিপ্ত।

সনদে সই করলেন জনার্দন। পুরুত ঠাকুর সাক্ষী হলেন। রক্ত চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হল রক্ষিতের ললাটে। এবার সনদ ও গিনি সমেত উজ্জ্বল থালাখানা জনার্দন রক্ষিতের হাতে ধরে দিলেন। আজ

থেকে তুমি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজিউর দেবত্র মহলের সদর ডিহির নায়েব হলে।'

রক্ষিত জনার্দন ও পুরোহিতের পায়ের ধুলো নিল লুটিয়ে পড়ে। 'এ আপনারা কি করলেন।'

জনার্দন বললেন, 'মুহুরী থেকে নায়েবী—'

পুরোহিত বললেন, 'বাবা একটু সমঝে চলো। অনেক ভরসা করে তোমাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

অন্দরের দিকে চলে গেলেন জনার্দন।

রক্ষিত রইল ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে।

আবার কয়েকটা দিন গত হয়ে যায় নানা কাজ কর্মে।

'ওরা নাকি পাড়ায় পাড়ায় সারা রাত ঘুরে বেড়ায়—কেবল পরামর্শ করে?'

'এ কথা আপনার কানে কে আনল? আজ কাল খরা শুকনার দিন, এখন একটু মানুষ যদি কুটুম্ব বাড়ী না বেড়াতে যায়, এরপর তো যম খাটুনী, ধানের মরসুম।'

জনার্দন তামাকে টানতে টানতে জবাব দেন, 'আমি কারুর কথা বিশ্বাস করিনে। তবু সংবাদটা পেলাম জানিয়ে রাখছি।'

'আপনার যদি পুরোপুরি আমার ওপর আস্থা না থেকে থাকে, আমি আমার সনদ এখনই, এই মুহূর্তে ফিরিয়া দিতে রাজী আছি। আপনি কখন আমাকে জবাবদিহি করবেন, যখন দেখবেন যে নাটক অভিনয় শুরু হয়েছে।'

'না, না তুমি সনদ ফিরিয়েই বা দেবে কেন, আর তোমাকে আমি জবাবদিহিই বা করতে যাব কেন।' জনার্দন মুক্ত জানালা দিয়ে আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। আকাশে রক্ত মেঘ জমা হয়েছে।

রক্ষিত বলে, 'যতক্ষণ বিশেষ কিছু না দেখব, ততক্ষণ চুপ করেই থাকব। শক্তিশেল তো আমাদের হাতেই রয়েছে। তা কি বানর বধে প্রয়োগ করা উচিত?'

রক্ষিত কার্যান্তরে চলে যায়। জনার্দন ভাবেন, এতখানি নির্ভর করা বুঝি ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু এ গানের দলের বিরুদ্ধে তো এখন কোনও ফৌজদারীও করা চলে না। আদালত করাও কোনও যুক্তি নেই। এক মিথ্যা আর্জি, ডিগ্রী করা যেতে পারে ব্যক্তিগত। তাতেই বা লাভ কি? এ সব ক্ষেত্রে ছোটদি কি, কি কৌশল উদ্ভাবন করতেন, তাই স্মরণ করতে চেষ্টা করেন জনার্দন। চকিতে মনে পড়ে নায়েব রামসুন্দরের কথা। তিনি চেয়ে দেখেন, রক্ষিত ফিরে এসেছে কিনা।

'একটা দাংগা বাধিয়ে দাও না রক্ষিত।'

'সময় আসুক—ওরা আগে আসরে নামুক। যদি নাই নামে তবে আর মশা মারতে কামান দাগব কেন?'

'সে কথা যথার্থ। আমার মনে হয় ওরা আর এগুবে না।'

রক্ষিত একটু হাসে। ওর কৃশ দেহের এর মধ্যেই শ্রী ফিরেছে।

জনার্দন ভাবেন, রক্ষিতটা কি ধূর্ত, কি জঘন্য ওর প্রকৃতি! একের যখন মান, সম্মান, সমস্ত বৈভব নিয়ে টানাটানি অপরের তখন দিব্যি মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে! অথচ এমন মিথ্যা একটা কেলেংকারী নিয়ে হুলুস্থুল হচ্ছে যে তিনি নিজেও রংগমঞ্চে এসে দাঁড়াতে পারছেন না।

মাঝে মাঝে কবির আচমকা মনে পড়ে কুসুমের কথা। মনে পড়ে নৈশ গগনের কোণে—হয়ত বহুদূরে একখানা জলভরা মেঘে বিদ্যুৎ চমকাল। ক্ষণিকের দ্যুতি—তবু তার অনুভূতি বেদনায় ভরা। এ মেয়েটা নিজের বৃত্ত থেকে কোন দিন বৃহৎ কোনও বৃত্তে পরিভ্রমণ

করার চেষ্টা করল না। আবদ্ধ রইল নিজের গণ্ডীটুকুর মধ্যেই। কুসুমের ওপর একটা সখেদ করুণা জমে ওঠে কবির মনে।

'বাবা তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে। এই নাও, দিয়ে গেছে প্রভাত ভূঁইমালী।'

যার কথা ভাবছে কবি, পত্রখানা তারই।

আত্মকেন্দ্রিক কুসুম অনেক কথা লিখেছে! লিখেছে যে স্বামীস্ত্রী শুনতে আসবে তাদের গান যখন আসরে নেমে গাওয়া হবে, দিন তারিখ কিছু ধার্য করে জানায় নি। তবে তাদের সংগে নাকি দু একজন খবরের কাগজের সংবাদদাতা আসবেন। পণ্ডিতের বন্ধুস্থানীয় এঁরা। ফটো তুলে নিয়ে ছাপাবেন সংবাদপত্রে। শুধু প্রচারের জন্য নয়, আগ্রহ, উৎসাহ ও আকর্ষণ বাড়াবার জন্য! ক্যামেরার সুমুখে তখন যেন কবি মুখ না লুকায়! যে লাজুক সে।

কলকাতার চিঠি, কিন্তু কি অদ্ভুত উক্তি—পাড়াগাঁয়ের এক অখ্যাত কন্দরে কবি রাঙা হয়ে ওঠে।

কুসুম আরও লিখেছে—

'আজকাল আমি পড়াশুনা করছি, লোক সংগীত সম্বন্ধে চিন্তা করছি। এ না করলে দিনের বারটা ঘণ্টা কাটাব কি করে? মাঝে মাঝে সভা সমিতিতেও যোগ দিচ্ছি। আমি ভেবে দেখেছি, গতানুগতিক আদি ও করুণ রস থেকে মাঝে মাঝে রুদ্র রসে, বীর রসে সরে যেতে হবে। মহাকবি মাইকেলকে ভুললে চলবে না। তাঁর অমর লেখনী আজ আমার ভিতরে নতুন উপলব্ধি এনে দিয়েছে। সময় মত নিশ্চয় আমরা কাঁদব, তা বলে কি প্রয়োজনের অংকুশ তাড়নায় আমরা রুখে দাঁড়াব না? আমি কবি নই, সাহিত্যিক নই, ঠিক হয়ত বোঝাতে পারলাম না। তবু আশা করি তুমি আমার কথাটা সহানুভূতির সংগে

চিন্তা করে দেখবে। পারলে ভাষা দেবে, সুর দেবে তোমার গ্রাম্য-গীতিকায়। আমি ভাবছি আরও অনেক কথা। তোমার সুবিধার জন্য কতগুলি বই পাঠাব শীগ্‌গির। সে বই তোমার কর্ম-জীবনে প্রেরণা যোগাবে। পড়ে শুনিও ব্রজদাস, রসুল প্রভৃতিকে। ভালবাসা নিও।...'

অন্য কোনও দিন হলে কবি হয়ত একটু ঠাট্টা করে বলত, কিম্বা লিখে জানাত, পড়াশুনা তো করছ কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগ কি হাতে নিয়েছ?

আজ সে রসিকতা করার সময়ও নয়, ইচ্ছাও নেই।

ক্ষণিকের জন্য কবি যেন আত্মসমাহিত হয়ে যায়।

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দের সে সন্ধান পেয়েছে। ঘন বর্ষার রজনী-গন্ধার মত জন্মাচ্ছে পুলকে। কুসুম পত্র লিখেছে না তো সে আনন্দকে পাঠিয়ে দিয়েছে ডাকে। কবির দৃষ্টি আরও প্রসারিত করতে চাইছে তার মরমী মনের তুলি দিয়ে।

কবি শুধু বুক ভরে কেন, তার সমস্ত গ্রহণ-ইন্দ্রিয় ভরে গ্রহণ করে কুসুমের পত্রের ভালবাসা। ছত্রে ছত্রে সে অনুভব করে কুসুমের কেন্দ্রাতীত ক্রান্তি যাত্রা। সে কুসুমের উপলব্ধিকে ইতিমধ্যেই রূপ দিয়েছে গানে। তবু তার প্রাণে গমক ওঠে। খুলে যায় অনুভূতির কোষগুলি। প্রথমটার বিরামে গান জন্মাতে চায়। অবশেষে বৈশাখের রুদ্র রসে ভূমিষ্ঠ হয় সংগীত। সে ছুটে চলে ব্রজদাসের বাড়ীর দিকে। যতক্ষণ সে পৌছাতে না পারে, ততক্ষণ মাথা কুটে মরে সংগীতের গমগমানি ওর বুকে।

'দাস একটা নতুন গান শুনবে?'

'গাও।'

'তা হলে গলা মিলাও আমার সংগে।—
হাল তুমি রুখে দাঁড়াও
কাল তুমি আগুন ছড়াও
আর সইবে কত জুলুমী।
জমি তোমার উঠেছে লাটে
মা বহিন মজুরী খাটে
নিত্য যায় সহরের বাটে—
চৈখে কি দেখনা তুমি॥'

গান থামলে ব্রজদাস কবিকে অত্যন্ত প্রশংসা করে। কবি গম্ভীর হয়ে কুসুমের কথা বলে।

ব্রজদাস সবিস্ময়ে জবাব দেয়, 'তাই নাকি!'

কবি তার অন্তরের চোখ দুটো দিয়ে দেখে, যেন সমস্ত পটভূমির পশ্চাতে একটি জ্ঞানী সহনশীল মানুষের ছায়া পড়েছে।

আটচল্লিশ

আশ্বিন, কার্তিক অগ্রহায়ণও কেটে যেতে বসেছে, কিন্তু গাইয়েরা আসরে নামছে না। শীতের শ্রী পড়েছে সর্বত্র। কেবল এক ঘেঁয়ে বাজনা শোনা যায়, আর মহলার শব্দ। এখন জনার্দনের ভয়ের চেয়ে যেন বিরক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি একখানা শাল গায় চাপা দিয়ে, করশির নলটা হাতে ধরে নির্দিষ্ট স্থানে বসে থাকেন। ওদের উল্লাস এবং হট্টগোলে এক এক সময় চক্রবর্তীর সমস্ত শরীর বিষিয়ে ওঠে। তবু তিনি মাঝে মাঝে রক্ষিতের সংগে আলাপ করেন, 'শেষ পর্যন্ত দেখছি তোমার কথাই ঠিক হল।'

চশমার ফাঁক দিয়ে রক্ষিত একটা তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাসে।

জনার্দন রক্ষিতের দিকে চেয়ে থাকেন। একটা দুর্বোধ্য কুয়াশার জালের মধ্যে যেন সে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রক্ষিত এক মনে কাজ করে যাচ্ছে। জনার্দন তার দিকে সহসা কটমট করে তাকান। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে, দূরে নিবদ্ধ করেন।

'দেখ হাজার হলেও ওরা জানে যে আমি ওদের মনিব। ইচ্ছা করলেই ওদের মুহূর্তে উৎখাত করে দিতে পারি। ওদেরও তো নিজের ছেলে মেয়ে জায়গা জমির জন্য' মমতা আছে। ব্রজদাস ও কবির মত তো সবাই লেজ কাটা নয়। এ ছাড়া দায়ে অদায়ে কখন না কে এ বাড়ীর সাহায্য নিয়েছে। আচ্ছা বলতে পার কবির ভাই দুটো কোথায়—এখন থাকলে ভারী সুবিধা হত!'

'সে রত্ন দুটি যে কোথায় গেছে, কেউ তা জানে না।'

অশ্বিনী এসে রক্ষিতকে বলে যে, রসুল নাকি কেরায়া যাবে না।

'বোধ হয় অসুখ-বিসুখ করেছে। কোন দিন তো সে অস্বীকার করেনি, অন্তত আমার তো মনে পড়ে না। অন্য কারুকে ডাকো।' রক্ষিতের হয়ে জনার্দনই জবাব দেন।

'না, সে বলেছে যে নিলাম হয়েছে জেলায়, তার ভদ্রাসন কনকপুর, সে-নিলাম সে মানে না! এতদিন যা দিয়েছে, দিয়েছে, এখন সে আর বেগার দিতে রাজী নয়। এবার সে হাল ব'শেখে ভেটও দেবে নাকি অষ্টরম্ভা।'

'এ কথা শুনে তুমি চলে এলে? কিছু বললে না, ঘরে আগুন দিলে না? ভদ্রাসনটা কার?' জনার্দন কতক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। 'সত্যিই কি রসুল মাঝির কথা বলছ, না আর কারুর?'

'মহারাজ সেই ল্যাংপ্যাংয়ে রসুলের কথাই বলছি। তখন তার চোখ দুটো যদি দেখতেন।'

'আচ্ছা চুপ কর। রক্ষিত কি বল?'

'আমি যখন রয়েছি, এসব ছোটখাট ব্যাপারে আপনার উত্তেজনা শোভা পায় না। সময়তে ঘরের বৌও দু কথা বলে।'

'তা হয়ত সত্য! কিন্তু এ কি তেমনি উপেক্ষা করার মত ঘটনা?'

শীতের সন্ধ্যা ধীরে ধীরে কৃষ্ণ যবনিকা টেনে দেয়। জনার্দন তামাক টানতে টানতে ধোয়ায় ঘরটা আরও অন্ধকার করে ফেলেন। সন্ধ্যাও ক্রমে গাঢ় হয়ে ওঠে। অন্নর জনার্দন রক্ষিত অশ্বিনীকে দেখা যায় না। দেখা যায় কেবল জ্বলন্ত কল্‌কিটা।

'কে আছিস্—একটা আলো দিয়ে যা।'

ভৃত্যও আজ যেন সময় মত হুকুম তামিল করে না।

উনপঞ্চাশ

পরদিন সকালবেলা রোদ উঠতে না উঠতেই যেন সহস্রটা ঢাক এক সংগে বেজে উঠল। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যেন নিমন্ত্রণ এবং আহ্বান ভেসে গেল। কবি গানের সংগে নাটক অভিনয় হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ সাজে, সজ্জায়, গানে বাজনায় মুক্ত আসরে পালা নামবে আদ্যোপান্ত। গানের স্বাদ পেয়েছিল অনেকে, এবার পুরোপুরি আস্বাদ নেওয়ার জন্য লোক ছুটল দলে দলে। এখনও ধান কাটার পূর্ণ মরসুম আসেনি। তাই রোদ ওঠার সংগে সংগে মানুষ আসতে লাগল জোয়ারের জলের মত। বারওয়ারী তলায় আসরে আর লোক ধরে না। ধীরে ধীরে গাছের শাখা প্রশাখা ভরে গেল। দু এক জায়গায় ভেঙে পড়ল ডাল। হট্টগোলও হাসি চলল খানিক।

গাংগুলী আসরখানা নানাবিধ ছবি এঁকে সাজিয়েছে। হুঁকো হাতে চক্রবর্তী কাসছেন, ব্যংগ চিত্রখানা চমৎকার। ফুটেছে সমধিক। নীচে লিখে দেওয়া হয়েছে—ক্ষয় রোগী, সাবধান! এমনি, আরো অনেক। শিল্পী পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

ছোট ছোট দোকান পাট পর্যন্ত বসে গেছে এখানে-সেখানে। ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হল ঢাকের বাদ্য বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে। এবার দর্শকদের কৌতূহল উগ্রতম হয়ে উঠেছে।

সমস্ত কুশীলবেরা প্রস্তাবনা সংগীত নিয়ে আসরে প্রবেশ করল—

(ও ভাই) আজ প্রভাতে
পূব দিকেতে
দেখিনু রাঙা সকাল…

অমনি ঘন ঘন করতালি পড়তে লাগল আবাল বৃদ্ধ বনিতার। থামতেই চায় না তাদের উচ্ছ্বাসের ঢেউ।

জনার্দন অতিষ্ঠ হয়ে উঠানময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। পেয়াদা পাইক গোমস্তারা সন্ত্রস্ত। কখন কার গর্দান যায় এই ভাব। রক্ষিত এখনও আসছে না। জনার্দন যেন দূরের বাদ্যের তালের সংগে সমতা রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

রক্ষিত এসে প্রবেশ করল। মুখে চোখে তার গ্লানির ছাপ যেন।

'কি রক্ষিত এবার কি জবাবদিহি করবে? এখন ভেবে দেখ গত কাল রসুল যে উক্তি করেছে, তা পর্দানসিন স্ত্রীলোকের উক্ত নয়। ওদের সকলেরই সদর ঘাঁটি এক স্থানে।'

গানের ঐকতান, মৃদংগের মৃদু গুরু বোল, মন্দিরার ঘন ঘন নিক্কণ ভেসে আসে। আসরে শোনা যায় উল্লসিত জনতায় হর্ষধ্বনি।

জনার্দন আবার চৌকোর ঘুরে নেন।

অশ্বিনী বলে, 'একি মহারাজ রক্ত এল কোত্থেকে?'

'কোথায় রক্ত মূর্খ ?' জনার্দন সচকিত হয়ে দাঁড়ালেন।

'আপনার হাতে।'

জনার্দন নিজের কনিষ্ঠ আংগুলটা দাঁত দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছেন।

'বোকার মত দাঁড়িয়ে না থেকে, তোমরা যাও কি পালা হচ্ছে শুনে এস। সবাই এক সংগে এস না, বা সবাই আগা গোড়া দাঁড়িয়ে থেক না। মাঝে মাঝে এক একজন সংবাদ নিয়ে আসবে। রক্ষিত শুধু যেও না। আমি আগাগোড়া এখানে বসেই গান শুনব। পালা জমার মুখে পর্দা টানব। আমি আর কেউ নই, জনার্দন চক্রবর্তী।'

চাকর এসে আংগুলটা জলপটি দিয়ে বেঁধে দিতে চাইল। সে ধমক খেয়ে একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। জনার্দন আবার অস্থির হয়ে ঘুরতে লাগলেন।

'এখন কি বলতে চাও রক্ষিত ?'

'মহারাজ—'

বারওয়ারী তলা নিকটেই। একজন পাইক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল।

'কিরে কি ?'

'যশোদার প্রেতাত্মা।'

'প্রেতাত্মা! কি বলছে রে, কি চাইছে ?'

'চাইছে তার স্বোয়ামী, ঘর, সংসার। সে এক ভাঙা কান্না জুড়ে দিয়েছে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না।'

'হুঁ! যত সব পেত্মীর আবদার! বুঝলাম, তুই এখন ফিরে যা।'

একজন চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই আর একজন এল। বোঝা গেল ছেদ পড়েছে গানে।

'কিরে, সংবাদ কি ?'

'পাখী।'

'কিছু বলছে নাকি, না জংলির মত হাঁ করে রয়েছে ?'

পাইক নীরব। মুখখানা তার নীচু।

'চুপ করে রইলি কেন? বুঝেছি, তুইও বুঝি ঐ দলে ভিড়েছিস।'

'না মহারাজ, এখন ও তা পারিনি। কিন্তু পাখীর কাকুতি শুনে, তার বস্ত্রহরণ দেখে, রক্ত টগবগ করে উঠছিল।'

'চুপ রও হারামজাদা কুত্তা। কে বস্ত্রহরণ করেছে পাখীর?'

'আপনি। না মহারাজ, তার এক মনিব। আমার ভুল হয়েছে, তার এক মনিব।' সে ভয়ে জনার্দনের পা জড়িয়ে ধরে।

জনার্দন মহাক্রোধে একটা লাথি মারেন। 'রক্ষিত একে আটক কর, কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

রক্ষিত জানে এসব কি। সে জীবনে অনেক দেখেছে এমন বহ্বাড়ম্বর! তাই সে এগোয় না। একটু পরেই লোকটা জনার্দনের সুমুখ থেকে সরে যাওয়ার হুকুম লাভ করে।

এরপর অনেক ছোটখাট ঘটনা ঘটে। গানের মাধ্যমে তা কখনও বর্নিত হয় হাস্য রসে, কখনও ব্যংগে, কখনও বা তুর্জয় শ্লেষে। নব রসের অদ্ভুত সমন্বয় করেছে কবি।

একজন এসে বর্ণনা করে রসুলের কাহিনী। জনার্দন অনবরত পায়চারি করে যাচ্ছেন, তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ান।

'মাঝি খাজনা দিতে গররাজি—বেগার দিতেও অস্বীকার, তখন মনিবের প্যাদা গেল ধরে আনতে। খাস তালুকে বাস ক'রে বেটা করবে হুকুম খেলাফি (অমান্য)? সন্‌সন্‌ করে প্যাদার সংগে ছুটল হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ।'

'বেশ করেছে! এই তো চাই।'

বারওয়ারীতলা থেকে অনেকগুলি যন্ত্রের বাজনা এসে জনার্দনের উঠানের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণনাকারী কিছু সময়ে জন্য চুপ করে।

'কি হল তারপর, দিল তো ঘর কেটে নামিয়ে?'

'না মহারাজ ওরা স্বামী স্ত্রীতে বৈঠা আর বাটি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল

'লাফিয়ে পড়ল! ব্যংগ স্বরে জনার্দন বললেন, 'আর তোরা বুঝি রইবি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে?'

'কি করব আমরা—হুকুমের গোলাম। আপনার নামগন্ধ তো কোন খানে নেই।'

এতটা তলিয়ে বুঝলে তুই তো মানুষই হতিস্।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্যাদা নিষ্ক্রান্ত হয় উঠানের চৌহদ্দি থেকে। সে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল।

সূর্য আরও খানিকটা ওপরে উঠল। গাছের মাথায়, প্রায় মগডালের কাছাকাছি এক ঝাঁক যাযাবর মৌমাছি এসেছে তাদের নতুন পত্তন গড়তে। জনার্দন ভাবেন, উৎপাত! এখানে বাসা বাঁধতে সুযোগ দিলে, আবার কখন হুল ফুটিয়ে বসে কে জানে। আর বিশ্বাস নেই কারুকে। ইচ্ছা করে তিনি লগি নিয়ে তাড়া করে যান। কিন্তু তাঁর মনের কথা মনেই থাকে—যেমন বেমানান এবং লজ্জাস্কর, তেমনি সংবাদ আসে অভিনব।

'ব্রজদাস! ব্রজদাস! কুঠার নিয়ে বেরিয়েছে। চোখ দুটো তার ভাঁটার মত জ্বলছে।' হাঁফাতে লাগল অশ্বিনী।

'কোথায়, কোথায় সে? জনার্দন গিয়ে সেরেস্তায় ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিলেন। 'কোথায় অশ্বিনী?'

'জানিনে। বোধ হয় আমার পিছে পিছে আসছে। শুধু ব্রজদাস নয়, রসুল, পাখী আরো অনেকে।'

জনার্দন চীৎকার করে সবাইকে ডাকলেন, সময় মত ভুলে গেলেন বন্দুকের কথা।

যে যে শুনতে পেল বাইরে উঠানে এসে জমা হল হাতিয়ার নিয়ে।

ধীরে ধীরে প্রায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র পাইক সমবেত হল। এখন শুধু হুকুম পেলেই হয়

অহেতুক ভয় কেটে যাওয়া মাত্র, সেরেস্তার দরজা খোলা হল। জনার্দন ভাবলেন, বড়ই অন্যায় হয়েছে ভিতরের দুর্বলতা বাইরে এভাবে এতটা প্রকাশ করা। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি নিরুপায়! তাঁর মনে কেবলই ফুটে ওঠে ব্রজদাসের প্রথম প্রচেষ্টার ভয়ংকর দৃশ্য। সৌভাগ্যবশত একটা খুঁটি ছিল বন্ধুর মত অন্ধকারে!

জনার্দন রক্ষিতকে ডেকে বলেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে—একেবারে ঠিকে ভুল—তার জন্য তোমাকে আজ আর জবাবদিহি করতে বলব না। তুমি আর কারুর মুখের দিকে যদি না-ও চাও লক্ষ্মীনারায়ণজিউর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে এদের নিয়ে রওনা দাও। টাকা পয়সা কোনও কিছুর জন্য আমি পিছু ফিরে তাকাব না। মোট কথা ব্রজদাসও কবির মাথা চাই।'

'আমি কি পাব এবং ওরা কি পাবে?'

'এই মুহূর্তে এই প্রশ্ন করছ?'

'কোনও দিন করিনি, আজ কারণ আছে।'

জনার্দন উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি কারণ?'

রক্ষিত শান্ত কণ্ঠে বলে, 'এর সংগে আজ আমাদের জীবন মরণ সমস্যা জড়ান। মুহুরী থেকে নায়েবীর পুরস্কার সহ্য হওয়া কঠিন।'

'কেন আমি কি কখনও প্রতিজ্ঞা ভংগ করেছি। দেখছি হাতী পাঁকে পড়লে বেঙেও লাথি মারে। জেনে রেখ রক্ষিত তোমার ঐ দেহখানা এ বাড়ীরই অন্নে পুষ্ট।'

'মহারাজ দয়ার অবতার।'

'তোমারও কি সময় বুঝে মাথা খারাপ হল নাকি?'

'না। লক্ষ্মীপুরের নায়েব রামসুন্দরকে এবার কি লোভ দেখিয়ে খাজনা

আদায় করতে যেতে বলেছিলেন জোটের মহলে ? সেও দুর্ভাগ্যের ফেরে মুহুরী থেকে নায়েব হয়েছিল—কবি এড়িয়েছে তার পূর্ব জন্মের কর্মফলে।'

'কেন, কি হয়েছে তার ?'

'তেমন কিছু হয়নি—দল বল সমেত সে কেবল নিখোঁজ হয়েছে, এই দেখুন চিঠি।' সমস্ত যেন স্তব্ধ হয়ে যায় ক্ষণিকের জন্য। শুধু জোর হয়ে ওঠে দূরের বাদ্য ঝংকারের ঐকতান।

'আমি খোঁজ করব, মামলা করব—জেলায়, হাইকোর্টে...'

'সাক্ষী জুটবে না, আর তাতে তার স্ত্রীও সধবা হবে না।'

'আমি ক্ষতিপূরণ করব। যত টাকা—'

রক্ষিত হেসে ওঠে।

'বাচাল, অবিশ্বাসী তোমার সনদ রাখ।'

রক্ষিত সনদখানা রেখে প্রণাম করে বেরিয়ে যায়।

বুঝতে বুঝতে বড় দেরী হয়ে গেল তার। এখন কি আর ওরা দলে নেবে। নইলে তো ত্রিশংকুর মত মধ্য পথে রইতে হবে। একটা কথা মনে পড়ে রক্ষিতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিষ্ঠা এবং বুদ্ধি থাকলে আশা পূর্ণ হওয়া একেবারে সুদূর পরাহত নয়।

এরপর জনার্দন থানায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সান্নিপাতের রোগী যেমন আক্ষেপে খাড়া হয়—এও ঠিক তেমনি।

পঞ্চাশ

সপ্ত ডিঙা সাজিয়ে চাঁদ সদাগর একদা বাণিজ্যে বের হয়েছিলেন। আজ একখানা ডিঙিতে যে সব মাল তুলে সাজিয়ে থানার দিকে রওনা হন চক্রবর্তী, তা এ খাদ্য-সংকটের বাজারে অনেক মূল্যবান বলে মনে হয় গরীব প্রজাদের কাছে। আড়াই মন সরু সুগন্ধি আতপ। হওয়ায়

ধরলেই হয়ত উড়ে যাবে। পাচটি কচি না হলেও আধ বয়সী খাসি। সের তিনেক টাটকা গাওয়া ঘি। দশটি মাছ। এক একটির ওজন নিদেন পক্ষে কুড়ি পঁচিশ সের। এঁরা যেমন নিজেরা খেতে জানেন, তেমন পরকেও খাওয়াতে পারেন—

'আসুন, আসুন চক্রবর্তী মশাই সংবাদ কি?' থানা শুদ্ধু সকলে জনার্দনকে অভ্যর্থনা জানান।

'শ্রীশ্রীলক্ষীনারায়ণজিউ বড়ই বিপন্ন—তিনি প্রসাদী পাঠিয়েছেন রাজসেবার জন্য।'

'একেবারে জ্যান্ত যে?' থানার বড় দারোগা বলেন, 'নিজে রাজা হয়ে আজ্ঞাবহদের লজ্জা দিচ্ছেন কেন? এ আপনার নিতান্ত বিনয়।'

দেখতে দেখতে ডিঙি বোঝাই লোভনীয় প্রসাদী ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় পক্ষ কেউ যেন কিছু জানেন না। তাঁরা যেন একান্ত বন্ধুর মত নানা আলাপ আলোচনায় মগ্ন।

'তা চক্রবর্তী মশাই আপনি হচ্ছেন কনকপুরের রাজা। আপনি যদি প্রজা শাসন না করতে পারেন, আমরা কি করতে পারি? এ ধান চুরি নয়, গরু চুরি নয়, ঘরে আগুন দেওয়া কিম্বা ডাকাতিও নয়—আমরা এজাহার না নিতে পারলে সরেজমিনে যাই কি করে? আপনার মানহানি করছে গান গেয়ে, এ তো নিতান্তই আদালতের ব্যাপার। এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের।' বড় দারোগা বলেন, 'এই মিশির বাসায় বলে এস চক্রবর্তী মশাই আমার ওখানে খাবেন।'

'না, না—আমি পান্‌সীতেই খাব। কিন্তু শুনুন বড়বাবু একটা কিছু জরুরী ব্যবস্থা না করলে, আমার আর কনকপুরে মুখ দেখান সম্ভব নয়। যত সব নাড়া বুনে সব হল কীর্তনে।'

'আপনি এত বুদ্ধিমান, যদি একটা প্যাদা পাইককেও কারী-প্রথম

(গুরুতর জখম) করে নিয়ে আসতেন, তা হলে এই মুহূর্তে সেপাই বন্দুক নিয়ে আমিনিজে যেতাম। ওদের স্ত্রী পুরুষ সমেত বেঁধে চালান দিয়ে দিতাম।'

'সে একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।' কিন্তু ভুল তো হয়নি চক্রবর্তীর। সে চালে বাধ সাধল নেমকহারাম রক্ষিত!

অনেক ভাবনা চিন্তার পর চক্রবর্তী দারোগা বাবুকে ছোট একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন একখানা পাচশ টাকার নোট।

'একি?'

'এ কিচ্ছু নয়, হাতের ময়লা। আপনাকে একটা কিছু বিহিত করতেই হবে। আমি আরও পাচশ দেব। আদালত করে লাভ হবে না। টাটকা জবাব দিতে হবে, যেমন জোঁকের মুখে চুন।' চক্রবর্তী হাত ধরলেন।

'হাত ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন—আমি ভেবে দেখি।'

দারোগা চিন্তা করতে থাকেন।

চক্রবর্তীও ভাবেন। কি বিস্ময়কর ঈশ্বরের সৃষ্টি! তার চেয়েও বিস্ময়কর মানুষের কূট বুদ্ধির অবদান এই পুলিশ বাহিনী। একটু পূর্বের না, একেবারে হ্যাঁ, হয়ে গেল ভোজবাজীর মত। ধন্য অর্থ! ধন্য শ্রীশ্রীলক্ষীনারায়ণজিউ—যে দিয়েছে ওয়ারিশ ক্রমে তাঁকে যদৃচ্ছা ভোগ দখলের অধিকার। তাঁর মনে জাগে পৃথিবী জয়ের মতই একটা দুরাকাংখা।

'শুনুন চক্রবর্তী মশায় এ টাকার কথা আমার সহকর্মীদের কারুকে জানাবেন না। আমি একটা নতুন colour দেব এই গানের দলটাকে। ভিলেজ ক্রাইম নোট বুক খুলে দেখি। বলতে পারেন আপনাদের বাড়ীর কাছে C. T. Act-এর দাগী আছে, পুরান পাপী, যারা এখনও সুবিধা

পেলে খুন ডাকাতি রাহাজানী করে ? বুঝলেন তো, তাদের সংগে এদের একটা যোগসাজস দেখিয়ে দেব। কিন্তু কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

চক্রবর্তী বলেন, 'আপনার চালটি মোক্ষম। আমি নিশ্চয় অপেক্ষা করব। সবুর না করলে কি মেওয়া ফলে! জেল যদি না-ও হয়, বছর দেড়েক হাজতে পচলেই শ্রীমানদের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

কাজ কর্ম শেষ করে নৌকায় ফিরতে ফিরতে চক্রবর্তীর রাত হয়ে যায়। শীতের কুয়াশায় খুব বেশী দূর দৃষ্টি চলে না। নদী তরংগের ওপর দিয়ে তাঁর কানে যেন কেবল গানের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। সকলে ঘুমিয়ে গেল। তিনি কেবল চোখ বুজতে পারছেন না। তাঁর চারপাশে যেন অতিকৃষ্ণ মসলিনে সর্বাংগ ঢেকে কারা ঘুরতে থাকে। কতক স্পষ্ট আবার কতক অস্পষ্ট। নিশ্চয় এরা মানুষ নয়। তিনি চীৎকার করতে যান, কিন্তু ভয়ে তাঁর কণ্ঠ স্বর গোঁ গোঁ করতে থাকে। হয়ত গলার ভিতরই সে গোঙানি আটকে যায়। ওরা বলে, 'চিনতে পারছেন মহারাজ ? আমরা আপনাদের বিলানজমি কাশীপুরের প্রজা। ওরা থাকেন শ্মশানে, আমরা থাকি কবরে।'

'তোমাদের কি হয়েছে ?'

'তা বলব না, তা বলব না।' ওরা হাসতে থাকে আর নাচতে থাকে।

তোমাদের তো ঠিক চিনতে পারছিনে।'

'আপনার ঠাকুরদাদার আমলের দলিল দেখুন।'

'সে দলিল এখানে বসে কোথায় পাব ?'

'তা জানিনে, তা জানিনে।' আবার নৃত্য সুরু করে ওরা।

'তোমাদের কি হয়েছে তা বল, নইলে এখান থেকে যাও, দূর হও।'

'তা যাব না, তা যাব না—বলবও না কিছু।'

জনার্দনের গোঙানিতে ভৃত্য ছুটে আসে।

বাতিটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভৃত্য আবার সেটা জালিয়ে দেয়। বজরার কক্ষে কেউ নেই। জনার্দন পরীক্ষা করে দেখেন জানালাগুলো ঠিকই বন্ধ আছে। তিনি কান পেতে ভাল করে শুনলেন যে, কোনও শব্দ আসছে নাকি। এ সকলি তাঁর মনের বিকার। তিনি জোর করে পুনর্বার চোখ বুজলেন। কিন্তু তাঁর মগজের ভিতর এবার অভিনীত হতে লাগল প্রভাতের নাটক।

যশোদা…

পাখী…

ব্রজদাস…

জনার্দন উঠে বসলেন।

ল্যাংপ্যাংয়ে রসুলটাও উপস্থিত।

এখন তিনি কোন দিক সামাল দেবেন? লক্ষ্মীপুর গেছে, কনকপুরও যেতে বসেছে। ছোটদি এই অবস্থাটা কি বহু পূর্ব থেকে আশংকা করেই উপদেশ দিয়েছিলেন স্বার্থের কেন্দ্র ধীরে ধীরে সহবে সরাতে—জমি থেকে কল কারখানা সেয়ারে? কিন্তু সামন্ত তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা আর কি ফিরে পাবেন? এই জমি, জায়গা, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি? সর্বোপরি প্রজানুরঞ্জনের মহা ব্রত! এক কবি সমস্ত নষ্ট করতে বসেছে। তাকে কি বিনষ্ট করা যাবে না?

নিশ্চয় যাবে!

জনার্দন উজানের মুখেই হুকুম করেন নৌকা খুলতে। তিনি আর বসতে পারেন না, ঘুমিয়ে পড়েন।

একাত্ম

কুসুমের নৌকা আসছে। ভেসে আসছে না তো যেন উড়ে আসছে জলের ওপর দিয়ে।

এক বৈঠার ডিঙি ভাড়া করেনি স্টেশনে নেমে, তিন দাঁড়ের পানসী কেরায়া করেছে। সংগে রয়েছে পণ্ডিত।

'আর একটু জোর দাঁড় মার, আর একটু জোরে। বকশিস পাবে।'

'কি দেবেন মা, পিতলের কলসী?'

'ঠাট্টা নয়, সত্যি দেব। অন্তত কলসী না দিতে পারলে দাম দেব। ভাড়ার সংগে হিসেব করে নিও।' এমন গম্ভীর ভাবে কুসুম বলে যে, ওরা আর অবিশ্বাস করতে পারে না। ওদের দাঁড় চলে, বৈঠা ঘোরে পুরস্কারের অনুপাতে।

স্টেশনে নেমেই কুসুম পরিচিত অর্ধ পরিচিত অনেকের কানে কবির সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছে। কবিকে এখন কে না চেনে? অল্পদিনের মধ্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌বিদিকে ঠিক বনাগ্নির মত। মাঝি, মাল্লা, দোকানী, চাষা মুচি সকলের অন্তরেই তার গান। সাধারণের মনে সে ঢল এনেছে। সে জোর করেনি জুলুম করেনি শুধু মনের কথা ব্যক্ত করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

সকাল, সন্ধ্যা, দুপুরের বিচার নেই, বিরতিও নেই—শুধু গান, কেবল সংগীত। দল সমেত লোক যেন পাগল হয়ে গেছে। উচ্ছ্বাস, উল্লাস ফুরিয়ে এখন যেন ভাব এসেছে—যে ভাবে, প্রেমে বহুবার ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এই ভারতের মনোভূমি।

মানুষের মুখে শুনে শুনে কুসুম যেন আরও বিমুগ্ধ হয়ে গেছে। তাই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।

অর্ধেক পথ আসতে না আসতেই কুসুম অধৈর্য হয়ে ওঠে। 'চল না হেঁটে যাই, শীত কাল শুক্‌নো পথ রোদে হাঁটতে মন্দ লাগবে না।'

'তাই চল।'

মাঝিদের মধ্যে একজন বিছানা পত্র সংগে নিয়ে চলে। প্রথম সে আপত্তি করেছিল, কিন্তু পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিটা বহাল থাকায়, সে কোমর বেঁধে কূলে নেমেছে। হাত ধরে নামিয়েছে কুসুমও পণ্ডিতকে।

পথ চলতে চলতেই তারা দেখল একস্থানে ধান কাটার আয়োজন হচ্ছে। অনেক লাঠি সোটা সংগে রয়েছে কামলা মজুরদের। শস্য এখনও সম্পূর্ণ পাকেনি—কিন্তু কৃষাণেরা কাস্তে নিয়ে প্রস্তুত।

পণ্ডিত একটু ইতস্তত করতে লাগল। কুসুম বলল, 'কেন, আমরা কি ওদের শত্তুর?'

মানুষগুলো হেসে বলল, 'না মা আপনারা নিঃসন্দেহে চলে যান। কোথায় যাবেন?'

'কনকপুর।'

'কবির দেশের মানুষ রে। মা জননীকে সেলাম কর। আহা বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আপনারা বসেন, ডাব খান। দুপুর বেলা রান্না করে খেয়ে-দেয়ে যাবেন। আপনারা গুণীর গাঁয়ের লোক!'

সত্যিই সকলে কুসুম ও পণ্ডিতকে সেলাম করে ঢাল, সরকি ও লাঠি রেখে। যুদ্ধং দেহি মানুষগুলো বিনয়ে একেবারে নম্র হয়ে যায়।

'কবিকে কি চেনেন?'

'সে তো আমার পাশের বাড়ীর লোক।'

প্রশ্নকারী কেন যেন উত্তেজনা অনুভব করে, 'এখনও কি ডাব পাড়া হল না নাজেম? তোদের সোম্মান জ্ঞান নেই মোটে।' বৃদ্ধ দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, 'আমি মরলে তোদের বাড়ী একটা ইঁদুর পড়েও মুচ্ছা যাবে না।

জলচকি, লোটা, গেলাস, দা আন অতিথের জন্ম। দেরী করলে লাথি খাবি কিন্তু বাজান।'

আপ্যায়ণের আতিশয্য দেখে ওরা না বসে পারে না। রেঁধে না থাক, অন্তত ডাব তো খেতে হবে। তিন জনের জন্ম তেরটা ডাব আসে। একটার বেশী কি খাওয়া যায়! এদেশের প্রথামত কুসুম ও পণ্ডিত নিজের নিজেরটা কেটে না নিয়ে ওদেরই ছিদ্র করে দিতে বলে।

'আপনারা বুঝি কলকাত্তা থাকেন? কবির কবিগান শুনেছেন?'

'না, আজ শোনার ইচ্ছা আছে।' কুসুম বলে, 'তাইতো হেঁটে চলেছি।'

'তা হলে আমরা আর আপনাদের দেরী করাব না। যান, যান, সন্ধ্যালের দিকে একটা ভাল পালা হওয়ার কথা আছে। কিন্তু হঁশিয়ার পুলিশী হামলার ভয় রয়েছে। এই রে তাড়াতাড়ি কাস্তে মার।'

এতক্ষণ যে মানুষগুলো শান্ত হয়েছিল তারা হৈহৈ করে জমিতে লাফিয়ে পড়ে। কাস্তে চলে না যেন বুনো বাঘের থাবায় আগুন জ্বলে।

কুসুমের বড় ঔৎসুক্য ছিল যে জিজ্ঞাসা করে, কেন ওরা অপূর্ণ ফসল কাটছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বর্ষার মেঘের মত গুরুগুরু খঞ্জরীর বাদ্যের সংগে কবিগান আরম্ভ হয়। সংগে সংগে অনেকগুলো কাস্তে ঝকঝক করে ওঠে উজ্জ্বল রৌদ্রে।

হাল তুমি রুখে দাঁড়াও
ফাল তুমি আগুন জ্বালাও
আর সইবে কত জুলুমী···

কুসুম এগিয়ে চলেছে—

পণ্ডিত বলে, 'বুঝলে কুসুম এগুলো বেদখলী জমি, এরা এবার সচেতন হয়ে নিজেরা দখল করে নিচ্ছে। ইতিহাস পালটাচ্ছে।'

কুসুম পাড়া গাঁয়ের মেয়ে, কিছু দিন আধুনিক কৃষ্টি সম্পন্ন স্বামীর সংগেও বাস করে এল, সে কেন বুঝবে না এ সব কথা। সে বুঝল

আরও তলিয়ে—ডুবুরির মত সাগরের অতলে মুক্তার পাহাড়ে হাত দিয়ে। তাই তার পদক্ষেপ দ্রুত হতে দ্রুততর হয়।

দুপাশে দিগন্তবিসারী ধান্য ক্ষেত্র। এখানে ওখানে এক একটা গ্রাম। মাঝখানে সরু পথ। পক্ক এবং অপরিপক্ক শস্যে—সবুজ, হলুদে যেন আলিংগণ চলেছে। স্থানে স্থানে পথের চিহ্ন এখনও পড়েনি। ধানের শীষ ঠেলে আল বের করে নিতে হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে কঠিন হলেও কুসুম পশ্চাদপদ হয় না। সে দু হাত দিয়ে সিঁথির চুলের মত ঠেলে পথ করে চলে।

'ঐ গানের আসরের গোলমাল শোনা যাচ্ছে না?'

পণ্ডিত বুঝতে পারে না। কান খাড়া করে থাকে।

'ছাত্তর পড়িয়ে পড়িয়ে তুমি কি কানের মাথাও খেয়েছ?'

'না কুসুম, আমি বুঝতে পারছিনে ঠিক কোন দিক থেকে শব্দ আসছে। ওকি গানের গণ্ডগোল?'

'না গো হাটের! এখন একটু তাড়াতাড়ি অনুগ্রহ করে পা চালাও, দেখি! বুড়ো না হলেও দেখছি ভীমরতি ধরেছে দিনরাত এক খুঁটোতে বাঁধা থেকে থেকে।'

আগে কুসুম, পরে পণ্ডিত—অবশেষে মাঝি। ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে যায়, মুখে কারুর কথা নেই। কিন্তু কুসুমের হৃদয়ে মহা ব্যাকুলতা! তা তার চলন দেখলেই বোঝা যায়।

একটা ছোট গ্রাম পেরিয়ে এসেই ওরা খঞ্জরীর শব্দ শুনতে পেল। এখানেও অপরিণত ফসল কাটা হচ্ছে। উল্লাসের ঢেউ উঠেছে আকাশ ছেয়ে, বয়ে যাচ্ছে প্রান্তর প্লাবিত করে।

আর না মিতা আর না
অনেক সয়েছি আর না,
অনেক কেঁদেছি কান্না,
ভাতের জন্যে হাত পাতা শেষ, আর না।...

গরুর মতন জাবনা কাটি
শুক্‌না পেটে আমরা খাটি,
ভাগের কালে মেলে লাঠি
আর না মিতা আর না
ভাতের জন্যে হাত পাতা শেষ, আর না।

কুসুমের বুকে আচমকা প্রতিফলিত হয়, সেই মুখখানা যে বুনে যাচ্ছে এই বিপ্লবের বীজ। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, পরগনা হতে পরগনায়।

'কুসুম, শামুকে যে তোমার পা কাটল, হাত ছড়ে গেল ধানের পাতায়।'

'যাবে না? তুমি যে এতদিন পটের বিবি করে রেখেছ! আমার কি শরীরে কিছু আছে? পটের বিবিদের কি গা হাত পায় কিছু সয়!'

গানের ঝংকার যত নিকটে আসে, ততই কুসুমের দ্রুততা বাড়ে। পণ্ডিত পুরুষ মানুষ হয়েও যেন তার সংগে তাল রেখে চলতে পারে না।

গুটি দুই ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ আসে ছেলে কোলে করে। সংগে একটি বৌ। তারা অযাচিত ভাবেই উপদেশ দেয়, 'ও পথে যাবেন না—স্ত্রীলোক সংগে করে। পুলিশ এসেছে গানের আসরে, মিলিটারী পুলিশ—ইয়া কেঁদো কেঁদো চেহারা।'

এত দিন কলকাতা সহরে বাস করে, পণ্ডিতের কাছে পুলিশের যে স্বরূপটা অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ধরা পড়েছে, তাই আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে এগিয়ে গিয়ে কুসুমের হাত ধরে। 'দাঁড়াও একটু।'

চক্রবর্তী থানা থেকে ফেরার পর প্রায় পনর দিন কেটে গেছে কিন্তু বড় দারোগা যুধিষ্ঠির সিং আজ পর্যন্ত কনকপুরের মাটিতে পদার্পণ করেন নি। তিনি এমনি রঙের খেলা খেলেছেন যে চক্রবর্তী কয়েক দিন

বাদে সংবাদ পেয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছেন। দারোগাবাবু নাকি ছুটি নিয়ে দেশে পালিয়েছেন।

বিপরীত পক্ষের কোনও সক্রিয় বাধা না পেয়ে গান যেন বানের জলের মত গড়িয়ে চলল। আজ এখানে কাল সেখানে, দিনে রাত্রে নাকি তিন বারও পালা হয়। কবি নতুন নাটক লিখেছে আরও কয়েকখানা। ক্রমান্বয়ে বিষয় বস্তুর আবেদন যত সার্বজনীন হচ্ছে, মানুষের আগ্রহও তত বাড়ছে। ফুলশ্রীর জেলেরা একখানা পুরান নৌকা চমৎকার করে মেরামত করে দিয়ে গেছে নাটক-গাইয়েদের। কৃষকের অমানুষিক পরিশ্রম এবং জীর্ণ মধ্যবিত্তের বুদ্ধির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটাল কবি লোক সংগীতের অলৌকিক রসে। ভাব-বিপ্লব থেকে কবি কর্ম-বিপ্লবে নেমে এসেছে! এবং তার ঢেউ টনক নড়িয়েছে অভ্রংলিহ মেরুশিখরের।

কুসুম কলকাতা থেকে যে সব বিশেষ জ্ঞানসমৃদ্ধ পুস্তক পাঠিয়েছে কবি তা পড়েছে ধ্যানস্থ হয়ে। তারপর পরম বুদ্ধের মত তার নির্যাস বণ্টন করেছে বর্ণজ্ঞানহীন বন্ধুদের ভিতর।

কৃষকের সংগে শ্রমিকের ভাব-ঐশ্বর্যের আমদানী রপ্তানীর সেতু হয়েছে কুসুম—কবি যেন নিশানী আলোক-ঠায় অপলক চেয়ে আছে যুগ যুগান্তর ধরে।

কয়েকদিন পূর্বেই স্থির হয়েছিল, ব্রজদাস ও প্রহ্লাদ হালদার এক যোগে ধান কেটে নিয়ে যাবে তাদের ছ বিঘা ভূঁইয়ের—যে ভূঁই ভুয়া কবলা করেছিলেন বুড়ো শকুন, টাকা দিয়েছিলেন যতীন রায় অর্থাৎ অজয়ের পিতা গৌরী সেন। ধান কাটা সারা হলে ঐ জমিতে গাওয়া হবে অষ্টপ্রহর কবি গান। উৎসব চলবে, হিন্দু মুসলমানের ব্যবস্থা হবে পৃথক পৃথক। চাল, ডাল নুন, তেল, তামাক চাঁদা স্বরূপ দিয়েছে দশগ্রামের বাসিন্দারা।

গত কাল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দু তিন শ লোক কাস্তে হাতে মাঠে নেমেছিল এবং কয়েক দণ্ডের ভিতর ধান কেটে তুলেও নিয়ে গিয়েছিল ব্রজদাস ও প্রহ্লাদের বাড়ী। তারা বর্গাদারদের প্রাপ্য ধান দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কবুলিয়ৎ রেখেছে এক সন নিজেদের অনুকূলে। শঠে শঠ্যাং সমাচরেৎ এই কথাটা তাদের ভাল করেই জানা আছে। অন্তত আধুনিক আইনের ধারক এবং বাহক যাঁরা তাঁরাই এদের শিখতে বাধ্য করেছেন।

আজ বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। একটা পালা শেষ হয়ে এসেছে। গাইয়েরা আবেশ ও আহ্লাদে বিহ্বল। মৃদংগের বোল যেন অনায়াসে উঠছে। মন্দিরা বাজছে সঘনে। দর্শকদের মুখে একটু রা নেই। জনসমাগমও হয়েছে অভূতপূর্ব।

পাখী আজ আসরে নেমেই শুরু করে দিয়েছে শ্রোতাদের—সেই মুখেই চক্রবর্তী পুলিশ নিয়ে আসরে ঢুকলেন। নিজের ক্ষমতার পরিধি ভুলে গিয়ে আক্রোশে হুকুম করলেন, 'এদের সবাইকে বাঁধো।'

নতুন দারোগাটির বয়স অল্প। ধৈর্যশীল ও সুকৌশলী বলে খ্যাতি আছে জেলায়। তিনি সংগে সংগে বাধা দিলেন, 'থামো।'

কিন্তু আসরের ভিতর তুমুল হট্টগোল সুরু হল। দারোগা তীব্রস্বরে ফিসফিস করে বললেন, 'না বুঝে, সুঝে ভিমরুলের বাসায় খোঁচা দেওয়া উচিত নয়। আমরা সংখ্যায় পাঁচজন, আর ওরা পাঁচ হাজার। আসামী ছিনিয়ে নিয়ে যাবে একটু বোকামী করলে। অনুগ্রহ করে আমার ভূমিকাটা আমাকেই অভিনয় করতে দিন, নইলে পরে পস্তাবেন চক্রবর্তী মশায়। দেখছেন না, কেবল গান শুনতে এত লোক কখনও জমা হয় না।'

বাদ্য থামার সংগে সংগে যেন সাগর কল্লোল শ্রুত হল। দারোগার জিহ্বা শুকিয়ে গেল। তাঁর উচিত ছিল সাজসরঞ্জাম আর একটু পোক্ত

করে আসা। যাক, যখন তিনি এসেই পড়েছেন, তখন একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। শত হলেও চক্রবর্তী একটা মানী ব্যক্তি।

কুসুম অমনি টগবগানির মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে আসরের একপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। 'কবি কোথায় পণ্ডিত?'

'তাকে তো দেখতে পাচ্ছি নে।'

খোঁজ কর, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেক না।'

এই জনসমুদ্রের ভিতর থেকে একটা বুদ্বুদ কি খুঁজে বের করা যায়? তবু তাকে অনুসন্ধান করতেই হবে। কুসুমের চেয়ে তারও কি কম উৎকণ্ঠা। কিন্তু কুসুমকে একা ফেলে যাবে কেমন করে? সে দোটানায় পড়ে জনতার দিকেই ভেসে চলে। তার বুদ্ধি বিদ্যা প্রজ্ঞা কবিকে আজ প্রাধান্য না দিয়ে পারে না।

দারোগা প্রশ্ন করেন, 'এ জমি কার?'

ব্রজদাস অভিনয়ের সাজ-সজ্জা ত্যাগ করে নি। যমদূতের মত এসে হাজির হয়, 'হুজুর আমার?'

চক্রবর্তী একজন বন্দুকধারী সেপাইর পাশ ঘেঁষে দাঁড়ান, 'না দারোগাবাবু ও মিথ্যা বলছে।'

'আঃ থামুন না আপনি, জমি যখন তোমার নিশ্চয় প্রমাণ আছে?'

'থাকবে না কেন হুজুর? আমার ছেলে যদি মা ব'লে গলা জড়িয়ে ধরে, সেই তো আমার কপিলা (স্ত্রী)।'

সভা সমেত লোক হেসে ওঠে।

দারোগা বাচালতায় বিরক্ত হয়ে বলেন, 'বুড়ো দলিল দেখাতে না পারলে আমি কিন্তু ছাড়ব না। আমি ন্যায়ের বাধ্য।' দারোগা একবার লক্ষ্য করেন জনতা কোন পক্ষে?

'তা কি আমি জানিনে হুজুর! কত থানা পুলিশ করলাম এই

বয়েসে। একটি কথা, জমি ছ বিঘে কিন্তু আমার একার নয়, প্রহ্লাদের আছে এক বিঘে। প্রহ্লাদকে বুঝি চেনেন না, এই তার ভাগ্নে।'

আবার হাস্যধ্বনি শোনা যায়।

থাম না বাপু, কারুর ঘর পোড়ে কেউ থৈ খায়।'

'ভাগ্নেটি একেবারে মামার মত দেখতে। তেমনি চুল, তেমনি নাক—'

সবাই বুঝল পাগলা বুড়ো আজ শমন ডেকে আনবে নির্ঘাত এমনি রঙ্গ তামাসা করে।

'যাও তুমি আর কথা না বলে, দলিল নিয়ে এস।' চৌকিদার ও দফাদারদের সংগে সংগে ইসারা করে দেন দারোগা বাবু। 'আপনিও যান চক্রবর্তী মশায় দলিল পত্র নিয়ে আসুন। আমি অন্যায় করতে পারব না স্বয়ং ধর্মরাজ এসে অনুরোধ করলেও।' তিনি জনতার দিকে আবার কটাক্ষ হেনে একটা নিরপেক্ষ ভংগিতে বসে থাকেন।

পণ্ডিত ভিড়ের ভিতর থেকে ফিরছে। কুসুমের শরীর উত্তেজনায় শ্রান্তিতে কাঁপতে থাকে।

যে ব্যক্তি দাম্ভিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মত বড বড পা ফেলে বাড়ী গিয়েছিলেন তিনি ফিরে এসে শুষ্ক কণ্ঠে বলেন, 'দারোগা বাবু দলিল পাওয়া যাচ্ছে না—কবালার দলিল ওরা চুরি করেছে। উঃ কি সাংঘাতিক!'

'পাওয়া যাবে না কেন মহারাজ, এই যে দলিল। রক্ষিত ভিড় সরিয়ে সুমুখে আসে। যার দলিল তার হেফাজতেই রয়েছে।

'এরা সব এক একটি ডাকাত। আর দেরী না করে এদের গেরেপ্তার করুন দারোগা বাবু। এরা দিনে দুপুরে খুন করতে পারে। দলিল খানা চেয়ে নিয়ে দেখুন ওর গ্রহীতা আমার বাবা।'

'সে কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু টাকাটা দিয়েছিলেন কবির পিতা যতীন

রায়। অতএব মহারাজের পিতা আইনের চোখে ধর্মের চোখে বেনামদার।'

'সমস্তই মিথ্যা দারোগাবাবু, একেবারে মিথ্যা। যতীন রায় যে টাকা দিয়েছিল, তার কি কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবে ওরা ?'

'নিশ্চয় পারবে। এই হচ্ছে মনিঅর্ডারের রসিদ—আর এই হচ্ছে মহারাজের পিতার হাতের চিঠি।'

জনার্দন তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান, 'কোথায় দেখি?'

'একি আপনার হাতে দেওয়া উচিত হবে। দরকার হলে কোর্টে একজিবিট (দেখান) করা যাবে। আপনারা সবাই কি বলেন, এগুলো কি আমি মহারাজের হাতে দিতে পারি?'

সমুদ্র গর্জনের মত এক সংগে না, না, ধ্বনি উত্থিত হয়। কেউ কেউ লাঠি হাতে উল্লাসের চোটে লাফিয়ে গাছের মাথায় উঠতে চায়। কেউ কেউ বলে, আমরা জানি এ কবিরই জমি। কেউ কেউ পিঠ চাপড়ায় রক্ষিতের।

হুলুস্থুল পড়ে যায় চতুর্দিকে।

দারোগা প্রশ্ন করেন, 'ব্রজদাস যে ধান কেটে নিল—এ রহস্য তো বুঝলাম না।'

রক্ষিত বলে, 'যার জমি সে যদি ইচ্ছা করে ফসলের স্বার্থ একজনাকে, ছেড়ে দেয় আমাদের বলার কি আছে!'

এবার কবি এগিয়ে আসে।

'না, ঠিক তা নয় দারোগাবাবু। জমির ন্যায্য মালিকই হল চাষী, যে পুরুষ পরম্পরায় জলে, কাদায়, রোদে, বৃষ্টিতে অকাতরে শ্রম করে। ব্রজদাস এবং প্রহ্লাদ হালদার একদিন দায়গ্রস্ত হয়েছিল চক্রবর্তী মশাইর পিতার কৌশলে, আমার পিতা পরোক্ষে সে কৌশলের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন—সমস্তই জানি, কিন্তু আজ সজ্ঞানে, সুস্থ মনে আমি তা দাবী

করি কি করে বলুন তো ? জমি যাদের তারাই পাবে, যদি কোনদিন সম্ভব হয় খুশি মনে আমার টাকা ফিরিয়ে দিতে পারে।'

এরপর দারোগা দাঁড়ান না। অবিরাম হর্ষধ্বনি, মৃদংগ মন্দিরার শব্দ শোনা যায়। আবার ভাঙা আসর জমে ওঠে নাটক আরম্ভ হয় চতুর্গুণ উৎসাহে।

মনিবটা রক্ত চোষা···

'শুনেছেন, শুনেছেন দারোগাবাবু ওদের তরজা! প্রতিদিন সংবাদ পাচ্ছি দুচার জায়গায় ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে, জমির সীমান ভাঙছে, হয়ত এরপর খাজনা বন্ধ করবে—হয়ত কেন, নিশ্চয়। নিতান্ত অরাজক, অথচ আপনি কিছু করছেন না একটা এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে!'

'কি আমি করতে পারি বলুন? এ তো কতগুলো আইনের তর্ক, আর কতগুলি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আদালত খোলা রয়েছে এর জন্য।'

দারুণ নৈরাশ্যের ভিতর হঠাৎ একটা বীভৎস হাসি শোনা গেল চক্রবর্তীর। 'শ্রেণীগত হতে কতক্ষণ, তারই যে সূচনা নয় তাই বা আপনি জানলেন কি করে?'

নৌকায় উঠেছিলেন দারোগা, লঙর তুলে নিল।

যদি হয় তবু দারোগা কি করতে পারেন? তিনি একটা সবুজ রঙের ওপর না বুঝে-সুজে লালের গাঢ় ছাপ চাপাতে চান না। ক বছর, বড় জোর দু বছর এ থানায় থাকবেন। তারপর যা খুশি হক না—দুনিয়া রসাতলে যাক না। এই মুহূর্তে তিনি ঝামেলা করতে রাজী নন। হয়ত সেই ধাক্কায়ই যাবেন ভেসে তলিয়ে!

জমজম করে জমে উঠেছে গান পালাটা শেষ হয়ে যায়। গিরি প্রবাহিনী স্রোতস্বতীর মত।

জয়ের উচ্ছ্বাসে এবার ফেটে পড়ে জনতা। সে কোলাহল কি থামতে চায়! কে যেন উন্মাদের মত কবিকে কাঁধে তুলে নাচছে। করতালিতে কান বধির হয়ে যাবে বুঝি!

*　　　*　　　*

কুসুম একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। এখনও সে সেই কাদা মাখা শাড়ীখানা ছাড়েনি। বাড়ী যাওয়ার কথাও তার মনে ওঠেনি। পণ্ডিতও পরিশ্রান্ত। সে চুপ করে পাশটিতে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কুসুম কাঁদছে।

'এখন কুসুম বাড়ী চলো। আর বেলা নেই, আসরও তো ভাঙল।'

কুসুম একেবারে স্বামীর গায় ভেঙে পড়ে।

'কি হল তোমার? বড় যে অধীর হয়ে পড়েছ। শান্ত হও, সংযত হতে চেষ্টা কর।'

'আমি তো করছি, কিন্তু কিছুতে যে নিজেকে সামলাতে পারছিনে।'

'অনেক আনন্দে, আশাতিরিক্ত সাফল্যে এমনি হয়।'

'কিছু বুঝতে পারছিনে পণ্ডিত—আমি জীবনে কখনও এমন আলোড়ন অনুভব করিনি। ইচ্ছা করছে এ প্রাণটাকে এখানে বলি দিতে।'

পণ্ডিত বলে, 'একদিন প্রয়োজন হবে—সেদিনের আয়োজনের জন্যই কনকপুরে এ প্রস্তুতি। আর বেশী দূর নয়।'

কবি হয়ত কারুর মুখে পণ্ডিত ও কুসুমের কথা শুনেছে। সে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে। 'কখন এলে তোমরা, কেমন শুনলে গান?'

পণ্ডিত উত্তর দেয়, 'তোমরা পুরস্কারের যোগ্য। তোমাদের প্রতিভা অসাধারণ।'

কবির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ব্রজদাস এগিয়ে এসে বলে, 'সে কথায় আজ আর ভুলছিনি—যা কবুল করলে তা হাতে হাতে দাও।' বৃদ্ধ বালকের মত হাত পাতে।

বিপন্ন পণ্ডিত কুসুমের দিকে তাকায়। সে তো প্রস্তুত হয়ে আসেনি। ভাল লেগেছে, সে শিশু সুলভ সারল্যে বলে ফেলেছে।

কুসুম মাঝিকে ডাকে। একটা বাণ্ডিল তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খোলে। তার ভিতর দুখানা চমৎকার ছবি। কুসুম সসম্ভ্রমে তুলে দেয় কবির হাতে।

'কার ছবি? কাদের ছবি? নাম কি ওঁদের?' সহস্র কণ্ঠ ধ্বনিত হয় এক সংগে।

কবি বলে, 'ইনি তোমাদের সংগ্রামী দর্শনের জন্মদাতা—আর উনি তাঁর প্রধান মন্ত্র শিষ্য, জগতের সর্বহারার নমস্ত বন্ধু।'

মুখর জনতা স্তব্ধ হয়ে অপলক চোখে চেয়ে থাকে। আর ব্যাখ্যা দাবী করে না, অনুভবে সব যেন বোঝে। প্রতি বুকে ছবি দুটি যেন রক্ত মাংস অনুরাগে মূর্ত হয়ে ওঠে।

কবি দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। দেখা যায় সহস্র বন্ধুর গিরি সোপানো। কবি যেন পা দিয়েছে প্রথম ধাপে। তার পিছু পিছু আসছে কুসুম ও কনকপুরের যত অপাংক্তেয় বাসিন্দা। সুমুখে ক্ষুৎ পিপাসার উদ্ধত সংকট। তা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হবে এক আনন্দ লোকে—যেখানে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা চিরভাস্বর।

কবি এগিয়ে চলে।

বুকে তার সংগ্রামী শপথ।

সমাপ্ত

কৃতজ্ঞতা

মহাকবি কালিদাস, কিম্বা রবীন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞতা জানান বাহুল্য। তাদের কাছে আমি কেন বিশ্ব সভ্যতাই ঋণী।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সমসাময়িক প্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুদের—

সাহিত্য রসিক ও উদ্যমী তরুণ প্রকাশ সচ্চিদানন্দসেন মজুমদার ও কবি বন্ধু বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কঠোর সমালোচনা ব্যতীত এ উপন্যাস তিন তিনবার অদল বদল করে লেখা হত না। শেষবারে একেবারে কাঠামো বদলে গেছে।

বহু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহেবিশেষ সাহায্য করেছে শ্রীমান বিপুল ও মলয় চাটার্জি। অধ্যাপক শ্রীঅনিল চক্রবর্তী, নির্মল সিংহ, সাহিত্যিক শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমান নবকুমার সিংহ ও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ শ্রবণ নিন্দা ও স্তুতি করে ধন্য করেছেন!

বর্তমান সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ ও নারয়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিনা অনুমতিতে, কবির ক্ষুধা কবিতাটির প্রথম পংক্তি ও কথা সাহিত্যিকের লোকসংগীত সংগ্রহের তিনটি পংক্তির ছায়া গ্রহণ করেছি। তারপর যারা নানা ভাবে আমার জটিল সাহিত্যসাধনার পথে সাহায্য করেছেন, তারা সাহিত্য রসিকের চেয়েও বলব সাহিত্যিকের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাশীল—শ্রীমান প্রভাতমৈত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ হালদার, অনিলভদ্র, সুধীর মানিক, নীরোদবরণ ও প্রমোদ চক্রবর্তী, নারায়ণ ভট্টাচার্য, সুরথ সেনগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, বিশ্বনাথ নস্কর, নরেন্দ্র তরফদার, হরিদাস ও শ্রীযুত শঙ্কর জীবন ব্যানার্জি।

অবশেষে যার কাছে আমি সবিশেষ ঋণী, সে ছিল আমার সহকর্মী তরুণ নট শিল্পী শ্রীমান আদিত্য চক্রবর্তী। তারা উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্মত্যাগ ব্যতীত এ উপন্যাসের জন্ম ছিল অসম্ভব। তাই কনকপুরের কবির সংগে তার বন্ধন অচ্ছেদ্য। ইতি

অমরেন্দ্র ঘোষ

এই লেখকের অন্যান্য রচনা ঃ—

একটি সংগীতের জন্ম কাহিনী
চর কাশেম
পদ্মাদিঘীর বেদেনী
ভাঙছে শুধু ভাঙছে
বেআইনি জনতা
দক্ষিণের বিল (১ম ও ২য় খণ্ড)
জোটের মহল (যন্ত্রস্থ)
শুধু একটুখানি নুন ”
রূপান্তর ”
এম প্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ ” নাটিকা